শেষের পরিচয়

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৬

প্রকাশক : জয়ন্ত বসু

৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর : লক্ষ্মীকান্ত পাণ্ডা

আদি-মুদ্রণী

৭১, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

শেষের পরিচয়

এক

রাখাল-রাজের নূতন বন্ধু জুটিয়াছে তারকনাথ। পরিচয় মাস-তিনেকের, কিন্তু আপনি'র পালা শেষ হইয়া সম্ভাষণ নামিয়াছে 'তুমি'তে। আর এক ধাপ নীচে আসিলেও কোন পক্ষের আপত্তি নাই ভাবটা সম্প্রতি এইরূপ।

বেলা আড়াইটায় তারকের নিশ্চয় পৌঁছিবার কথা, তাহারই কি-একটা অত্যন্ত জরুরী পরামর্শের প্রয়োজন, অথচ তাহারই দেখা নাই, এদিকে ঘড়িতে বাজে তিনটা। রাখাল ছটফট করিতেছে,—পরামর্শের জন্যও নয়, বন্ধুর জন্যও নয়, কিন্তু ঠিক তিনটায় তাহার নিজেরই বাহির না হইলেই নয়। ভবানীপুরে এক সুশিক্ষিত পরিবারে সন্ধ্যার পরেই মহিলা-মজলিসের অধিবেশন, বহু তরুণী বিদুষীর পদার্পণের নিঃসংশয় সম্ভাবনা জানাইয়া বেগার খাটিবার সনির্বন্ধ আহ্বান পাঠাইয়াছেন গৃহিণী স্বয়ং। অতএব, বেলাবেলি না যাইলে অতিশয় অন্যায় হইবে; অর্থাৎ কিনা যাওয়াই চাই।

এদিকে যাত্রার আয়োজন তাহার সম্পূর্ণ। দাড়ি-গোঁফ বার-দুই কামাইয়া বার-চারেক হিমানী লাগানো শেষ হইয়াছে, শয্যার পরে সুবিন্যস্ত গিলে-করা পাঞ্জাবি, সিল্কের গেঞ্জি, কোঁচানো দেশী ধুতি-চাদর, খাটের নীচে ক্রিম-মাখানো বার্নিশ-করা পাম্প, তেপায়ার উপরে রাখা সুবর্ণ-বন্ধনী-সংবন্ধ সোনার চৌকা রিস্ট ওয়াচ—মেয়েদের চিত্তহারিণী বলিয়াই ছেলেমহলে প্রখ্যাত—সবই প্রস্তুত। টেবিলে টি-পটে চায়ের জল গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া প্রায় অপেয় হইয়া উঠিল, কিন্তু বন্ধুবরের সাক্ষাৎ নাই। সুতরাং দোষ যখন বন্ধুরই, তখন দ্বারে তালা দিয়া বাহির হইয়া পড়িলেই বা দোষ কি! কিন্তু কোথায় যেন বাধিতেছে, অথচ ওদিকের আকর্ষণও দুর্নিবার্য।

প্রবল চঞ্চলতায় রাখাল চটি পায়ে দিয়া বড় রাস্তা পর্যন্ত একবার ঘুরিয়া আসিল। তারপরে চা ঢালিয়া একলাই গিলিতে শুরু করিয়া মনে মনে শেষবারের মত প্রতিজ্ঞা করিল, এ পেয়ালা শেষ হইলেই ব্যস্! আর না। মরুক গে তার পরামর্শ। বাজে—বাজে, সব বাজে। সত্যকার কাজ থাকিলে সে আধ-ঘণ্টা আগেই হাজির হইত, পরে নয়। না হয়, কাল সকালে একবার তার মেসটা ঘুরিয়া আসা যাইবে,—ব্যস্!

তারকের পরিচয় পরে হইবে, কিন্তু রাখালের ইতিহাসটা মোটামুটি এইখানে বলিয়া রাখি।

কিন্তু ওকে জিজ্ঞাসা করিলেই বলে, আমি তো সন্ন্যাসী-মানুষ হে। অর্থাৎ, মাতৃ-পিতৃকুলের সবাই গেছেন লোকান্তরে, সে-ই শুধু বাকী। ইহলোক সমুজ্জ্বল করিয়া একদিন তাঁহারা ছিলেন নিশ্চয়ই, কিন্তু সে-সব খবর রাখাল ভালো জানে না। যদি বা কিছু জানে, বলিতে চায় না। অধুনা পটলডাঙ্গায় তাহার বাসা। বাড়িআলা বলে দু'খানা ঘর, সে বলে একখানা। ভাড়ার দিক দিয়া শেষ পর্যন্ত দেড়খানার দরে রফা হইয়াছে। একতলা, সুতরাং যথেষ্ট স্যাঁতসেঁতে। তবে, হাওয়া না থাকিলেও আলোটা আছে—দিনে দেশলাই জ্বালিয়া জুতা খুঁজিয়া ফিরিতে হয় না। ঘর যাই হউক, রাখালের আসবাবের অভাব নাই। ভালো খাট, ভালো বিছানা, ভালো টেবিল-চেয়ার, ভালো দুটা আলমারি,—একটা বইয়ের, অন্যটা কাপড়-জামা-পোশাকে পরিপূর্ণ। একটি দামী ইলেকট্রিক ফ্যান, দেওয়ালের ঘড়িটাও নেহাত কম মূল্যের নয়—এমন আরও কত কি শৌখিন ছোটখাটো টুকি-টাকি জিনিস। একজন ঠিকার বুড়ি-ঝি রাখালের কুকার, চায়ের সাজসরঞ্জাম মাজিয়া ঘষিয়া দিয়া যায়, ঘরদ্বার পরিষ্কার করে, ভিজা কাপড় কাচিয়া শুকাইয়া তুলিয়া দিয়া যায়,—সময় পাইলে বাজার করিয়াও আনে। রাখাল পাল-পার্বণের নাম করিয়া টাকাটা সিকাটা যাহা দেয় তাহা বহু সময়ে মাস-মাহিনাকেও অতিক্রম করে। রাখাল মাঝে মাঝে আদর করিয়া ডাকে নানী। রাখালকে সে সত্যই ভালবাসে।

রাখাল সকালে ছেলে পড়ায়, বাকী সমস্তদিন সভা-সমিতি করিয়া বেড়ায়। রাজনীতিক সামাজিক। সে বলে সে সাহিত্যিক,—রাজনীতির গণ্ডগোলে তাহাদের সাধনার বিঘ্ন ঘটে। ছেলে পড়ায়, কিন্তু কলেজের নয়,—স্কুলের। তাও খুব নীচের ক্লাসের। পূর্বে চাকরির টা অনেক করিয়াছে, কিন্তু জুটাইতে পারে নাই। এখন সে চেষ্টা ছাড়িয়াছে।

কিন্তু একবেলা ছোট ছেলে পড়াইয়া কি করিয়া যে এতটা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্ভবপর হাও বুঝা যায় না। সে সাহিত্যিক, কিন্তু প্রচলিত সাপ্তাহিক বা মাসিকপত্রে তাহার । খুঁজিয়া মেলে না। রাত্রে, অনেক রাত্রি জাগিয়া খাতা লেখে, কিন্তু সেগুলা যে কি র কাহাকেও বলে না। ইস্কুল-কলেজে সে কি পাস করিয়াছে কেহ জানে না, প্রশ্ন করিলে ন একটা ভাব ধারণ করে যে, সে গুরু-ট্রেনিং হইতে ডক্টরেট পর্যন্ত যা-কিছু হইতে রে। তাহার আলমারিতে সকল জাতীয় পুস্তক। কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান মোটা টা বাছা বাছা বই। কথাবার্তা শুনিলে হঠাৎ বর্ণচোরা মহামহোপাধ্যায় বলিয়া শঙ্কা । হোমিওপ্যাথি শাস্ত্র হইতে wireless পর্যন্ত তাহার অধিগত। তাহার মুখে শুনিলে দ্যুতিক তরঙ্গ-প্রবাহের জ্ঞান মার্কোনীর অপেক্ষা নিতান্ত কম বলিয়া সন্দেহ হয় না। ন্টিনেনটাল গ্রন্থকারদের নাম রাখালের কণ্ঠস্থ,—কে কয়টা বই লিখিয়াছেন সে অনর্গল লতে পারে। হিউমের সহিত লকের গরমিল কতটুকু এবং স্পিনোজার সঙ্গে দেকার্তের সল মিল কোন্‌খানে এবং ভারতীয় দর্শনের কাছে তাহা কত অকিঞ্চিৎকর, এ-সকল কথা সে পণ্ডিতের মতই প্রকাশ করে। বুয়ার-ওয়ারের সেনাপতি কে কে, রুশ-জাপান দ্ধ কিসের জন্য রুশের পরাজয় ঘটিল, আমেরিকানরা কি করিয়া এত টাকা করিল, সকল বিবরণ তাহার নখাগ্রে। ভারতীয় মুদ্রা-বিনিময়ে বাট্টার হার কি হওয়া উচিত, রিভার্স উন্সিল বেচিয়া ভারতের ক' টাকা ক্ষতি হইল, গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড রিজার্ভে কত সোনা ছে এবং কারেন্সি আমানতে কত টাকা থাকা উচিত, এ সম্বন্ধে সে একেবারে নিঃসংশয়। মন কি, নিউটনের সহিত আইনস্টিনের মতবাদ কতদিনে সামঞ্জস্য লাভ করিবে এ পারেও ভবিষ্যদ্বাণী করিতে তাহার বাধে না। শুনিয়া কেহ কেহ হাসে, কেহ-বা শ্রদ্ধায় গলিত হইয়া যায়। কিন্তু একটা কথা সকলেই অকপটে স্বীকার করে যে, রাখাল রোপকারী। সাধ্যে কুলাইলে সাহায্য করিতে সে কোথাও পরাঙ্মুখ হয় না।

বহু গৃহেই রাখালের অবাধ গতি, অবারিত দ্বার। খাটাইয়া লইতে তাহাকে কেহ ছাড়ে । যে-সব মেয়েরা বয়সে বড়, মাঝে মাঝে অনুযোগ করিয়া বলেন, রাখাল, এ তোমার রী অন্যায়, এইবার একটা বিয়ে-থা করে সংসারী হও। কতকাল আর এমনভাবে কাটাবে,— স তো হোলো।

রাখাল কানে আঙুল দিয়া বলে, আর যা বলেন বলুন, শুধু এই আদেশটি করবেন । আমি বেশ আছি।

তথাপি আদেশ-উপদেশের কার্পণ্য ঘটে না। যাঁহারা ততোধিক শুভানুধ্যায়ী তাঁহারা ঃখ করিয়া বলেন, ও নাকি আবার কথা শুনবে! স্বদেশ ও সাহিত্য নিয়েই পাগল।

কথা সে না শুনিতে পারে, কিন্তু পাগলামি সারে কিনা যাচাই করিয়া আজও কোনও ভাকাঙ্ক্ষী দেখে নাই · কেহ বলে নাই, রাখাল তোমার পাত্রী স্থির করিয়াছি, তোমাকে জী হইতে হইবে।

এমনি করিয়া রাখালের দিন কাটিতেছিল এবং বয়স বাড়িতেছিল।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলা প্রয়োজন। দর্শন-বিজ্ঞানে যাই হোক, সংসারে াপনার বলিতে তাহার যে কোথাও কিছু নাই এবং ভবিষ্যতের পাতেও শূন্য অঙ্ক দাগা খবরটা আর যাহার চোখেই চাপা পড়ুক, মেয়েদের চোখে যে চাপা পড়ে নাই এ কথা াখাল বোঝে। তাই বিবাহের অনুরোধে সে তাঁহাদের সদিচ্ছা ও সহানুভূতিটুকুই গ্রহণ রে; তাঁহাদের কাজ করে, বেগার খাটে, তার বেশীতে প্রলুব্ধ হয় না। এক ধরনের বাভাবিক সংযম ও মিতাচার এইখানে তাহাকে রক্ষা করে।

চা-খাওয়া শেষ করিয়া রাখাল কোঁচান কাপড়টি পরিপাটি করিয়া পরিয়া সিল্কের গেঞ্জি মার একবার ঝাড়িয়া গায়ে দিবার উপক্রম করিতেছে, এমনি সময়ে তারক আসিয়া প্রবেশ করিল।

রাখাল কহিল, বাঃ—বেশ তো! এরই নাম জরুরী পরামর্শ? না?

কোথাও বেরুচ্চো নাকি?

না, সমস্ত বিকেলটা ঘরে বসে থাকবো।

না সে হবে না। বিকেলের এখনো ঢের দেরি—বসো।

না হে না—তার জো নেই। পরামর্শ কাল হবে। এই বলিয়া সে গেঞ্জির উপরে পাঞ্জাবি চড়াইল।

তারক তাহার প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া কহিল, তা হলে পরামর্শ থাকল। কাল সকালে আমি অনেকদূরে গিয়ে পড়বো। হয়তো আর কখনো—না, তা না হোক—অনেকদিন আর দেখা হবার সম্ভাবনা রইল না।

রাখাল ধপ করিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল,—তার মানে?

তার মানে আমি একটা চাকরি পেয়েছি। বর্ধমান জেলার একটা গ্রামে। নতুন ইস্কুলের হেডমাস্টারি।

প্রাইমারি?

না, হাই ইস্কুল।

হাই ইস্কুল? ম্যাট্রিক? মাইনে?

লিখচে তো নব্বুই টাকা। আর একটা ছোটখাটো বাড়ি—থাকবার জন্যে অমনি দেবে।

রাখাল হাঃ হাঃ করিয়া একচোট হাসিয়া লইল, পরে কহিল, ধাপ্পা—ধাপ্পা—সব ধাপ্পাবাজি। কে তামাশা করেচে। এ তো একশ' টাকার ওপরে গেল হে। কেন, তারা কি আর লোক পেলে না?

তারক কহিল, বোধ হয় পায়নি। পাড়াগাঁয়ে সহজে কি কেউ যেতে চায়?

না, চায় না! একশো টাকায় যমের বাড়ি যেতে চায়, এ তো বর্ধমান! ইঃ—তিনটে দশ। আর দেরি করা চলে না। না না পাগলামি রাখো,—কাল সকালে সব কথা হবে, দেখা যাবে কে লিখেচে, আর কি লিখেচে। এটা বুঝচো না যে একশো টাকা! অজানা—অচেনা—দূৎ! অ্যাপ্লিকেশনের জবাব তো? ও ঢের জানি, হাড়ে ঘুণ ধরে গেছে। দূৎ! চললুম। বলিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইল।

তারক মিনতি করিয়া কহিল, আর দশ মিনিট ভাই। সত্যি মিছে যাই হোক, রাতের গাড়িতে যেতেই হবে।

রাখাল বলিল, কেন শুনি? কথাটা আমার বিশ্বাস হলো না বুঝি?

তারক ইহার জবাব দিল না, কহিল,—অথচ এমনি অভ্যাস হয়ে গেছে যে, দিনান্তে একবার দেখা না হলে প্রাণটা যেন হাঁপিয়ে ওঠে।

রাখাল কহিল, আমারই তা হয় না বুঝি?

ইহার পরে দুজনেই ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল।

তারক বলিল, বেঁচে যদি থাকি, বড়দিনের ছুটিতে হয়তো আবার দেখা হবে। ততদিন—

রাখালের চোখে সামান্যতেই জল আসিয়া পড়ে, তাহার চোখ ছলছল করিতে লাগিল।

তারক আঙুল হইতে একটা বহু ব্যবহৃত সোনার শিল-আঙটি খুলিয়া টেবিলের একধারে রাখিয়া দিল, কহিল, ভাই রাখাল, তোমার কাছে আমি কুড়িটা টাকা ধারি—

কথাটা শেষ হইল না--এ কি তার বন্ধক নাকি? বলিতে বলিতে রাখাল ছোঁ মারিয়া আঙটিটা তুলিয়া লইয়া ঝোঁকের মাথায় জানালা দিয়া ফেলিয়া দিতেছিল, তারক হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, আরে না না, বন্ধক নয়—বেচলে এর দাম দশটা টাকাও কেউ দেবে না,—এ আমার স্মরণ-চিহ্ন, যাবার আগে তোমার হাতে নিজের হাতে পরিয়ে যাবো,—এই বলিয়া সে জোর করিয়া বন্ধুর আঙুলে পরাইয়া দিল। বলিল, দশ মিনিট সময় চেয়ে নিয়েছিলাম, কিন্তু পনর মিনিট হয়ে গেছে, এবার তোমার ছুটি। নাও, পোশাক-টোশাক পরে নাও,—এই বলিয়া সে হাসিল।

মহিলা-মজলিসের চেহারা তখন রাখালের মনের মধ্যে ম্লান হইয়া গেছে, সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় পাশাপাশি দুই বন্ধুর ছবি পড়িল। রাখাল বেঁটে, গোলগাল, গৌরবর্ণ, তাহার পরিপুষ্ট মুখের 'পরে একটি সহৃদয় সরলতা

যেন অত্যন্ত ব্যস্ত—মানুষটি যে সত্যই ভালোমানুষ তাহাতে সন্দেহ জন্মায় না, কিন্তু তারকের চেহারা সে শ্রেণীরই নয়। সে দীর্ঘাকৃতি, কৃশ, গায়ের রংটা প্রায় কালোর ধার ঘেঁষিয়া আছে। বাহিরে প্রকাশিত নয় বটে, কিন্তু ঠাহর করিলেই সন্দেহ হয়, লোকটি বোধ হয় অতিশয় বলিষ্ঠ। মুখ দেখিয়া হঠাৎ কোন ধারণা করা কঠিন, কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে একটি আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য আছে। আয়ত বা সুন্দর নয়, কিন্তু মনে হয় যেন নির্ভর করা চলে। সুখে-দুঃখে ভার সহিবার ইহার শক্তি আছে। বয়স সাতাশ-আটাশ, রাখালের চেয়ে দু-তিন বছরের ছোট, কিন্তু কিসে যেন তাহাকেই বড় বলিয়া ভ্রম হয়।

রাখাল হঠাৎ জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, কিন্তু আমি বলচি তোমার যাওয়া উচিত নয়।

কেন?

কেন আবার কি? একটা হাই ইস্কুল চালানো কি সোজা কথা! ম্যাট্রিক ক্লাসের ছেলে পড়াতে হবে, তাদের পাস করাতে হবে—সে কোয়ালিফিকেশন কি—

তারক কহিল, কোয়ালিফিকেশন তারা চায়নি, চেয়েছে য়ুনিভার্সিটির ছাপছোপের বিবরণ। সে-সব মার্কা কর্তৃপক্ষদের দরবারে পেশ করেছি, আর্জি মঞ্জুর হয়েছে। ছেলে পড়াবার ভার আমার, কিন্তু পাস করার দায় তাদের।

রাখাল ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে কহিল, সে বললে হয় না হে, হয় না। পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া কহিল, কিন্তু আমাকেও তো তুমি সত্যি কথা বলোনি তারক। বলেছিলে পড়াশুনা তেমন কিছু করোনি।

তারক হাসিয়া কহিল, সে এখনও বলচি। ছাপছোপ আছে, কিন্তু পড়াশুনা করিনি। তার সময় পেলাম কৈ? পড়া-মুখস্থর পালা সাঙ্গ হতেই লেগে গেলাম চাকরির উমেদারিতে, —কাটলো বছর দু'তিন—তার পরে দৈবাৎ তোমার দয়া পেয়ে কলকাতায় এসে দুটো খেতে-পরতে পাচ্চি।

দ্যাখো তারক, ফের যদি তুমি—

অকস্মাৎ আয়নায় দুই বন্ধুর মাথার উপরে আর একটি ছায়া আসিয়া পড়িল। নারীমূর্তি। উভয়েই ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, একটি অপরিচিতা মহিলা ঘরের প্রায় মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। মহিলাই বটে। বয়স হয়তো যৌবনের আর এক প্রান্তে পা দিয়াছে, কিন্তু সে চোখেই পড়ে না। বর্ণ অত্যন্ত গৌর, একটু রোগা, কিন্তু সর্বাঙ্গ ঘেরিয়া মর্যাদার সীমা নাই। ললাটে আয়তির চিহ্ন। পরনে গরদের শাড়ি, হাতে গলায় প্রচলিত সাধারণ দু-চারখানি গহনা, শুধু যেন সামাজিক রীতি-পালনের জন্যই। দুই বন্ধুই কিছুক্ষণ স্তব্ধবিস্ময়ে চাহিয়া রাখাল চৌকি ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল,—এ কি! নতুন-মা যে! তাহার পরেই সে উপুড় হইয়া তাঁহার পায়ের উপর গিয়া পড়িল, দুই পায়ে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম যেন তাহার আর শেষ হইতেই চাহে না।

উঠিয়া দাঁড়াইলে রমণী হাত দিয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন। তিনি চৌকিতে বসিলে রাখাল মাটিতে বসিল এবং তারক উঠিয়া গিয়া বন্ধুর পাশে বসিল।

হঠাৎ চিনতে পারিনি মা।

না পারবারই ত কথা রাজু।

মনে মনে ভাবছি, চোখ পড়ে গেল আপনার চুলের ওপর। রাঙ্গা আঁচলের পাড় ডিঙিয়ে পায়ে এসে ঠেকেচে। এমনটি এ-দেশে আর কারু দেখিনি। তখন সবাই বলত এর খানিকটা কেটে নিয়ে এবার প্রতিমা সাজানো হবে। মনে পড়ে মা?

তিনি একটুখানি হাসিলেন, কিন্তু কথাটা চাপা দিলেন। বললেন, রাজু, ইনিই বুঝি তোমার নতুন বন্ধু? নামটি কি?

রাখাল বলিল, তারক চাটুয্যে। কিন্তু আপনি জানলেন কি করে?

তিনি এ প্রশ্নও চাপা দিলেন, শুধু বললেন, শুনেচি তোমাদের খুব ভাব।

রাখাল বলল, হাঁ, কিন্তু সে বুঝি আর টেঁকে না। ও আজই চলে যেতে চাচ্চে বর্ধমানের কোন্ এক পাড়াগাঁয়ে,—ইস্কুলের হেডমাস্টারি জুটেছে ওর, কিন্তু আমি বলি, তুমি এম. এ. পাস করেছো যখন তখন মাস্টারির ভাবনা নেই, এখানেই একটা যোগাড় হয়ে যাবে। ও কিন্তু ভরসা করতে চায় না। বলুন তো কি অন্যায়!

শুনিয়া তিনি মৃদুহাস্যে কহিলেন, তোমার আশ্বাসে বিশ্বাস করতে না পারাকে অন্যায় বলতে পারিনে রাজু। তারকবাবু কি সত্যিই আজ চলে যাচ্চেন?

তারক সবিনয়ে কহিল, এটি কিন্তু তার চেয়েও অন্যায় হ'ল যে রাখাল-রাজের পৈতৃক মুড়োটা স্বচ্ছন্দে বাদ দিয়ে করে দিলেন ওকে ছোট একটুখানি রাজু, আর আমারই অদৃষ্টে এসে জুটল এক উটকো বাবু? ভার সইবে না নতুন-মা, ওটা বাতিল করতে হবে।

তিনি ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, তাই হবে তারক।

সম্মতি লাভ করিয়া তারক সকৃতজ্ঞ-চিত্তে কি-একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সময় পাইল না, তাঁহার সস্মিত মুখের উপর হঠাৎ যেন একটা বিষণ্ণতার ছায়া আসিয়া পড়িল, গলার স্বরটাও গেল বদলাইয়া, বলিলেন, রাজু, আজকাল ও-বাড়িতে কি তুমি বড়-একটা যাও না?

যাই বৈ কি নতুন-মা। তবে নানা ঝঞ্ঝাটে দিন পনের-কুড়ি—

রেণুর কাল বিয়ে,—জান?

কৈ না! কে বললে?

হাঁ, তাই। আজ বেলা দশটায় তার গায়ে-হলুদ হয়ে গেল। এ বিয়ে তোমাকে বন্ধ করতে হবে।

কেন?

হওয়া অসম্ভব বলে। বরের পিতামহ পাগল হয়ে মারা যায়, এক পিসী পাগল হয়ে আছে, বাপ পাগল নয় বটে, কিন্তু হলে ছিল ভাল। হাতে-পায়ে দড়ি বেঁধে লোকে ফেলে রাখতে পারতো।

কি সর্বনাশ! কর্তা কি এ-সব খোঁজ করেন নি?

রমণী কহিলেন, জানোই তো কর্তাকে। ছেলেটি রূপবান, লেখাপড়া করেছে, তা ছাড়া ওদের অনেক টাকা। ঘটক সম্বন্ধ এনেছে, যা বলেচে তিনি বিশ্বাস করেছেন। আর জানলেই বা কি? সমস্ত শুনেও হয়তো শেষ পর্যন্ত তিনি বুঝতেই পারবেন না এতে ভয়ের কি আছে?

রাখাল বিষণ্ণ-মুখে কহিল, তবেই ত!

তারক চুপ করিয়া শুনিতেছিল, বন্ধুর এই নিরুৎসুক কণ্ঠস্বরে সে সহসা উত্তেজিত হইয়া উঠিল—তবেই তো মানে? বাধা দেবার চেষ্টা করবে না, আর এই বিয়ে হয়ে যাবে? এ তো বড় ভীষণ অন্যায়?

রাখাল কহিল, সে বুঝি, কিন্তু আমার কথায় বিয়ে বন্ধ হবে কেন ভাই? আর কর্তাই তো শুধু নয়, আর সবাই রাজী হবে কেন?

তারক বলিল, কেন হবে না? বরের বাড়ির মত মেয়ের বাড়িরও কি সবাই পাগল বললেও শুনবে না—বিয়ে দেবেই?

কিন্তু গায়ে-হলুদ হয়ে গেছে যে! এটা ভুলচো কেন?

হলোই বা গায়ে-হলুদ! মেয়েকে তো জ্যান্ত চিতায় তুলে দেওয়া যায় না! বলিয়াই তাহার চোখ পড়িল সেই অপরিচিতা রমণী তাহার প্রতি নীরবে চাহিয়া আছেন। লজ্জিত হইয়া সে কণ্ঠস্বর শান্ত করিয়া বলিল, আমি জানিনে এঁরা কে, হয়তো কথা কওয়া আমার উচিত নয়, কিন্তু মনে হয় রাখাল, তোমার প্রাণপণে বাধা দেওয়া কর্তব্য। কোনমতেই এ ঘটতে দেওয়া চলে না।

রমণী জিজ্ঞাসা করিলেন, এঁরা কারা রাজু? মেয়ের সৎমা তো? তাঁর আপত্তি করার কি অধিকার?

রাখাল চুপ করিয়া রহিল। তিনি নিজেও ক্ষণকাল নিঃশব্দে থাকিয়া কহিলেন, তোমাকে তা হলে একবার বাগবাজারে যেতে হবে, ছেলের মামার কাছে। শুনেচি, ও-পক্ষে তিনিই কর্তা। তাঁকে মেয়েব মায়ের ইতিহাসটা জানিয়ে বারণ করে দিতে হবে। আমার বিশ্বাস এতে কাজ হবে; যদি না হয়, তখন সে ভার রইলো আমার। আমি রাত্রি এগারটার পর আবার আসবো বাবা,—এখন উঠি। এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রাখাল ব্যাকুল

হইয়া বলিয়া উঠিল, কিন্তু তার পরে যে বেণুর আর বিয়ে হবে না নতুন-মা। জানাজানি হয়ে গেলে—

না-ই হোক বাবা, সে-ও ভালো।

রাখাল আর তর্ক করিল না, হেঁট হইয়া আগের মতই ভক্তিভরে প্রণাম করিল। তাহার দেখাদেখি এবার তারকও পায়ের কাছে আসিয়া নমস্কার করিল। তিনি দ্বার পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াই হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, তারক, তোমাকে বলা হয়তো আমার উচিত নয়, কিন্তু তুমি রাজুর বন্ধু, যদি ক্ষতি না হয়, এ দুটো দিন কোথাও যেও না। এই আমার অনুরোধ।

তারক মনে মনে বিস্মিত হইল, কিন্তু সহসা জবাব দিতেও পারিল না। কিন্তু এ জন্য তিনি অপেক্ষাও করিলেন না, বাহির হইয়া গেলেন। রাখাল জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল তিনি পায়ে হাঁটিয়াই গেলেন, শুধু গলির বাঁকের কাছে দরোয়ানের মতো কে-একজন অপেক্ষা করিতেছিল, সে তাঁহাকে নিঃশব্দে অনুসরণ করিল।

দুই

রাখাল জামা খুলিয়া ফেলিল।

তারক প্রশ্ন করিল, বেরুবে না?

না। কিন্তু তুমি? যাচ্চো আজই বর্ধমানে?

না। তুমি কি করো দেখবো,—স্বেচ্ছায় না করো জোর করে করাবো।

চায়ের কেৎলিটা আর একবার চড়িয়ে দিই,—কি বলো?

দাও।

কিছু জলখাবার কিনে আনি গে- কি বলো?

রাজী।

তাহলে তুমি চড়াও জলটা, আমি যাই দোকানে। এই বলিয়া সে কোঁচার খুঁট গায়ে দিয়া চটি পায়ে বাহির হইয়া গেল। গলির মোড়েই খাবারের দোকান, নগদ পয়সার প্রয়োজন হয় না, ধার মেলে।

খাবার খাওয়া শেষ হইল। সন্ধ্যার পর আলো জ্বালিয়া চায়ের পেয়ালা লইয়া দুই বন্ধু টেবিলে বসিল।

তারক প্রশ্ন করিল, তার পরে?

রাখাল বলিল, আমার বয়স তখন দশ কি এগারো। বাবা চার-পাঁচদিন আগে একবেলার কলেরায় মারা গেছেন; সবাই বললে, বাবুদের মেজমেয়ে সবিতা বাপের বাড়িতে পুজো দেখতে এসেছে, তুই তাকে গিয়ে ধর। বাবুদের বুড়ো সরকার আমাকে সঙ্গে নিয়ে একেবারে অন্দরে গিয়ে উপস্থিত হ'লো। তিনি পইঠের একধারে বসে কুলোয় করে তিল বাছছিলেন, সরকার বললে, মেজমা, ইটি বামুনের ছেলে, তোমার নাম শুনে ভিক্ষে চাইতে এসেছে। হঠাৎ বাপ মারা গেছে,—ত্রিসংসারে এমন কেউ নেই যে, এ দায় থেকে ওকে উদ্ধার করে দেয়। শুনে তাঁর চোখ ছলছল করে এলো, বললেন, তোমার কি আপনার কেউ নেই? বললুম, মাসী আছে, কিন্তু কখনো দেখিনি। জিজ্ঞাসা করলেন, শ্রাদ্ধ করতে কত টাকা লাগবে? এটা শুনেছিলুম, বললুম, পুরুতমশাই বলেন পঞ্চাশ টাকা লাগবে। তিনি কুলোটা রেখে উঠে গেলেন, আর একটা কথাও জিজ্ঞেসা করলেন না। একটু পরে ফিরে এসে আমার উত্তরীয়ের আঁচলে দশ টাকার পাঁচখানি নোট বেঁধে দিয়ে বললেন, তোমার নাম কি বাবা? বললুম, রাজু, ভালো নাম রাখাল-রাজ। বললেন, তুমি যাবে বাবা, আমার সঙ্গে আমার শ্বশুর-বাড়ির দেশে? সেখানে ভালো ইস্কুল আছে, কলেজ আছে, তোমার কোন কষ্ট হবে না। যাবে? আমাকে জবাব দিতে হ'লো না, সরকারমশাই যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল, বললে, যাবে মা, যাবে, এক্ষুনি যাবে। এতবড় ভাগ্য ও কোথায় কার কাছে পাবে? ওর চেয়ে অসহায় এ গাঁয়ে আর কেউ নেই মা,—মা-দুর্গা তোমাকে ধনে-পুত্রে চিরসুখী করবেন। এই বলে বুড়ো সরকার হাউহাউ করে কাঁদতে লাগল।

শুনিয়া তারকেব চক্ষুও সজল হইয়া উঠিল।

রাখাল বলিতে লাগিল, পিতৃশ্রাদ্ধ ও মহামায়ার পুজো দুই-ই শেষ হ'লো। ত্রয়োদশীর দিন যাত্রা করে চিরদিনের মত দেশ ছেড়ে তাঁর স্বামিগৃহে এসে আশ্রয় নিলুম। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী; তাই সবাই বলে নতুন-মা, আমিও বললুম নতুন-মা। শ্বশুর-শাশুড়ী নেই, কিন্তু বহু পরিজন। অবস্থা সচ্ছল, ধনী বললেও চলে। এ বাড়ির শুধু ত তিনি গৃহিণীই নয়, তিনিই গৃহকর্ত্রী। স্বামীর বয়স হয়েছে, চুলে পাক ধরতে শুরু করেছে, কিন্তু যেন ছেলে-মানুষের মত সরল। এমন মিষ্টি মানুষ আমি আর কখনো দেখিনি—দেখবামাত্রই যেন ছেলের আদরে আমাকে তুলে নিলেন। দেশে জমিজমা চাষবাসও ছিল, দু-একখানি ছোটোখাটো তালুকও ছিল, আবার কলকাতায় কি-যেন একটা কারবারও চলছিল। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই তিনি থাকতেন বাড়িতে, তখন দিনের অর্ধেকটা কাটত তাঁর পুজোব ঘবে,—দেব-সেবায়, পুজো-আহ্নিকে, জপ-তপে।

আমি স্কুলে ভর্তি হলাম। বই-খাতা-পেন্সিল-কাগজ-কলম এলো, জামা-কাপড়-জুতো-মোজা অনেক জুটলো, ঘরে মাস্টার নিযুক্ত হ'লো, যেন আমি এ-বাড়িরই ছেলে,—নিরাশ্রয় বলে মা যে সঙ্গে করে এনেছিলেন এ কথা সবাই গেল ভুলে। তারক, এ জীবনে সে-সুখের দিন আব ফিরবে না। আজও কতদিন আমি চুপ করে শুয়ে সেই-সব কথাই ভাবি। এই বলিযা সে চুপ করিল এবং বহুক্ষণ পর্যন্ত কেমন যেন একপ্রকার বিমনা হইয়া রহিল।

তারক কহিল, রাখাল, কি জানি কেন আমার বুকের ভেতরটা যেন ঢিপঢিপ করচে। তার পরে?

রাখাল বলিল, তার পরে এমন অনেকদিন কেটে গেল। ইস্কুলে ম্যাট্রিক পাস করে কলেজে আই. এ. ক্লাসে ভর্তি হয়েছি, এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন সমস্ত উলটে-পালটে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যেন লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। ভাঙতে-চুরতে কোথাও কিছু আর বাকী রহিল না। এই বলিযা সে নীরব হইল।

কিন্তু চুপ করিয়াও থাকিতে পারিল না, কহিল, এতদিন কাউকে কোন কথা বলি নি। আর বলবই বা কাকে? আজও বলা উচিত কিনা জানিনে, কিন্তু বুকের ভেতরটায় যেন ঝড় বয়ে যাচ্ছে—

চাহিয়া দেখিল, তারকের মুখে অপরিসীম কৌতূহল, কিন্তু সে প্রশ্ন করিল না। রাখাল নিজের সঙ্গে ক্ষণকাল লড়াই করিয়া অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, তারক, নিজের মাকে দেখিনি, মা বলতে আমার নতুন-মাকেই মনে পড়ে। এই আমার সেই নতুন-মা। এতক্ষণে সত্যই তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। প্রথমে দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল, তারপরে বড় বড় কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

মিনিট দুই-তিন পরে চোখ মুছিয়া নিজেই শান্ত হইল, কহিল, উনি তোমাকে দিন-দুই থাকতে বলে গেলেন, হয়তো তোমাকে তাঁর কাজ আছে। বারো-তেরো বছর পূর্বের কথা—সেদিন ব্যাপারটা কি ঘটেছিল তোমাকে বলি। তার পরে থাকা না-থাকা তোমার বিবেচনা।

তারক চুপ করিয়া ছিল, চুপ করিয়াই রহিল।

রাখাল বলিতে লাগিল, তখন কে-একজন ওঁদের কলকাতার আত্মীয় প্রায়ই বাড়িতে আসতেন, কখনো দু-একদিন, কখনো বা তাঁর সপ্তাহ কেটে যেতো। সঙ্গে আসত তেল-মাখাবার খানসামা, তামাক সাজবার ভৃত্য, ট্রেনে খবরদারি করবার দরোয়ান—আর নানা রকমের কত যে ফল-মূল-মিষ্টান্ন তার ঠিকানা নেই। পাল-পার্বণ উপলক্ষে উপহারের ত পবিমাণ থাকতো না। তাঁর সঙ্গে ছিল এঁদের ঠাট্টার সুবাদ। শুধু কোন সম্পর্কের হিসেবেই নয়, বোধ করি বা ধনের হিসেব থেকেও এ বাড়িতে তাঁর আদর-আপ্যায়ন ছিল প্রভূত। কিন্তু বাড়ির মেয়েরা যেন ক্রমশঃ কি একপ্রকার সন্দেহ করতে লাগল। কথাটা ব্রজবাবুর কানে গেল, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করা ত দূরের কথা, উলটে করলেন রাগ। দূর-সম্পর্কের এক পিসতুতো বোনকে যেতে হলো তার শ্বশুরবাড়ি। শুনেচি, এমনিই নাকি হয়ে থাকে—এই হ'লো দুনিয়ার সাধারণ নিয়ম। তা ছাড়া, এইমাত্র ত ওঁর নিজের মুখেই শুনতে

পেলে, কর্তার মতো সরলচিত্ত ভালোমানুষ লোক সংসারে বিরল। সত্যিই তাই। কারও কোন কলঙ্ক মনের মধ্যে স্থান দেওয়াই তাঁর কঠিন। আর, সন্দেহ কাকে, না নতুন-মাকে, ছিঃ!

দিন কাটে, কথাটা গেল বাহ্যতঃ চাপা পড়ে, কিন্তু বিদ্বেষ ও বিষের বীজাণু আশ্রয় নিলে পরিজনদের নিভৃত গৃহকোণে। যাদের সবচেয়ে বড় ক'রে আশ্রয় দিয়েছিলেন একদিন নতুন-মাই নিজে,—তাদেরই মধ্যে। কেবল আমাকেই যে একদিন 'যাবে বাবা আমার কাছে?' বলে ঘরে ডেকে এনেছিলেন তাই নয়, এনেছিলেন আরও অনেককেই। এ ছিল তাঁর স্বভাব। তাই পিসতুতো বোন গেল চলে, কিন্তু পিসী রইলেন তার শোধ নিতে।

তারক শুধু ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল। রাখাল কহিল, ইতিমধ্যে চক্রান্ত যে কত নিবিড় ও হিংস্র হয়ে উঠছিল তারই খবর পেলাম অকস্মাৎ একদিন গভীর রাতে। কি একপ্রকার চাপা-গলার কর্কশ কোলাহলে ঘুম ভেঙ্গে ঘরের বাইরে এসে দেখি সুমুখের ঘরের কবাটে বাইরে থেকে শেকল দেওয়া। উঠানের মাঝখানে গোটা পাঁচ-ছয় লণ্ঠন। বারান্দার একধারে বসে স্তব্ধ অধোমুখে ব্রজবাবু এবং সেই ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে নবীনবাবু—কর্তার খুড়তুতো ছোটভাই—রুদ্ধদ্বারে অবিরত ধাক্কা দিয়ে কঠিনকণ্ঠে পুনঃ পুনঃ হাঁকচেন রমণীবাবু, দোর খুলুন। ঘরটা আমরা দেখব। বেরিয়ে আসুন বলচি!

ইনি কলকাতার আড়ত থেকে হাজার কুড়ি-পঁচিশ টাকা উড়িয়ে কিছুকাল হ'ল বাড়িতে এসে বসেছেন।

বাড়ির মেয়েরা বারান্দার আশেপাশে দাঁড়িয়ে, মনে হ'ল চাকররা কাছাকাছি কোথায় যেন আড়ালে অপেক্ষা করে আছে;—ব্যাপারটা ঘুম-চোখে প্রথমটা ঠাওব পেলাম না, কিন্তু পরক্ষণেই সমস্ত বুঝলাম। এখনি ভীষণ কি-একটা ঘটবে ভেবে ভয়ে সর্বাঙ্গ ঘামে ভেসে গেল, চোখে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো; হয়ত মাথা ঘুরে সেইখানে পড়ে যেতাম, কিন্তু তা আর হ'ল না। দোর খুলে রমণীবাবুর হাত ধরে নতুন-মা বেরিয়ে এলেন। বললেন, তোমরা কেউ এ'র গায়ে হাত দিয়ো না, আমি বারণ করে দিচ্ছি। আমরা এখুনি বাড়ি থেকে বার হয়ে যাচ্ছি।

হঠাৎ যেন একটা বজ্রাঘাত হয়ে গেল। এ কি সত্য সত্যই এ-বাড়ির নতুন-মা! কিন্তু তাঁদের অপমান করবে কি, বাড়িসুদ্ধ সকলে যেন লজ্জায় মরে গেল। যে-যেখানে ছিল সেইখানেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে—তাঁরা সদর দরজা যখন পার হয়ে যান, কর্তা তখন অকস্মাৎ হাউহাউ করে কেঁদে উঠে বললেন, নতুন-বৌ, তোমার রেণু রইল যে! কাল তাকে আমি কি দিয়ে বোঝাব!

নতুন-মা একটা কথাও বললেন না, নিঃশব্দে ধীরে ধীরে বার হয়ে গেলেন। সেদিন সেই রেণু ছিল তিন বছরের, আজ বয়স হয়েছে তার ষোল। এই তেরো বচ্ছর পরে আজ হঠাৎ দেখা দিলেন মা, মেয়েকে বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্যে।

এইবার এতক্ষণ পরে কথা কহিল তারক—নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আর এই তেরোটা বচ্ছর মেয়েকে মা চোখের আড়াল করেন নি। এবং শুধু মেয়েই নয়, খুব সম্ভব, তোমাদের কাউকেই না।

রাখাল কহিল, তাই তো মনে হচ্ছে ভাই। কিন্তু কখনো শুনেছ এমন ব্যাপার?

না শুনিনি, কিন্তু বইয়ে পড়েচি। একখানা ইংরিজী উপন্যাসের আভাস পাচ্চি। কেবল আশা করি উপসংহারটা যেন না আর তার মত হয়ে দাঁড়ায়।

রাখাল কহিল, নতুন-মার ওপর বোধ করি এখন তোমার ঘৃণা জন্মালো তারক?

তারক কহিল, জন্মানোই তো স্বাভাবিক রাখাল।

রাখাল চুপ করিয়া রহিল। জবাবটা তাহার মনঃপুত হইল না, বরঞ্চ মনের মধ্যে গিয়া কোথায় যেন আঘাত করিল। খানিক পরে বলিল, এর পরে দেশে থাকা আর চলল না। ব্রজবাবু কলকাতায় এসে আবার বিবাহ করলেন,—সেই অবধি এখানেই আছেন।

আর তুমি?

রাখাল বলিল, আমিও সঙ্গে এলাম। পিসীমা তাড়াবার সুপারিশ করে বললেন, ব্রজ, সেই হতভাগীই এই বালাইটাকে জুটিয়ে এনেছিল। ওটাকে দূর করে দে।

নতুন-মার স্নেহের পাত্র বলে আমার 'পরে পিসীমা সদয় ছিলেন না।

ব্রজবাবু শান্ত মানুষ, কিন্তু কথা শুনে তাঁর চোখের কোণটা একটু রুক্ষ হয়ে উঠলো, তবু শান্তভাবেই বললেন, ওই ত তার রোগ ছিল পিসীমা। আপদ-বালাই ত আর একটি জুটোয় নি— কেবল ও-বেচারাকে তাড়ালেই কি আমাদের সুবিধে হবে?

পিসীমার নিজেদের কথাটা হয়ে গেছে তখন অনেকদিনের পুরনো—সে বোধ হয় আর মনে নেই। বললেন: তবে কি ওকে ভাত-কাপড় দিয়ে বরাবর পুষতেই হবে নাকি? না না, ও যেখানের মানুষ সেখানে যাক, ওর মুখ থেকে বাপ-মা মেয়ের কীর্তি-কাহিনী শুনুক। নিজেদের বংশ-পরিচয়টা একটুখানি পাক।

ব্রজবাবু এবার একটুখানি হাসলেন, বললেন, ও ছেলেমানুষ, গুছিয়ে তেমন বলতে পারবে না পিসীমা, তার বরঞ্চ তুমি অন্য ব্যবস্থা করো।

জবাব শুনে পিসীমা রাগ করে চলে গেলেন, বলে গেলেন, যা ভাল বোঝ করো, আমি আর কিছুর মধ্যেই নেই।

নতুন-মা যাবার পরে এ-বাড়িতে পিসীমার প্রভাবটা কিছু বেড়ে উঠেছিল। সবাই জানতো তাঁর বুদ্ধিতেই এতবড় অনাচারটা ধরা পড়েচে। এতকালের লক্ষ্মী-শ্রী ত যেতেই বসেছিল। নবীনবাবুর দরুন যে কারবারের লোকসান, তার মূলেও দাঁড়ালো এই গোপন পাপ। নইলে কৈ এমন মতি-বুদ্ধি ত নবীনের আগে হয়নি! পিসীমা বলতেও আরম্ভ করেছিলেন তাই। বলতেন, ঘরের লক্ষ্মীর সঙ্গে যে এ-সব বাঁধা। তিনি চঞ্চল হলে যে এমন হতেই হবে? হয়েছেও তাই।

তারক অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কলকাতায় এসে ওঁদের বাড়িতেই কি তুমি থাকতে?

হাঁ, প্রায় বছর-দশেক।

চলে এলে কেন?

রাখাল ইতস্ততঃ করিয়া শেষে বলিল, আর সুবিধে হ'ল না।

তার বেশী আর বলতে চাও না?

রাখাল আবার কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিল, বলে লাভও নেই, লজ্জাও করে।

তারক আর জানিতে চাহিল না, চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। শেষে বলিল, তোমার নতুন-মা যে তোমাকে এতবড় একটা ভার দিয়ে গেলেন তার কি? যাবে না একবার ব্রজবাবুর ওখানে?

সেই কথাই ভাবছি। না হয় কাল—

কাল? কিন্তু, তিনি যে বলে গেলেন আজ রাত্রেই আবার আসবেন, তখন কি তাঁকে বলবে?

রাখাল হাসিয়া মাথা নাড়িল।

তারক প্রশ্ন করিল, মাথা নাড়ার মানে? বলতে চাও তিনি আসবেন না?

তাই ত মনে হয়। অন্ততঃ অতরাত্রে আসতে পারা সম্ভবপর মনে করিনে।

এবার তারক অধিকতর গম্ভীর হইয়া বলিল, আমি করি। সম্ভব না হলে তিনি কিছুতে বলতেন না। আমার বিশ্বাস তিনি আসবেন, এবং ঠিক এগারোটাতেই আসবেন। কিন্তু তখন তোমার আর কোন জবাব থাকবে না।

কেন?

কেন কি? তাঁর এতবড় দুশ্চিন্তাকে অগ্রাহ্য করে তুমি একটা পা-ও বাড়াও নি এ কথা তুমি উচ্চারণ করবে কোন্ মুখে? সে হবে না রাখাল, তোমাকে যেতে হবে।

রাখাল কয়েক মুহূর্ত তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, তারপরে ধীরে ধীরে বলিল, আমি গেলেও কিছু হবে না তারক। আমার কথা ও-বাড়ির কেউ কানেও তুলবে না।

তার কারণ?

কারণ, পাগল-বরের পক্ষেও যেমন এক মামা কর্তা আছেন, কনের দিকেও তেমনি আর এক মামা বিদ্যমান, ব্রজবাবুর এ পক্ষের বড়কুটুম। অতি শক্তিমান পুরুষ। বস্তুতঃ সে-মামার কর্তৃত্বের বহর জানিনে, কিন্তু এ মামার পরাক্রম বিলক্ষণ জানি। বাল্যকালে পিসীমার অতবড় সুপারিশেও আমাকে নড়াতে পারেনি, এ'র চোখের একটা ইশারার ধাক্কা সামলানো

গেল না. পটুলি হাতে বিদায় নিতে হ'ল। এই বলিয়া সে একটু হাসিয়া কহিল, ভগবান জুটিয়েছেন ভালো। না ভাই বন্ধু, আমি অতি নিরীহ মানুষ—ছেলে পড়াই, রাঁধি-বাড়ি, খাই, বাসায় এসে শুয়ে পড়ি। ফুরসত পেলে অবলা সবলা নির্বিচারে বড়লোকের ফাই-ফরমাস খাটি- বকশিশের আশা করিনে—সে-সব ভাগ্যবানদের জন্যে। নিজের কপালের দৌড় ভাল করেই জেনে রেখেচি—ওতে দুঃখও নেই, একরকম সয়ে গেছে। দিন মন্দ কাটে না, কিন্তু তাই বলে মল্লভূমি ঘেঁষে দাঁড়িয়ে মামায়-মামায় কুস্তি লড়িয়ে তার বেগ সংবরণ করতে পারবো না।

শুনিয়া তারক হাসিয়া ফেলিল। রাখালকে সে যতটা হাবা-বোকা ভাবিত, দেখিল তাহা নয়। জিজ্ঞাসা করিল, দু-পক্ষেই মামা রয়েছে বলে মল্লযুদ্ধ বাধবে কেন?

রাখাল কহিল, তা হলে একটু খুলে বলতে হয়। মামামশায় আমাকে বাড়িটা ছাড়িয়েছেন, কিন্তু তার মায়াটা আজও ঘোচাতে পারেন নি, কাজেই অল্পস্বল্প খবর এসে কানে পৌঁছয়। শোনা গেল, ভগিনীপতির কন্যাদায়ে শ্যালকের আরামেই বেশী বিঘ্ন ঘটাচ্ছে—এ ঘটকালিও তাঁর কীর্তি। সুতরাং, এ-ক্ষেত্রে আমাকে দিয়ে বিশেষ কিছু হবে না, এবং সম্ভবতঃ কাউকে দিয়েই না। পাকা-দেখা আশীর্বাদ, গায়ে-হলুদ পর্যন্ত হয়ে গেছে, অতএব এ বিবাহ ঘটবেই।

তারক কহিল, অর্থাৎ, ও-পক্ষের মামাকে কন্যার মায়ের কাহিনী শোনাতেই হবে: এবং তার পরে ঘটনাটা মুখে মুখে বিস্তারিত হতেও বিলম্ব ঘটবে না, এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফল ও-মেয়ের ভালো-ঘরে আর বিয়েই হবে না।

রাখাল বলিল, আশঙ্কা হয় শেষ পর্যন্ত এমনিই কিছু-একটা দাঁড়াবে।

কিন্তু মেয়ের বাপ ত আজও বেঁচে আছেন?

না, বাপ বেঁচে নেই, শুধু ব্রজবাবু বেঁচে আছেন।

তারক ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিল, রাখাল, চলো না একবার যাই, বাপটা একেবারেই মরেচে না লোকটার মধ্যে এখনো কিছু বাকী আছে, দেখে আসি গে।

তুমি যাবে?

ক্ষতি কি? বলবে ইনি পাত্রের প্রতিবেশী—অনেক কিছুই জানেন।

রাখাল হাসিয়া বলিল, ভালো বুদ্ধি। প্রথমতঃ, সে সত্যি নয়, দ্বিতীয়তঃ, জেরার দাপটে তোমার গোলমেলে উত্তরে তাঁদের ঘোর সন্দেহ হবে তুমি পাড়ার লোক, ব্যক্তিগত শত্রুতা-বশে ভাংচি দিতে এসেচো। তাতে কার্যসিদ্ধি ত হবেই না বরঞ্চ উলটো ফল দাঁড়াবে।

তাইতো! তারক মনে মনে আর একবার রাখালের সাংসারিক বুদ্ধির প্রশংসা করিল, বলিল সে ঠিক। আমাদের জেরায় ঠকতে হবে। নতুন-মার কাছে আরও বেশী খবর জেনে নেওয়া উচিত ছিল। বেশ, আমাকে তোমার একজন বন্ধু বলেই পরিচয় দিও।

হাঁ, দিতে হলে তাই দেবো।

তারক বলিল, এ-বিয়ে বন্ধ করার চেষ্টায় তোমার সাহায্য করি এই আমার ইচ্ছে। আর কিছু না পারি, এই মামাটিকে একবার চোখে দেখেও আসতে পারবো। আর অদৃষ্ট প্রসন্ন হলে শুধু ব্রজবাবুই নয়, তাঁর তৃতীয় পক্ষেরও হয়তো দেখা মিলে যেতে পারে।

রাখাল বলিল, অন্ততঃ অসম্ভব নয়।

তারক প্রশ্ন করিল, এই মহিলাটি কেমন রাখাল?

রাখাল কহিল, বেশ ফরসা মোটা-সোটা পরিপুষ্ট গড়ন, অবস্থাপন্ন বাঙালী-ঘরে একটু বয়স হলেই ওঁরা যেমনটি হয়ে ওঠেন তেমনি।

কিন্তু মানুষটি?

মানুষটি ত বাঙালী-ঘরের মেয়ে। সুতরাং, তাঁদেরই আরও দশজনের মতো। কাপড়-গয়নায় প্রগাঢ় অনুরাগ, উৎকট ও অন্ধ সন্তান-বাৎসল্য, পরদুঃখে সকাতর অশ্রুবর্ষণ, দু-আনা চার-আনা দান এবং পরক্ষণেই সমস্ত বিস্মরণ। স্বভাব মন্দ নয়,—ভালো বললেও অপরাধ হয় না। অল্পস্বল্প ক্ষুদ্রতা, ছোটখাটো উদারতা, একটু-আধটু—

তারক বাধা দিল—থামো থামো। এ-সব কি তুমি ব্রজবাবুর স্ত্রীর উদ্দেশেই শুধু

বলচো, না সমস্ত বাঙালী-মেয়েদের লক্ষ্য করে যা মুখে আসচে বক্তৃতা দিয়ে যাচ্চো, কোনটা?

রাখাল বলিল, দুটোই রে ভাই, দুটোই। শুধু তাৎপর্য গ্রহণ শ্রোতার অভিজ্ঞতা ও অভিরুচিসাপেক্ষ।

শুনিয়া তারক সত্যই বিস্মিত হইল কহিল, মেয়েদের সম্বন্ধে তোমার মনে মনে যে এতটা উপেক্ষা আমি জানতাম না। বরঞ্চ ভাবতাম যে--

রাখাল তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, ঠিকই ভাবতে ভাই, ঠিকই ভাবতে। এতটুকু উপেক্ষা করিনে। ওঁরা ডাকলেই ছুটে যাই, না ডাকলেও অভিমান করিনে, শুধু দয়া করে খাটালেই নিজেকে ধন্য মানি। মহিলারা অনুগ্রহও করেন যথেষ্ট, তাঁদের নিন্দে করতে পারবো না।

তারক বলিল, অনুগ্রহ যাঁরা করেন তাঁদের একটু পরিচয় দাও ত শুনি।

রাখাল বলিল, এইবারেই ফেললে মুশকিলে। জেরা করলেই আমি ঘাবড়ে উঠি। এ-বয়সে দেখলাম শুনলাম অনেক, সাক্ষাৎ-পরিচয়ও বড় কম নেই কিন্তু এমনি বিশ্রী স্মরণ-শক্তি যে কিছুই মনে থাকে না। না তাঁদের বাইরের চেহারা, না তাঁদের অন্তরের। সামনে বেশ কাজ চলে, কিন্তু একটু আড়ালে এসেই সব চেহারা লেপেমুছে একাকার হয়ে যায়। একের সঙ্গে অন্যর প্রভেদ ঠাউরে পাইনে!

তারক কহিল, আমরা পল্লীগ্রামের লোক, পাড়ার আত্মীয়-প্রতিবেশীর ঘরের দু'চারটি মহিলা ছাড়া বাইরের কাউকে চিনিও নে, জানিও নে। মেয়েদের সম্বন্ধে আমাদের এই ত জ্ঞান। কিন্তু এই প্রকাণ্ড শহরের কত নতুন, কত বিচিত্র—

রাখাল হাত তুলিয়া থামাইয়া দিয়া বলিল, কিছু চিন্তা করো না তারক, আমি হদিশ বাতলে দেব। পাড়াগাঁয়ের বলে যাঁদের অবজ্ঞা করচো কিংবা মনে মনে যাঁদের সম্বন্ধে ভয় পাচ্চো, তাঁদেরকেই শহরে এনে পাউডার রুজ প্রভৃতি একটু চেপে মাখিয়ে মাস-দুই খানকয়েক বাছা বাছা নাটক-নভেল এবং সেইসঙ্গে গোটা-পাঁচেক চলতি চালের গান শিখিয়ে নিও—ব্যস্! ইংরেজী জানে না? না জানুক, আগাগোড়া বলতে হয় না, গোটা-কুড়ি ভব্য কথা মুখস্থ করতে পারবে তো? তা হলেই হবে। তার পরে—

তারক বিরক্ত হইয়া বাধা দিল—তার পরেতে আর কাজ নেই রাখাল, থাক। এখন বুঝতে পারছি কেন তোমার গা নেই। ঐ মেয়েটির যেখানে যার সঙ্গেই বিয়ে হোক, তোমার কিছুই যায় আসে না। আসলে ওদের প্রতি তোমার দরদ নেই।

রাখাল সকৌতুকে প্রশ্ন করিল, দরদ হবে কি করে বলে দিতে পারো?

পারি। নির্বিচারে মেলামেশাটা একটু কম করো যা হারিয়েছো তা হয়তো একদিন ফিরে পেতেও পারো। আর কেবল এইজন্যেই নতুন-মার অনুরোধ তুমি স্বচ্ছন্দে অবহেলা করতে পারলে।

রাখাল মিনিট-খানেক নিঃশব্দে তারকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পরিহাসের ভঙ্গীটা ধীরে ধীরে মিলাইয়া আসিল, বলিল, এইবার ভুল হলো। কিন্তু তোমার আগের কথাটায় হয়তো কিছু সত্যি আছে, ওদের অনেকের অনেক-কিছু জানতে পারায় লাভের চেয়ে বোধ হয় ক্ষতিই হয় বেশী। এখন থেকে তোমার কথা শুনবো। কিন্তু যাঁদের সম্বন্ধে তোমাকে বলছিলাম তাঁরা সাধারণ মেয়ে— হাজারের মধ্যে ন'শ নিরানব্বই। তাঁর মধ্যে নতুন-মা নেই। কারণ, ঐ যে একটি বাকী রইলেন তিনিই উনি। ওঁকে অবহেলা করা যায় না, ইচ্ছে করলেও না। কিসের জন্যে আজ তুমি বর্ধমান যেতে পারচো না, সে তুমি জানো না, কিন্তু আমি জানি। কিসের তাগাদায় ঠেলেঠুলে আমাকে এখুনি পাঠাতে চাও মামাবাবুর গহ্বরে, তার হেতু তোমার কাছে পরিষ্কার নয়। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি, ওর বিগত ইতিহাস শুনে ঐ যে কি না বলছিলে তারক, অমন স্ত্রীলোককে ঘৃণা করাই স্বাভাবিক—তোমার ঐ মতটি আর একদিন বদলাতে হবে। ওতে চলবে না।

তারক মুখে হাসি আনিয়া বিদ্রূপের স্বরে বলিল, না চললে জানাবো। কিন্তু ততক্ষণ নিজের কথা অপরের চেয়ে যে বেশী জানি, এটুকু দাবী করলে রাগ করো না রাখাল। কিন্তু এ তর্কে লাভ নেই ভাই—এ থাক। কিন্তু, তোমার কাছে যে আজ পর্যন্ত একটি নারীও শ্রদ্ধার পাত্রী হয়ে টিকে আছেন এ মস্ত আশার কথা। কিন্তু আমরা ওঁর নাগাল

পাবো না রাখাল, আমরা তোমার ঐ একটিকে বাদ দিয়ে বাকী ন'শ নিরানব্বইয়ের ওপরেই শ্রদ্ধা বাঁচিয়ে যদি চলে যেতে পারি, তাতেই আমাদের মতো সামান্য মানুষে ধন্য হয়ে যাবে।

রাখাল তর্ক করিল না—জবাব দিল না। কেবল মনে হইল সহসা সে যেন একটুখানি বিমনা হইয়া গেছে।

কি হে, যাবে?

চলো।

গিয়ে কি বলবে?

মোটের উপর যা সত্যি তাই। বলবো বিশ্বস্তসূত্রে খবর পাওয়া গেছে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেই ভালো।

দুই বন্ধু উঠিয়া পড়িল। রাখাল দরজায় তালা বন্ধ করিয়া যুক্তপাণি কপালে ঠেকাইয়া বলিল, দুর্গা! দুর্গা!

অতঃপর উভয়ে ব্রজবাবুর বাটীর উদ্দেশে যাত্রা করিল।

তারক হাসিয়া কহিল, আজ কোন কাজই হবে না। নামের মাহাত্ম্য টের পাবে।

তিন

পরদিন অপরাহ্ণের কাছাকাছি দুই বন্ধু চায়ের সরঞ্জাম সম্মুখে লইয়া টেবিলে আসিয়া বসিল। টি-পটে চায়ের জল তৈরি হইয়া উঠিতে বিলম্ব দেখিয়া রাখাল চামচে ডুবাইয়া ঘন ঘন তাগিদ দিতে লাগিল।

তারক কহিল, নামের মাহাত্ম্য দেখলে তো?

রাখাল বলিল, অবিশ্বাস করে মা-দুর্গাকে তুমি খামকা চটিয়ে দিলে বলেই তো যাত্রাটা নিষ্ফল হোলো,—নইলে হতো না।

প্রতিবাদে তারক শুধু হাসিয়া ঘাড় নাড়িল।

সত্যই কাল কাজ হয় নাই। ব্রজবাবু বাড়ি ছিলেন না, কোথায় নাকি নিমন্ত্রণ ছিল, এবং মামাবাবু কিঞ্চিৎ অসুস্থ থাকায় একটু সকাল সকাল আহারাদি সারিয়া শয্যাগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাখাল বাটীর মধ্যে দেখা করিতে গেলে, সে যে এখনো তাঁহাদের মনে রাখিয়াছে এই বলিয়া ব্রজবাবুর স্ত্রী বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং ফিরিবার সময়ে অন্যের চোখের অন্তরালে রেণুও আসিয়া মৃদুকণ্ঠে ঠিক এই মর্মেই অনুযোগ জানাইয়াছিল।

তোমার বাবাকে বলতে ভুলো না যে, আমি সন্ধ্যার পরে কাল আবার আসবো। আমার বড় দরকার।

আচ্ছা, কিন্তু চাকরদেরও বলে যাও।

সুতরাং ব্রজবাবুর নিজস্ব ভৃত্যটিকেও এ কথা রাখাল বিশেষ করিয়া জানাইয়া আসিয়াছিল কিন্তু যথাসময়ে বাসায় পৌঁছিতে পারে নাই। আসিয়া দেখিল দরজার কড়ায় জড়ানো একটুকরো কাগজ, তাহাতে পেন্সিলে লেখা—আজ দেখা হলো না, কাল বৈকাল পাঁচটায় আসবো। ন-মা।

আজ সেই পাঁচটার আশাতেই দুই বন্ধুতে পথ চাহিয়া আছে। কিন্তু এখনো তার মিনিট-কুড়ি বাকী। তারক তাগাদা দিয়া কহিল, যা হয়েছে ঢালো। তাঁর আসবার আগে এ-সমস্ত পরিষ্কার করে ফেলা চাই।

কেন? মানুষে চা খায় এ কি তিনি জানেন না?

দেখো রাখাল, তর্ক করো না। মানুষে মানুষের অনেক-কিছু জানে, তবু তার কাছেই অনেক-কিছু সে আড়াল করে। গরু-বাছুরের এ প্রয়োজন হয় না। তা ছাড়া এ-গুলোই বা কি? এই বলিয়া অ্যাশ-ট্রে সমেত সিগারেটের টিনটা তুলিয়া ধরিল। বলিল, পৌরুষ করে এ-ও তাঁকে দেখাতে হবে নাকি?

রাখাল হাসিয়া ফেলিল—দেখে ফেললেও তোমার ভয় নেই, তারক, অপরাধী যে কে তিনি ঠিক বুঝতে পারবেন।

তারক খোঁচাটা অনুভব করিল। বিরক্তি চাপিয়া বলিল, তাই আশা করি। তবু, আমাকে

ভুল বুঝলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু একদিন যাকে মানুষ করে তুলেছিলেন তাকে বুঝতে না পারলে তাঁর অন্যায় হবে।

রাখাল কিছুমাত্র রাগ করিল না, হাসিমুখে নিঃশব্দে চা ঢালিতে প্রবৃত্ত হইল।

তারক চা খাইতে আরম্ভ করিয়া মিনিট-দুই পরে কহিল, হঠাৎ এমন চুপচাপ যে?

কি করি? তিনি আসবার আগে সেই ন'শ নিরানব্বইয়ের ধাক্কাটা মনে মনে একটু সামলে রাখচি ভাই, বলিয়া সে পুনশ্চ একটু হাসিল।

শুনিয়া তারকের গা জ্বলিয়া গেল। কিন্তু, এবার সেও চুপ করিয়া রহিল।

চা খাওয়া সমাপ্ত হইলে সমস্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া দুজনে প্রস্তুত হইয়া রহিল। ঘড়িতে পাঁচটা বাজিল। ক্রমশঃ পাঁচ, দশ, পনেরো মিনিট অতিক্রম করিযা ঘড়ির কাঁটা নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার দেখা নাই। উন্মুখ অধীরতায় সমস্ত ঘরটা যে ভিতরে ভিতরে কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিয়া না বলিলেও পরস্পরের কাছে অবিদিত নাই; এমনি সময়ে সহসা তারক বলিয়া উঠিল, এ কথা ঠিক যে তোমার নতুন-মা অসাধারণ স্ত্রীলোক।

রাখাল অতি বিস্ময়ে অবাক হইয়া বন্ধুর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

তারক বলিল, নারীর এমনি ইতিহাস শুধু বইয়ে পড়েচি, কিন্তু চোখে দেখিনি। যাঁদের চিরদিন দেখে এসেচি তাঁরা ভালো, তাঁরা সতী-সাধ্বী, কিন্তু ইনি যেন—

কথাটা সম্পূর্ণ হইবার আর অবসর পাইল না।

রাজু, আসতে পারি বাবা?

উভয়েই সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। রাখাল দ্বারেব কাছে আসিয়া হেঁট হইয়া প্রণাম করিল, কহিল, আসুন।

তাবক ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিল, কিন্তু তখনি পায়ের কাছে আসিয়া সে-ও নমস্কার করিল।

সকলে বসিবার পরে রাখাল বলিল, কাল সর্বদিক দিয়েই যাত্রা হোলো নিষ্ফল; কাকাবাবু বাড়ি নেই, মামাবাবু গুরুভোজনে অসুস্থ এবং শয্যাগত আপনাকে নিরর্থক ফিরে যেতে হয়েছিল; কিন্তু এর জন্যে আসলে দায়ী হচ্ছে তারক। ওকে এইমাত্র তার জন্যে আমি ভর্ৎসনা করছিলাম। খুব সম্ভব অপরাধের গুরুত্ব বুঝে ও অনুতপ্ত হয়েছে। না দেবে ও মা-দুর্গাকে রাগিয়ে, না হবে আমাদের যাত্রা পণ্ড।

তাবক ঘটনাটি খুলিয়া বলিল।

নতুন-মা হাসিমুখে প্রশ্ন করিলেন, তারক বুঝি এসব বিশ্বাস করো না?

বিশ্বাস করি বলেই তো ভয় পেয়েছিলাম, আজ বোধ হয় কিছু আর হবে না।

তাহার জবাব শুনিয়া নতুন-মা হাসিতে লাগিলেন; পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, কারু সঙ্গেই দেখা হলো না?

রাখাল কহিল, তা হয়েছে মা। বাড়ির গিন্নী আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, পথ ভুলে এসেছি কিনা। ফেরবার মুখে রেণুও ঠিক ঐ নালিশই করলে। অবশ্য আড়ালে। তাকেই বলে এলাম বাবাকে জানাতে আমি আবার কাল সন্ধ্যায় আসবো, আমার অত্যন্ত প্রয়োজন। জানি, আর যে-ই বলতে ভুলুক, সে ভুলবে না।

তোমরা আজ আবার যাবে?

হাঁ, সন্ধ্যার পরেই।

ওরা সবাই বেশ ভালো আছে?

তা আছে।

নতুন-মা চুপ করিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ ধরিয়া মনের অনেক দ্বিধা-সঙ্কোচ কাটাইয়া বলিলেন, রেণু কেমনটি দেখতে হয়েছে রাজু?

রাখাল বিস্ময়াপন্ন মুখে প্রথমটা স্তব্ধ হইয়া রহিল, পরে কৃত্রিম ক্রোধের স্বরে কহিল, প্রশ্নটি ত শুধু বাহুল্য নয়, মা,—হলো অন্যায়। নতুন-মার মেয়ে দেখতে কেমন হওয়া উচিত এ কি আপনি জানেন না? তবে রংটা বোধ হয় একটুখানি বাপের ধার ঘেঁষে গেছে—ঠিক স্বর্ণ-চাঁপা বলা চলে না। বলুন, অই কি নয় নতুন-মা?

মেযের কথায মাযেব দ্বই চোখ ছলছল কবিযা আসিল দেওযালেব ঘডিব দিকে এক মুহূর্ত মুখ তুলিযা বলিলেন তোমাদেব বাব হবাব সময বোধ হয হযে এলো।

না এখনো ঘণ্টা দুই দেবি।

তারক গোডায দুই-একটা ছাড়া আব কথা কহে নাই উভযেব কথোপকথন মন দিযা শুনিতেছিল। যে অজানা মেযেটিব অশুভ অমঙ্গলময বিবাহ সম্বন্ধ ভাঙিযা দিবাব সঙ্কল্প তাহাবা গ্রহণ কবিযাছে সে কেমন দেখিতে জানিতে তাহাব আগ্রহ ছিল কিন্তু ব্যগ্রতা ছিল না, কিন্তু এই যে বাখাল বর্ণনা কবিল না শুধু অনুযোগেব কণ্ঠে মেযেটিব রূপেব ইঙ্গিত কবিল সে যেন তাহাব অন্ধকাব অববুদ্ধ মনেব দশ দিকেব দশখানা জানালা খুলিযা আলোকে আলোকে চকিত চঞ্চল কবিযা দিল। এতক্ষণ সে যেন দেখিযাও কিছু দেখে নাই, এখন মাযেব দিকে চাহিযা অকস্মাৎ তাহাব বিস্মযেব সীমা বহিল না।

নতুন-মার বযস পঁযত্রিশ-ছত্রিশ। রূপে খুঁত নাই তা নয সুমুখেব দাঁত-দুটি উঁচু তাহা কথা কহিলেই চোখে পডে। বর্ণ সত্যই স্বর্ণ চাঁপাব মতো কিন্তু হাত পাযেব গডন ননী-মাখনেব সহিত কোনমতেই তুলনা কবা চলে না। চোখ দীর্ঘাযত নয, নাকও বাঁশী বলিযা ভুল হওযা অসম্ভব কিন্তু একহাবা দীর্ঘচ্ছন্দ দেহে সুষমা ধবে না। কোথায কি আছে না জানিযা অত্যন্ত সহজে মনে হয প্রচ্ছন্ন মর্যাদায এই পবিণত নাবী দেহটি যেন কানায-কানায পবিপূর্ণ। আব সবচেযে চোখে পডে নতুন মাব আশ্চর্য কণ্ঠস্বব। মাধুর্যেব যেন অন্ত নাই।

তাবকেব চমক ভাঙিল নতুন-মাব জিজ্ঞাসায। তিনি হঠাৎ যেন ব্যাকুল হইযা প্রশ্ন করিলেন, বাজু, তোমাব কি মনে হয বাবা এ বিযে বন্ধ কবতে পাববে?

সে-কথা তো বলা যায় না মা।

তোমাব কাকাবাবু কি কিছুই দেখবেন না? কোন কথাই কানে তুলবেন না?

রাখাল বলিল চোখ-কান তো তাঁব আব নেই মা তিনি দেখেন মামাবাবুব চোখে শোনেন গিন্নীর কানে। আমি জানি এ বিযেব সম্বন্ধ তাঁবাই কবেছেন।

কর্তা তবে কি কবেন?

যা চিবদিন কবতেন—সেই গোবিন্দজীব সেবা। এখন শুধু তাব উগ্রতা বেডে গেছে শতগুণে। দোকানে যাবাবও বড সময পান না। ঠাকুবঘব থেকে বাব হতেই বেলা পডে আসে।

তবে বিষয-আশয কাববাব, ঘব-সংসাব দেখে কে?

কাববাব দেখেন মামা আব সংসাব দেখেন তাঁব মা—অর্থাৎ শাশুডী। কিন্তু আমাকে জিজ্ঞাসা কবে লাভ কি বলুন কিছুই আপনাব অজানা নয। একটু থামিযা বলিল আমবা আজও যাবো সত্যি কিন্তু তাঁব নিশ্চিত পবিণামও আপনাব জানা নতুন মা।

নতুন-মা চুপ কবিযা বহিলেন, শুধু মুখ দিযা একটা চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস পডিল। বোধ হয নিরুপাযেব শেষ মিনতি।

হঠাৎ শোনা গেল বাহিবে কে যেন জিজ্ঞাসা কবিতেছে ওহে ছেলে এইটি বাজুবাবুব ঘর?

বালক-কণ্ঠে জবাব হইল না মশাই বাখালবাবুব বাসা।

হাঁ হাঁ, তাঁকেই খুঁজচি। এই বলিযা এক প্রৌঢ ভদ্রলোক দ্বাব ঠেলিযা ভিতবে মুখ বাডাইযা বলিলেন বাজু আছো? বাঃ—এই তো হে! বাখালেব প্রতি চোখ পডিতেই সবল স্নিগ্ধ হাস্যে গৃহেব মাঝখানে আসিযা দাড়াইলেন বলিলেন ভেবেছিলাম বুঝি খুঁজেই পাবো না। বাঃ—দিব্যি ঘবটি তো!

হঠাৎ শেলফের ঈষৎ অন্তবালবর্তিনী মহিলাটিব প্রতি দৃষ্টি পড়ায একটু বিব্রত বোধ করিলেন, পিছু হটিযা দ্বাবেব কাছে আসিযা কিন্তু স্থিব হইযা দাঁড়াইলেন। কযেক মুহূর্ত নিরীক্ষণ করাব পরে বলিলেন নতুন-বৌ না? বলিযাই ঘাড় ফিবাইযা তিনি রাখালেব প্রতি চাহিলেন।

একটা কঠিনতম অবমাননাব মর্মন্তুদ দৃশ্য বিদ্যুদ্বেগে রাখালেব মনশ্চক্ষে ভাসিযা উঠিযা মুখ তাহার মড়ার মত ফ্যাকাশে হইয়া গেল। তারক ব্যাপারটা আন্দাজ কবিয়াও

করিতে পারিল না, তথাপি অজানা ভয়ে সে-ও হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। ভদ্রলোক পর্যায়ক্রমে সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন—তোমরা করছিলে কি? ষড়যন্ত্র? গুলির আড্ডায় কনস্টেবল ঢুকে পড়লেও ত তারা এতো আঁতকে ওঠে না। হয়েচে কি? নতুন-বৌ ত?

মহিলা চৌকি ছাড়িয়া দূরে হইতে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া একধারে সরিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, হাঁ, আমি নতুন-বৌ।

বসো, বসো। ভালো আছো? বলিয়া তিনি নিজেই অগ্রসর হইয়া চৌকি টানিয়া উপবেশন করিলেন; বলিলেন, নতুন-বৌ, আমার রাজুর মুখের পানে একবার চেয়ে দেখো। ও বোধ হয় ভাবলে আমি চিনতে পারামাত্র তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করে এক ঘোরতর সংগ্রাম বাধিয়ে দেবো। ওর ঘরের জিনিসপত্র আর থাকবে না, ভেঙ্গে তচনচ হয়ে যাবে।

তাঁহার বলার ভঙ্গীতে শুধু কেবল তারক ও রাখালই নয়, নতুন-মা পর্যন্ত মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া ফেলিলেন। তারক এতক্ষণে নিঃসন্দেহে বুঝিল ইনিই ব্রজবাবু। তাহার আনন্দ ও বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

ব্রজবাবু অনুরোধ করিলেন, দাঁড়িয়ে থেকো না নতুন-বৌ, বসো।

তিনি ফিরিয়া আসিয়া বসিলে ব্রজবাবু বলিতে লাগিলেন, পরশু রেণুর বিয়ে। ছেলেটি স্বাস্থ্যবান সুন্দর, লেখাপড়া করেচে—আমাদের জানা ঘর। বিষয়-সম্পত্তি টাকা-কড়িও মন্দ নেই। এই কলকাতা শহরেই খান-চারেক বাড়ি আছে। এ-পাড়া ও-পাড়া বললেই হয়, যখন ইচ্ছে মেয়ে-জামাইকে দেখতে পাওয়া যাবে। মনে হয় ত সকল দিকেই ভালো হলো।

একটু থামিয়া বলিলেন, আমাকে তো জানোই নতুন-বৌ, সাধ্যি ছিল না নিজে এমন পাত্র খুঁজে বার করি। সবই গোবিন্দর কৃপা! এই বলিয়া তিনি ডান হাতটা কপালে ঠেকাইলেন।

কন্যার সুখ-সৌভাগ্যের সুনিশ্চিত পরিণাম কল্পনায় উপলব্ধি করিয়া তাঁহার সমস্ত মুখ স্নিগ্ধ প্রসন্নতায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সকলেই চুপ করিয়া রহিলেন, একটা তিক্ত ও একান্ত অপ্রীতিকর বিরুদ্ধ প্রস্তাবে এই মায়াজাল তাঁহারই চক্ষের সম্মুখে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিতে কাহারও প্রবৃত্তি হইল না।

ব্রজবাবু বলিলেন, আমাদের রাখাল-রাজকে ত আর চিঠিতে নিমন্ত্রণ করা যায় না, ওকে নিজে গিয়ে ধরে আনতে হবে। ও ছাড়া আমার করবে কর্মাবেই বা কে। কাল রাত্রে ফিরে গিয়ে রেণুর মুখে যখন খবর পেলাম রাজু এসেছিলো কিন্তু দেখা হয়নি—তার বিশেষ প্রয়োজন, কাল সন্ধ্যায় আবার আসবে—তখনি স্থির করলাম এ সুযোগ আর নষ্ট হতে দিলে চলবে না—যেমন করে হোক খুঁজে-পেতে তার বাসায় গিয়ে আমাকে ঐ ত্রুটি সংশোধন করতেই হবে। তাই দুপুরবেলায় আজ বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু কার মুখ দেখে বেরিয়েছিলাম মনে নেই, আমার এক-কাজে কেবল দু-কাজ নয়, আমার সকল কাজ আজ সম্পূর্ণ হলো।

স্পষ্টই বুঝা গেল তাঁহার ভাগ্য-বিড়ম্বিতা একমাত্র কন্যার বিবাহ ব্যাপারটিকে লক্ষ্য করিয়াই তিনি এ কথা উচ্চারণ করিয়াছেন। মেয়েটা যেন তাহার অপরিজ্ঞাত জীবন-যাত্রার পূর্বক্ষণে জননীর অপ্রত্যাশিত আশীর্বাদ লাভ করিল।

রাখাল অত্যন্ত নিরীহের মত মুখ করিয়া কহিল, বেরোবার সময় মামাবাবু ছিলেন বলে কি মনে পড়ে?

কেন বলো তো?

তিনি ভাগ্যবান লোক, বেরোবার সময়ে তাঁর মুখ দেখে থাকলে হয়তো—

ওঃ—তাই। ব্রজবাবু হাসিয়া উঠিলেন।

নতুন-মা রাখালের মুখের প্রতি অলক্ষ্যে একটুখানি চাহিয়াই মুখ ফিরাইলেন। তাঁহার হাসির ভাবটা ব্রজবাবুর চোখ এড়াইল না, বলিলেন, রাজু, কথাটা তোমার ভালো হয়নি যাই হোক, সম্পর্কে তিনি নতুন-বৌয়েরও ভাই হন; ভাইয়ের নিন্দে বোনেরা কখনো সইতে পারে না। উনি বোধ করি, মনে মনে রাগ করলেন।

রাখাল হাসিয়া ফেলিল। ব্রজবাবুও হাসিলেন, বলিলেন, অসংগত নয়, রাগ করারই কথা কিনা।

তারকের সহিত এখনো তাঁহার পরিচয় ঘটে নাই; লোভটা সে সংবরণ করিতে পারিল না, বলিল, আজ বার হবার সময়ে আপনি দুর্গা নাম উচ্চারণ করেন নি নিশ্চয়ই?

ব্রজবাবু প্রশ্নের তাৎপর্য বুঝিতে পারিলেন না, বলিলেন, কৈ না! অভ্যাস-মতো আমি গোবিন্দ স্মরণ করি, আজও হয়তো তাঁকেই ডেকে থাকব।

তারক কহিল, তাতেই যাত্রা সফল হয়েছে, ও-নামটা করলে শুধু-হাতে ফিরতে হতো।

ব্রজবাবু তথাপি তাৎপর্য বুঝিতে পারিলেন না, চাহিয়া রহিলেন। রাখাল তারকের পরিচয় দিয়া কালকের ঘটনা বিবৃত করিয়া কহিল, ওর মতে দুর্গা নামে কার্য পণ্ড হয়। কালকে যে আপনার দেখা না পেয়ে আমাদের বিফল হয়ে ফিরতে হয়েছিল, তার কারণ বার হবার সময় আমি দুর্গা নাম উচ্চারণ করেছিলাম। হয়তো এ-রকম দুর্ভোগ ওর কপালে পূর্বেও ঘটে থাকবে, তাই ও-নামটার ওপরেই তারক চটে আছে।

শুনিয়া ব্রজবাবু প্রথমটা হাসিলেন, পরে হঠাৎ ছদ্মগাম্ভীর্যে মুখখানা অতিশয় ভারী করিয়া বলিলেন, হয় হে রাখাল-রাজ হয়—ওটা মিথ্যে নয়। সংসারে নাম ও দ্রব্যের মহিমা কেউ আজও সঠিক জানে না। আমিও একজন রীতিমত ভুক্তভোগী। 'ফুট-কড়াই' নাম করলে আর আমার রক্ষে নেই।

জিজ্ঞাসু-মুখে সকলেই চোখ তুলিয়া চাহিল, রাখাল সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল, কিসে?

ব্রজবাবু বলিলেন, তবে ঘটনাটা বলি শোনো। ব্রজবিহারী ব'লে ছেলেবেলায় আমার ডাক-নাম ছিল বলাই। ভয়ানক ফুট-কড়াই খেতে ভালোবাসতাম। ভুগতামও তেমনি। আমার এক দূর-সম্পর্কের ঠাকুরমা সাবধান করে বলতেন--

বলাই, কলাই খেয়ো না—
জানলা ভেঙ্গে বৌ পালাবে দেখতে পাবে না।

ভেবে দেখ দিকি, ছেলেবেলায় ফুট-কড়াই খাওয়ায় বুড়ো-বয়সে আমার কি সর্বনাশ হলো! এ কি দ্রব্যের দোষ-গুণের একটা বড় প্রমাণ নয়? যেমন দ্রব্যের, তেমনি নামেরও আছে বৈ কি।

তারক ও রাখাল লজ্জায় অধোবদন হইল। নতুন-মা ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া চাপা ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, ছেলেদের সামনে এ তুমি করচ কি?

কেন? ওদের সাবধান করে দিচ্ছি। প্রাণ থাকতে যেন কখনো ওরা ফুট-কড়াই না খায়।

তবে তাই করো, আমি উঠে যাই।

ঐ তো তোমার দোষ নতুন-বৌ, চিরকাল কেবল তাড়াই লাগাবে আর রাগ করবে, একটা সত্যি কথা কখনো বলতে দেবে না। ভাবলাম, আসল দোষটা যে সত্যিই কার, এতকাল পরে খবরটা পেলে তুমি খুশী হয়ে উঠবে—তা হলো উলটো।

নতুন-মা হাতজোড় করিয়া কহিলেন, হয়েছে,—এবার তুমি থামো।—রাজু?

রাখাল মুখ তুলিয়া চাহিল।

নতুন-মা বলিলেন, তুমি যে-জন্যে কাল গিয়েছিলে ওঁকে বলো।

রাখাল একবার ইতস্ততঃ করিল, কিন্তু ইঙ্গিতে পুনশ্চ সুস্পষ্ট আদেশ পাইয়া বলিয়া ফেলিল, কাকাবাবু, রেণুর বিবাহ তো ওখানে কোনমতেই হতে পারে না।

শুনিয়া ব্রজবাবু এবার বিস্ময়ে সোজা হইয়া বসিলেন, তাঁহার রহস্য-কৌতুকের ভাবটা সম্পূর্ণ তিরোহিত হইল, বলিলেন, কেন পারে না?

রাখাল কারণটা খুলিয়া বলিল।

কে তোমাকে বললে?

রাখাল ইঙ্গিতে দেখাইয়া বলিল, নতুন-মা।

ওঁকে কে বললে?

আপনি ওঁকেই জিজ্ঞাসা করুন।

ব্রজবাবু স্তব্ধভাবে বহুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, নতুন-বৌ, কথাটা কি সত্যি?

নতুন-মা ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন, হাঁ, সত্য।

ব্রজবাবুর চিন্তার সীমা রহিল না। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাটিলে বলিলেন, তা হলেও উপায় নেই। রেণুর আশীর্বাদ, গায়ে-হলুদ পর্যন্ত হয়ে গেছে, পরশু বিয়ে, একদিনের মধ্যে আমি পাত্র পাবো কোথায়?

নতুন-মা আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, তুমি তো নিজে পাত্র খুঁজে আনোনি মেজকর্তা, যাঁরা এনেছিলেন তাঁদের হুকুম করো।

ব্রজবাবু বলিলেন, তারা শুনবে কেন? তুমি তো জানো নতুন-বৌ, হুকুম করতে আমি জানিনে—কেউ আমার তাই কথা শোনে না। তারা তো পর, কিন্তু তুমিই কি কখনো আমার কথা শুনেচো আজ সত্যি করে বলো দিকি?

হয়তো বিগত-দিনের কি-একটা কঠিন অভিযোগ এই উল্লেখটুকুর মধ্যে গোপন ছিল, সংসারে এই দুটি মানুষ ছাড়া আর কেহ তাহা জানে না। নতুন-মা উত্তর দিতে পারিলেন না, গভীর লজ্জায় মাথা হেঁট করিলেন।

কয়েক মুহূর্ত নীরবে কাটিল। ব্রজবাবু মাথা নাড়িয়া অনেকটা যেন নিজের মনেই বলিয়া উঠিলেন, অসম্ভব।

রাখাল মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, অসম্ভব কি কারণে কাকাবাবু?

ব্রজবাবু বলিলেন, অসম্ভব বলেই অসম্ভব রাজু। নতুন-বৌ জানে না, জানবার কথাও নয়, কিন্তু তুমি তো জানো। তাঁহার কণ্ঠস্বরে, চোখের দৃষ্টিতে নিরাশা যেন ফুটিয়া পড়িল। অন্যথার কথা যেন তিনি ভাবিতেই পারিলেন না।

নতুন-মা মুখ তুলিয়া চাহিলেন, বলিলেন, নতুন-বৌ তো জানে না, তাকে বুঝিয়েই বলো না মেজকর্তা, অসম্ভব কিসের জন্যে? রেণুর মা নেই, তার বাপ আবার যাকে বিয়ে করেছে তার ভাই চায় পাগলের হাতে মেয়ে দিতে,—তাই অসম্ভব? কিছুতেই ঠেকান যায় না, এই কি তোমার শেষ কথা? তাঁহার মুখের পরে ক্রোধ, করুণা, না তাচ্ছিল্য, কিসেব ছায়া যে নিঃসংশয়ে দেখা দিল বলা কঠিন।

দেখিয়া ব্রজবাবুর তৎক্ষণাৎ স্মরণ হইল, যে অবাধ্য নতুন-বৌয়ের বিরুদ্ধে এইমাত্র তিনি অভিযোগ করিয়াছেন এ সেই। রাখালের মনে পড়িল, যে নতুন-মা বাল্যকালে তাহার হাত ধরিয়া নিজের স্বামিগৃহে আনিয়াছিলেন ইনি সেই।

লজ্জা ও বেদনায় অভিসিঞ্চিত যে-গৃহের আলো-বাতাস স্নিগ্ধ হাস্য-পরিহাসের মুক্ত-স্রোতে অভাবনীয় সহৃদয়তায় উজ্জ্বল হইয়া আসিতেছিল, একমুহূর্তেই আবার তাহা শ্রাবণের অমানিশার অন্ধকারের বোঝা হইয়া উঠিল। রাখাল ব্যস্ত হইয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, মা, অনেকক্ষণ তো আপনি পান খাননি? আমার মনে ছিল না মা, অপরাধ হয়ে গেছে।

নতুন-মা কিছু আশ্চর্য হইলেন—পান? পানের দরকার নেই বাবা।

নেই বৈ কি! ঠোঁট দুটি শুকিয়ে কালো হয়ে উঠেচে। কিন্তু আপনি ভাবছেন এখুনি বুঝি হিন্দুস্থানী পান-আলার দোকানে ছুটবো। না মা, সে বুদ্ধি আমার আছে। এসো ত তারক, এই মোড়টার কাছে আমাকে একটু দাঁড়াবে, এই বলিয়া সে বন্ধুর হাতে একটা প্রচন্ড টান দিয়া দ্রুতবেগে দুজনে ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল।

এইবার নিরালা গৃহের মধ্যে মুখোমুখি বসিয়া দুজনেই সঙ্কোচে মরিয়া গেলেন। নিঃসম্পর্কীয় যে-দুটি লোক মেঘখণ্ডের ন্যায় এতক্ষণ আকাশের সূর্যালোক বাধাগ্রস্ত রাখিয়াছিল, তাহাদের অন্তর্ধানের সঙ্গে-সঙ্গেই বিনির্মুক্ত রবিকরে ঝাপসা কিছুই আর রহিল না। স্বামী-স্ত্রীর গভীর ও নিকটতম সম্বন্ধ যে এমন ভয়ঙ্কর বিকৃত ও লজ্জাকর হইয়া উঠিতে পারে, এই নিভৃত নির্জনতায় তাহা ধরা পড়িল। ইতিপূর্বের হাস্য-পরিহাসের অবতারণা যে কত অশোভন ও অসঙ্গত এ কথা ব্রজবাবুর মনে পড়িল, এবং অপরিচিত পুরুষদের সম্মুখে ঐ লজ্জাবলুণ্ঠিত নিঃশব্দ নারীর উদ্দেশে অবক্ষিপ্ত ফুট-কড়াইয়ের রসিকতা যেন এখন তাঁহার নিজেরই কান মলিয়া দিল। মনে হইল, ছি ছি, করিয়াছি কি!

পান আনার ছল করিয়া রাখাল তাঁহাদের একলা রাখিয়া গেছে। কিন্তু সময় কাটিতেছে

নীরবে। হয়তো তাহারা ফিরিল বলিয়া। এমন সময় কথা কহিলেন নতুন-বৌ প্রথমে। মুখ তুলিয়া বলিলেন, মেজকর্তা, আমাকে তুমি মার্জনা কর।

ব্রজবাবু বলিলেন, মার্জনা করা সম্ভব বলে তুমি মনে করো?

করি কেবল তুমি বলেই। সংসারে আর কেউ হয়তো পারে না, কিন্তু তুমি পারো। তাঁহার চোখ দিয়া এতক্ষণে জল গড়াইয়া পড়িল।

ব্রজবাবু ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া কহিলেন, নতুন-বৌ, মার্জনা করতে তুমি পারতে?

নতুন-বৌ আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিলেন, আমরা তো পারিই মেজকর্তা। পৃথিবীতে এমন কোন মেয়ে আছে যাকে স্বামীর এ অপরাধ ক্ষমা করতে হয় না? কিন্তু আমি সে তুলনা দিইনে, আমার ভাগ্যে এমন স্বামী পেয়েছিলাম যিনি দেহে-মনে নিষ্পাপ, যিনি সব সন্দেহের ওপরে। আমি কি করে তোমাকে এর জবাব দেবো?

কিন্তু আমার মার্জনা নিয়ে তুমি করবে কি?

যতদিন বাঁচবো মাথায় তুলে রাখবো। আমাকে কি তুমি ভুলে গেছো মেজকর্তা?

তোমার মনে কি হয় বলো তো নতুন-বৌ?

এ প্রশ্নের জবাব আসিল না। শুধু স্তব্ধ নত-মুখে উভয়েই বসিয়া রহিলেন।

খানিক পরে ব্রজবাবু বলিলেন, মার্জনা চেয়ো না নতুন-বৌ, সে আমি পারবো না। যতদিন বাঁচবো তোমার ওপরে এ অভিমান আমার যাবে না। তবু, পাছে স্বামীর অভিশাপে তোমার কষ্ট বাড়ে এই ভয়ে কোনদিন তোমাকে অভিশাপ দিইনি। কিন্তু এমন অদ্ভুত কথা তুমি বিশ্বাস করতে পারো নতুন-বৌ?

নতুন-বৌ মুখ না তুলিযাই বলিল, পারি।

ব্রজবাবু বলিলেন, তা হলে আর আমি দুঃখ করবো না। সেদিন আমাকে সবাই বললে অন্ধ, বললে নির্বোধ, বললে দেখিয়ে দিলেও যে দেখতে পায় না, প্রমাণ করে দিলেও যে বিশ্বাস করে না, তার দুর্দশা এমন হবে না তো হবে কার! কিন্তু দুর্দশা হয়েছে বলেই কি নিজেকে অন্ধ বলে মেনে নিতে হবে নতুন-বৌ? বলতে হবে, যা করেছি আমি সব ভুল? জানি, ভাই আমাকে ঠকিয়েছে, আমাকে ঠকিয়েচে বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন, দাস-দাসী, কর্মচারী—ঠকিয়েছে অনেকেই। কিন্তু, সব যখন যেতে বসেছিল, সেই দুর্দিনে তোমাকে বিবাহ করে আমিই তো ঘরে আনি। তুমি এসে একে একে সমস্ত বন্ধ করলে, সব লোকসান পূর্ণ হয়ে এলো—সেই-তোমাকে অবিশ্বাস করতে পারিনি বলে আমি হলাম অন্ধ, আর যারা চক্রান্ত করে, বাইরের লোক জড়ো করে, তোমাকে নীচে টেনে নামিয়ে বাড়ির বার করে দিলে তারাই চক্ষুষ্মান? তাদের নালিশ, তাদের নোংরা কথায় কান দিইনি বলেই আজ আমার এই দুর্গতি? আমার দুঃখের এই কি হলো সত্যি ইতিহাস? তুমিই বল তো নতুন-বৌ?

নতুন-বৌ কখন যে মুখ তুলিয়া স্বামীর মুখের প্রতি দুই চোখ মেলিয়া চাহিয়াছিল বোধ হয় তাহা নিজেই জানিত না, এখন হঠাৎ তাঁহার কথা থামিতেই সে যেন চমকিয়া আবার মুখ নীচু করিল।

ব্রজবাবু বলিলেন, তুমি ছিলে শুধুই কি স্ত্রী? ছিলে গৃহের লক্ষ্মী, সমস্ত পরিবারের কর্ত্রী, আমার সকল আত্মীয়ের বড় আত্মীয়, সকল বন্ধুর বড় বন্ধু—তোমার চেয়ে শ্রদ্ধা ভক্তি আমাকে কে কবে করেচে? এমন করে মঙ্গল কে কবে চেয়েছে? কিন্তু একটা কথা আমি প্রায়ই ভাবি নতুন-বৌ, কিছুতেই জবাব পাইনে। আজ দৈবাৎ যদি কাছে পেয়েচি, বল তো সেদিন কি হয়েছিল? এত আপনার হয়েও কি আমাকে সত্যিই ভালোবাসতে পারোনি? না বুঝে তুমি ত কখনো কিছু করো না,—দেবে এর সত্যি জবাব? যদি দাও, হয়তো আজও মনের মধ্যে আবার শান্তি পেতে পারি। বলবে?

নতুন-বৌ মুখ তুলিয়া চাহিল না, কিন্তু মৃদুকণ্ঠে কহিল, আজ নয় মেজকর্তা।

আজ নয়? তবে, কবে দেবে বল? আর যদি দেখা না হয়, চিঠি লিখে জানাবে?

এবার নতুন-বৌ চোখ তুলিয়া চাহিল, কহিল, না মেজকর্তা, আমি তোমাকে চিঠিও লিখবো না, মুখেও বলবো না।

তবে জানবো কি করে?

জানবে যেদিন আমি নিজে জানতে পারবো।

কিন্তু, এ যে হেঁয়ালি হলো।

তা হোক। আজ আশীর্বাদ করো, এর মানে যেন একদিন তোমাকে বুঝিয়ে দিতে পারি।

দ্বারের বাহির হইতে সাড়া আসিল, আমার বড্ড দেরি হয়ে গেল। এই বলিয়া রাখাল প্রবেশ করিল, এক ডিবা পান সম্মুখে রাখিয়া দিয়া বলিল, সাবধানে তৈরি করিয়ে এনেচি মা, এতে অশুচি স্পর্শদোষ ঘটেনি। নিঃসঙ্কোচে মুখে দিতে পারেন।

নতুন-বৌ ইঙ্গিতে স্বামীকে দেখাইয়া দিতে রাখাল ঘাড় নাড়িল।

ব্রজবাবু বলিলেন, আমি তেরো বচ্ছর পান খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি নতুন-বৌ, এখন তুমি হাতে করে দিলেও মুখে দিতে পারবো না।

সুতরাং পানের ডিবা তেমনিই পড়িয়া রহিল, কেহ মুখে দিতে পারিলেন না।

তারক আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার বাসায় যাইবার কথা, অথচ যায় নাই, কাছেই কোথাও অপেক্ষা করিতেছিল। যে কারণেই হোক, সে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকিতে চাহে না। তাহার এই অবাঞ্ছিত কৌতূহল রাখালের চোখে বিসদৃশ ঠেকিল, কিন্তু সে চুপ করিয়াই রহিল।

ব্রজবাবু বলিলেন, নতুন-বৌ, তোমার সেই মোটা বিছে-হারটা কি ভটচায্যি-মশায়ের ছোট মেয়েকে বিয়ের সময় দেবে বলেছিলে? বিয়ে অনেকদিন হয়ে গেছে, দুটি ছেলেমেয়েও হয়েছে, এতকাল সঙ্কোচে বোধ করি চাইতে পারেনি, কিন্তু এবার পুজোর সময়ে এসে সে হারটা চেয়েছিল—দেবো?

নতুন-বৌ বলিলেন, হাঁ, ওটা তাকে দিয়ো।

ব্রজবাবু কহিলেন, আর একটা কথা। তোমার যে-টাকাটা কারবারে লাগানো ছিল, সুদে-আসলে সেটা হাজার-পঞ্চাশ হয়েছে। কি করবে সেটা? তুলে তোমাকে পাঠিয়ে দেব?

তুলবে কেন, আরও বাড়ুক না।

না নতুন-বৌ, সাহস হয় না। বরিশালের চালানি সুপারির কাজে অনেক টাকা লোকসান গেছে—থাকলেই হয়তো টান ধরবে।

নতুন-বৌ একটু ভাবিয়া বলিলেন, এ ভয় আমার বরাবর ছিল। গোকুল সাহাকে সরিয়ে দিয়ে তুমি বীরেনকে পাঠাও। আমার টাকা মারা যাবে না।

ব্রজবাবুর চোখ দুটো হঠাৎ সজল হইয়া উঠিল। সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, নিজেও ত বুড়ো হলাম গো, আরও খাটবো কত কাল? ভাবচি সব তুলে দিয়ে এবার—

ঠাকুরঘর থেকে বার হবে না, এই তো? না, সে হবে না।

ব্রজবাবু নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন, বহুক্ষণ পর্যন্ত একটি কথাও কহিলেন না। মনে মনে কি যে ভাবিতে লাগিলেন বোধহয় একটিমাত্র লোকই তাহার আভাস পাইল।

হঠাৎ এক সময়ে বলিয়া উঠিলেন, দেখ নতুন-বৌ, সোনাপুরের কতকটা অংশ দাদার ছেলেদের ছেড়ে দেওয়া তুমি উচিত মনে কর?

নতুন-বৌ বলিলেন, তাদের তো আর কিছুই নেই। সবটাই ছেড়ে দাও না।

সবটা?

ক্ষতি কি?

বেশ, তাই হবে। তোমার মনে আছে বোধ হয় দাদার বড়মেয়ে জয়দুর্গাকে কিছু দেবার কথা হয়েছিল। জয়দুর্গা বেঁচে নেই, কিন্তু তার একটি মেয়ে আছে, অবস্থা ভাল নয়, এরা ভাগ্নীকে কিছুই দিতে চায় না। তুমি কি বল?

নতুন-বৌ বলিলেন, সোনাপুরের আয় বোধ হয় হাজার টাকার ওপর। জয়দুর্গার মেয়েকে একশো টাকার মত ব্যবস্থা করে দিলে অন্যায় হবে না।

ভালো, তাই হবে।

আবার কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিল।

হাঁ নতুন-বৌ, তোমার গয়নাগুলো কি সব সিন্দুকেই পচবে? কেবল তৈরিই করালে, কখনো পরলে না। দেবো সেগুলো তোমাকে পাঠিয়ে?

নতুন-বৌ হঠাৎ বোধ হয় প্রস্তাবটা বুঝিতে পারেন নাই, তার পরে মাথা হেঁট করিলেন।

একটু পরেই দেখা গেল টেবিলের উপরে টপটপ করিয়া কয়েক ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িল।

ব্রজবাবু শশব্যস্তে বলিয়া উঠিলেন, থাক থাক, নতুন-বৌ, তোমার রেণু পরবে। ও-কথায় আর কাজ নেই।

মিনিট পাঁচ-ছয় পরে তিনি ঘড়ির দিকে চাহিয়া কহিলেন, সন্ধ্যা হয়ে আসচে, এবার তাহলে আমি উঠি।

তাঁহার সন্ধ্যা-আহ্নিক, গোবিন্দের সেবা—এই সকল নিত্যকর্তব্যের কোন কারণেই সময় লঙ্ঘন করা চলে না তাহা রাখাল জানিত। সে-ও ব্যস্ত হইয়া পড়িল। প্রৌঢ়কালে ব্রজবাবুর ইহাই যে প্রত্যহের প্রধান কাজ, নতুন-বৌ তাহা জানিতেন না। আঁচলে চোখ মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, রেণুর বিয়ের কথাটা তো শেষ হলো না মেজকর্তা।

ব্রজবাবু বলিলেন, তুমি যখন চাও না তখন ও-বাড়িতে হবে না।

নতুন-বৌ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, বাঁচলাম।

ব্রজবাবু বলিলেন, কিন্তু বিয়ে তো বন্ধ রাখা চলবে না। সুপাত্র পাওয়া চাই, দুটো খেতে-পরতে পায় তাও দেখা চাই। রাজু, তোমার তো বাবা অনেক বড়ঘরে যাওয়া-আসা আছে, তুমি একটি স্থির করে দিতে পারো না। এমন মেয়ে তো কেউ সহজে পাবে না।

রাখাল অধোমুখে মৌন হইয়া রহিল।

নতুন-বৌ বলিলেন, এত তাড়াতাড়ির দরকার কি মেজকর্তা?

ব্রজবাবু মাথা নাড়িলেন,—সে হয় না নতুন-বৌ। নির্দিষ্ট দিনে দিতেই হবে—দেশাচার অমান্য করতে পারবো না। তা ছাড়া, আরও অমঙ্গলের সম্ভাবনা।

কিন্তু এর মধ্যে সুপাত্র যদি না পাওয়া যায়?

পেতেই হবে।

কিন্তু না পাওয়া গেলে? পাগলের বদলে বাঁদরের হাতে মেয়ে দেবে?

সে মেয়ের কপাল।

তার চেয়ে হাত-পা বেঁধে ওকে জলে ফেলে দিও! তাই তো দিচ্ছিলে।

আলোচনা পাছে বাদানুবাদে দাঁড়ায় এই ভয়ে রাখাল মাঝখানে কথা কহিল, বলিল, মামাবাবু কি রাগারাগি করবেন মনে হয় কাকাবাবু?

ব্রজবাবু ম্লান হাসিয়া বলিলেন, মনে হয় বৈ কি। হেমন্তর স্বভাব তুমি জানোই ত রাজু। সহজে ছাড়বে না।

রাখাল খুব জানিত—তাই চুপ করিয়া রহিল।

নতুন-বৌ হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, তোমার মেয়ে, যেখানে ইচ্ছে বিয়ে দেবে, ইচ্ছে না হলে দেবে না, তাতে হেমন্তবাবু বাধা দেবেন কেন? দিলেই বা তুমি শুনবে কেন?

প্রত্যুত্তরে ব্রজবাবু 'না' বলিলেন বটে, কিন্তু গলায় জোর নাই, তাহা সকলেই অনুভব করিল। নতুন-বৌ বলিতে লাগিলেন, তোমার ছেলে নেই, শুধু দুটি মেয়ে। এরা যা পাবে তাতে খুঁজলে কলকাতা শহরে সুপাত্রের অভাব হবে না, কিন্তু সে কটা দিন তোমাকে স্থির হয়ে থাকতেই হবে। আশীর্বাদ, গায়ে-হলুদের ওজর তুলে ভূত-প্রেত পাগল-ছাগলের হাতে মেয়ে সম্প্রদান করা চলবে না। এর মধ্যে হেমন্তবাবু বলে কেউ নেই। বুঝলে মেজকর্তা?

ব্রজবাবু বিষণ্নমুখে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, হাঁ।

রাখাল কথা কহিল, বলিল, এ হলো সহজ যুক্তি ও ন্যায়-অন্যায়ের কথা মা, কিন্তু হেমন্তবাবুকে তো আপনি জানেন না। রেণু অনেক কিছু পাবে বলেই তার অদৃষ্টে আজ মামাবাবুর পাগল আত্মীয় জুটেছে, নইলে জুটতো না—ও নিঃশ্বাস ফেলবার সময় পেতো। মামাবাবু এক কথায় হাল ছাড়বার লোক নয় মা।

কি করবেন তিনি শুনি?

রাখাল জবাব দিতে গিয়া হঠাৎ চাপিয়া গেল। ব্রজবাবু দেখিয়া বলিলেন, লজ্জা নেই রাজু, বলো। আমি অনুমতি দিচ্ছি।

তথাপি রাখালের সঙ্কোচ কাটে না, ইতস্ততঃ করিয়া শেষে কহিল, ও-লোকটা গায়ে হাত দিতে পর্যন্ত পারে।

কার গায়ে হাত দিতে পারে রাজু? মেজকর্তার?

হাঁ, একবার ঠেলে ফেলে দিয়েছিল, পনর-ষোল দিন কাকাবাবু উঠতে পারেন নি।

নতুন-মার চোখের দৃষ্টি হঠাৎ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল,—তার পরেও ও-বাড়িতে আছে? খাচ্চে পরচে?

রাখাল বলিল, শুধু নিজে নয়, মাকে পর্যন্ত এনেছেন। কাকাবাবুর শাশুড়ী। পরিবার নেই, মারা গেছেন, নইলে তিনিও বোধ করি এতদিনে এসে হাজির হতেন। শেকড় গেড়ে ওরা বসেছে মা, নড়ায় সাধ্য কার? আমাকে একদিন নিজে আশ্রয় দিয়ে এনেছিলেন বলে কেউ টলাতে পারেনি, কিন্তু মামাবাবুর একটা ভ্রূকুটির ভার সইলো না, ছুটে পালাতে হলো। সত্যি কথা বলি মা, রেণুর বিয়ে নিয়ে কাকাবাবুর সম্বন্ধে আমার মস্ত ভয় আছে।

নতুন-বৌ বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া রহিলেন। নিরুপায় নিষ্ফল আক্রোশে তাঁহার চোখ দিয়া যেন আগুনের স্রোত বহিতে লাগিল।

রাখাল ইঙ্গিতে ব্রজবাবুকে দেখাইয়া বলিল, এখন হেমন্তবাবু বাড়ির কর্তা, তাঁর মা হলেন গিন্নী। এই দাবানলের মধ্যে এই শান্ত, নিরীহ মানুষটিকে একলা ঠেলে দিয়ে আমার কিছুতে ভয় ঘোচে না। অথচ পাগলের হাত থেকে রেণুকে বাঁচাতেই হবে। আজ আপনার মেয়ে, আপনার স্বামী বিপদে কূল-কিনারা পায় না মা, এ ভাবলেও আমার মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করে।

নতুন-মা জবাব দিলেন না, শুধু সম্মুখের টেবিলের উপর ধীরে ধীরে মাথা রাখিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

তারক উত্তেজনায় ছটফট করিয়া উঠিল। সংসারে এত বড় নালিশ যে আছে ইহার পূর্বে সে কল্পনাও করে নাই। আর ঐ নির্বাক, নিস্পন্দ পাষাণ-মূর্তি,—কি কথা সে ভাবিতেছে!

মিনিট দুই-তিন কাটিল, কে জানে আরও কতক্ষণ কাটিত,—বাহির হইতে রুদ্ধদ্বারে ঘা পড়িল। বুড়ি-ঝি মনে করিয়া রাখাল কপাট খুলিতেই একজন ব্যস্ত-ব্যাকুল বাঙালী চাকর ঘরে ঢুকিয়া পড়িল—মা?

নতুন-মা মুখ তুলিয়া চাহিলেন—তুই যে?

সে অত্যন্ত উত্তেজিত, কহিল, ড্রাইভার নিয়ে এলো মা। শিগগির চলুন, বাবু ভয়ানক রাগ করচেন।

কথাটা সামান্যই, কিন্তু কদর্যতার সীমা রহিল না। ব্রজবাবু লজ্জায় আর একদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন।

চাকরটার বিলম্ব সহে না, তাগাদা দিয়া পুনশ্চ কহিল, উঠে পড়ুন মা, শিগগির চলুন। গাড়ি এনেচি।

কেন?

লোকটা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। স্পষ্টই বুঝা গেল বলিতে তাহার নিষেধ আছে।

বাবু কেন ডাকচেন?

চলুন না মা, পথেই বলবো।

আর তর্ক না করিয়া নতুন-মা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন, চললাম মেজকর্তা।

চললে?

হাঁ। এ কি তুমি ডেকে পাঠিয়েচো যে, জোর করে, রাগ করে বলবো, এখন যাবার সময় নেই, তুই যা? আমাকে যেতেই হবে। যাকে কখনো কিছু বলোনি, তোমার সেই নতুন-বৌকে আজ একবার মনে করে দেখো তো মেজকর্তা, দেখো তো তাকে আজ চেনা যায় কিনা।

ব্রজবাবু মুখ তুলিয়া নির্নিমেষে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

নতুন-বৌ বলিলেন, মার্জনা ভিক্ষে চেয়েছিলাম, কিন্তু স্বীকার করোনি—উপেক্ষা করে বললে, এ নিয়ে তোমার হবে কি! কখনো তোমার কাছে কিছু চাইনি, চাইতে তোমার কাছে আমার লজ্জা করে, অভিমান হয়। কিন্তু আর যে-যাই বলুক মেজকর্তা, অমন কথা তুমি কখনো আমাকে বলো না। বলবে না বলো?

ব্রজবাবুর বুকের মধ্যে যেন ভূমিকম্প হইয়া গেল। বহু দিন পূর্বের একটা ঘটনা মনে পড়িল—তখন রেণুর জন্মের পর নতুন-বৌ পীড়িত। কি-একটা জরুরী কাজে তাঁহার ঢাকা যাইবার প্রয়োজন, সেদিনও এই নতুন-বৌ কণ্ঠস্বরে এমনি আকুলতা ঢালিয়াই মিনতি জানাইয়াছিল—ঘুমিয়ে পড়লে ফেলে রেখে আমাকে পালাবে না বলো? সেদিন বহু ক্ষতি স্বীকার করিয়াই তাঁহাকে ঢাকা যাওয়া বন্ধ করিতে হইয়াছিল। সেদিনও স্ত্রৈণ বলিয়া তাঁহাকে গঞ্জনা দিতে লোকে ত্রুটি করে নাই। কিন্তু আজ?

চাকরটা বুঝিল না কিছুই, কিন্তু ব্যাপার দেখিয়া, হঠাৎ কেমন ভয় পাইয়া বলিয়া ফেলিল, মা, তোমার নীচের ভাড়াটে একজন আফিং খেয়ে মর-মর হয়েচে--তাই এসেচি ডাকতে।

নতুন-বৌ সভয়ে প্রশ্ন করিল, কে আফিং খেলে রে?

জীবনবাবুর স্ত্রী।

জীবনবাবু কোথায়?

চাকরটা বলিল, তাঁর সাত-আট দিন খোঁজ নেই। শুনেচি, আফিসের চাকরি গেছে বলে পালিয়েছে।

কিন্তু তোর বাবু করছেন কি? হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা হয়েছে?

চাকরটা বলিল, কিছুই হয়নি মা, পুলিশের ভয়ে বাবু দোকানে চলে গেছেন। তোমার বাড়ি, তোমার ভাড়াটে, তুমিই তার উপায় করো মা, বৌটা হয়তো বাঁচবে না।

রাখাল উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, দরকার হতে পারে মা, আমি কি আপনার সঙ্গে যেতে পারি?

নতুন-মা বলিলেন, কেন পারবে না বাবা, এসো। যাবার পূর্বে এবার তিনি হাত দিয়া স্বামীর পা-দুটি স্পর্শ করিয়া মাথায় ঠেকাইলেন।

সকলে বাহির হইলে রাখাল ঘরে তালা দিয়া নতুন-মার অনুসরণ করিল।

চার

নতুন-মা ডাকেন নাই, রাখাল নিজে যাচিয়া তাঁহার সাহায্য করিতে চলিয়াছে।

তখনকার দিনে রমণীবাবু রাখাল-রাজকে ভালো করিয়াই চিনিতেন। তাহার পরে দীর্ঘ তের বৎসর গত হইয়াছে এবং উভয় পক্ষেই পরিবর্তন ঘটিয়াছে বিস্তর, কিন্তু তাহাকে না চিনিবারও হেতু নাই; অন্ততঃ সেই সম্ভাবনাই সমধিক।

গাড়ির মধ্যে বসিয়া রাখাল ভাবিতে লাগিল, হয়তো তিনি দোকানে যান নাই, হয়তো ফিরিয়া আসিয়াছেন, হয়তো বাড়িতে না থাকার অপরাধে তাহারি সম্মুখে নতুন-মাকে অপমানের একশেষ করিয়া বসিবেন—তখন লজ্জা ও দুঃখ রাখিবার ঠাঁই থাকিবে না,—এইরূপ নানা চিন্তায় সে নতুন-মার পাশে বসিয়াও অস্থির হইয়া উঠিল। স্পষ্ট দেখিতে লাগিল তাঁহার এই অভাবিত আবির্ভাবে রমণীবাবুর ঘোরতর সন্দেহ জাগিবে এবং রেণুর বিবাহ ব্যাপারটা যদি নতুন-মা গোপনে রাখিবার সঙ্কল্পই করিয়া থাকেন ত তাহা নিঃসন্দেহে ব্যর্থ হইয়া যাইবে। কারণ, সত্য ও মিথ্যা অভিযোগের নিরসনে আসল কথাটা তাঁহাকে অবশেষে প্রকাশ করিতেই হইবে।

সেই অভদ্র চাকরটা ড্রাইভারের পাশে বসিয়াছিল; মনিবের ভয়ে তাহার তাগিদের উদ্‌ভ্রান্ত রূক্ষতা ও প্রত্যুত্তরে নতুন-মার বেদনাক্ষুব্ধ লজ্জিত কথাগুলি রাখালের মনে পড়িল, এবং সেই জিনিসেরই পুনরাবৃত্তি স্বয়ং মনিবের মুখ হইতে এখন কি আকার ধারণ করিবে ভাবিয়া অতিষ্ঠ হইয়া কহিল, নতুন-মা, গাড়িটা থামাতে বলুন, আমি নেবে যাই।

নতুন-মা বিস্ময়াপন্ন হইলেন—কেন বাবা, কোথাও কি খুব জরুরী কাজ আছে?

রাখাল বলিল, না, কাজ তেমন নেই,—কিন্তু আমি বলি আজ থাক।

কিন্তু মেয়েটাকে যদি বাঁচানো যায় সে তো আজই দরকার রাজু। অন্য দিনে ত হবে না।

বলা কঠিন। রাখাল সংকোচ ও কুণ্ঠায় বিপন্ন হইয়া উঠিল. শেষে মৃদুকণ্ঠে বলিল, মা, আমি ভাবচি পাছে রমণীবাবু কিছু মনে করেন।

শুনিয়া নতুন-মা হাসিলেন—ওঃ, তাই বটে। কিন্তু কে-একটা লোক কি-একটা মনে করবে বলে মেয়েটা মারা যাবে বাবা? বড় হয়ে তোমার বুঝি এই বুদ্ধি হয়েছে! তা ছাড়া, শুনলে তো তিনি বাড়ি নেই, পুলিশ-হাঙ্গামার ভয়ে পালিয়েছেন। হয়তো দু-তিনদিন আর এ-মুখো হবেন না।

রাখাল আশ্বস্ত হইল না। ঠিক বিশ্বাস করিতেও পারিল না, প্রতিবাদও করিল না। ইতিমধ্যে গাড়ি আসিয়া দ্বারে পৌঁছিল। দেখিল তাহার অনুমানই সত্য। একজন প্রৌঢ় গোছের ভদ্রলোক উপরের বারান্দায় থামের আড়ালে দাঁড়াইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, দ্রুত পদে নামিয়া আসিলেন। রাখাল মনে মনে প্রমাদ গণিল।

তাঁহার চোখে-মুখে কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ পরিপূর্ণ, কহিলেন, এলে? শুনেচো ত জীবনের স্ত্রী কি সর্বনাশ—

কথাটা সম্পূর্ণ হইল না, সহসা রাখালের প্রতি চোখ পড়িতেই থামিয়া গেলেন।

নতুন-মা বলিলেন, রাজুকে চিনতে পারলে না?

তিনি একমুহূর্ত ঠাহর করিয়া বলিয়া উঠিলেন, ওঃ,—রাজু। আমাদের রাখাল! বেশ, চিনতে পারবো না? নিশ্চয়।

রাখাল পূর্বেকার প্রথা-মতো হেঁট হইয়া নমস্কার করিল। রমণীবাবু তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, এতকাল একবার দেখা দিতে নেই হে! বেশ যা হোক সব। কিন্তু কি সর্বনাশ করলে মেয়েটা! পুলিশে এবার বাড়িসুদ্ধ সবাইকে হয়রান করে মারবে। দুশ্চিন্তার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, বার বার তোমাকে বলি নতুন-বৌ, যাকে-তাকে ভাড়াটে রেখো না। লোকে বলে শূন্য গোয়াল ভালো। নাও, এবার সামলাও। একটা কথা যদি কখনো আমার শুনলে!

রাখাল কহিল, একে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন নি কেন?

হাসপাতালে? বেশ! তখন কি আর ছাড়ানো যাবে ভাবো? আত্মহত্যা যে!

রাখাল কহিল, কিন্তু তাঁকে বাঁচানোর চেষ্টা করা চাই তো। নইলে আত্মহত্যা যে তাঁকে বধ করায় গিয়ে দাঁড়াবে।

রমণীবাবু ভয় পাইয়া বলিলেন, সে ত জানি হে, কিন্তু হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে কিছু-একটা করে ফেললেই ত হবে না। একটা পরামর্শ করা ত দরকার? পুলিশের ব্যাপার কিনা।

নতুন মা বলিলেন, তাহলে চলো; কোন ভালো এটর্নির অফিসে গিয়ে আগে পরামর্শ করে আসা যাক।

রমণীবাবু জ্বলিয়া গেলেন—তামাশা করলেই ত হয় না নতুন-বৌ, আমার কথা শুনলে আজ এ বিপদ ঘটতো না।

এ-সকল অনুযোগ অর্থহীন উচ্ছ্বাস ব্যতীত কিছুই নয়, তাহা নূতন লোক রাখালও বুঝিল। নতুন-মা জবাব দিলেন না, হাসিয়া শুধু রাখালকে কহিলেন, চলো ত বাবা, দেখি গে কি করা যায়। রমণীবাবুকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, তুমি ওপরে গিয়ে বসো গে সেজো-বাবু, ছেলেটাকে নিয়ে আমি যা পারি করি গে, কেবল এইটি ক'রো, ব্যস্ত হয়ে লোকজনকে যেন বিব্রত করে তুলো না।

নীচের তলায় তিন-চারটি পরিবার ভাড়া দিয়া বাস করে। প্রত্যেকের দুখানি করিয়া ঘর, বারান্দায় একটা অংশ তক্তার বেড়া দিয়া এক সার রান্নাঘরের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে ইঁহাদের রন্ধন ও খাবার কাজ চলে। জলের কল, পায়খানা প্রভৃতি সাধারণের অধিকারে। ভাড়াটেরা সকলেই দরিদ্র ভদ্র কেরানী, ভাড়ার হার যথেষ্ট কম বলিয়া মাসের শেষে বাসা বদল করার রীতি এ-বাটীতে নাই—সকলেই প্রায় স্থায়িভাবে বাস করিয়া আছেন। শুধু জীবন চক্রবর্তী ছিল নূতন, এ বাড়িতে বোধ করি বছর-দুয়েকের বেশী নয়। তাহারই স্ত্রী আফিং খাইয়া বিভ্রাট বাধাইয়াছে। বৌটির নিজের ছেলেপুলে ছিল না বলিয়া সমস্ত ভাড়াটে-দের ছেলেমেয়ের ভার ছিল তাহার 'পরে। স্নান করানো, ঘুম পাড়ানো, ছেঁড়া জামা-কাপড় সেলাই করা—এ-সব সে-ই করিত। গৃহিণীদের 'হাত-জোড়া' থাকিলেই ডাক পড়িত জীবনের

বাঁকে—কারণ, সে ছিল 'ঝাড়া-হাত-পা'র মানুষ, অতএব তাহার আবার কাজ কিসের? এত অল্প বয়সে কুঁড়েমি ভাল নয়,—বৌটির সম্বন্ধে এই ছিল সকল ভাড়াটের সর্ববাদি-সম্মত অভিমত। সে যাই হোক, শান্ত ও নিঃশব্দ প্রকৃতির বলিয়া সবাই তাহাকে ভালবাসিত, সবাই স্নেহ করিত; কিন্তু স্বামীর যে তাহার পাঁচ-ছয় মাস ধরিয়া কাজ নাই এবং সে-ও যে আজ সাত-আটদিন নিরুদ্দেশ এ-খবর ইহাদের কানে পোঁছিল শুধু আজ—সে যখন মরিতে বসিয়াছে; কিন্তু তবুও কাহারও বিশ্বাস হইতে চাহে না—জীবনের বৌ যে আফিং খাইতে পারে,—এ যেন সকলের স্বপ্নের অগোচর।

রাখালকে লইয়া নতুন-মা যখন তাহার ঘরে ঢুকিলেন তখন সেখানে কেহ ছিল না। বোধ করি পুলিশের হাঙ্গামার ভয়ে সবাই একটুখানি আড়ালে গা-ঢাকা দিয়াছিল। ঘরখানি যেন দৈন্যের প্রতিমূর্তি। দেওয়ালের কাছে দুখানি ছোট জলচৌকি, একটির উপরে দুইখানি পিতল-কাঁসার বাসন ও অন্যটির উপরে একটি টিনের তোরঙ্গ। অল্পমূল্যের একখানি তক্তপোশের উপরে জীর্ণ শয্যায় পড়িয়া বৌটি। তখনও জ্ঞান ছিল, পুরুষ দেখিয়া শিথিল হাতখানি মাথায় তুলিয়া আঁচলটুকু টানিয়া দিবার চেষ্টা করিল। নতুন-মা বিছানার একধারে বসিয়া আর্দ্রকণ্ঠে কহিলেন, কেন এ কাজ করতে গেলে মা, আমাকে সব কথা জানাও নি কেন? হাত দিয়া তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিলেন, বলিলেন, সত্যি করে বলো তো মা, কতটুকু আফিং খেয়েচো? কখন খেয়েচো?

এখন সাহস পাইয়া অনেকেই ভিতরে আসিতেছিল, পাশের ঘরের প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটি বলিল, পয়সা তো বেশী ছিল না মা, বোধ হয় সামান্য একটুখানি খেয়েচে,—আর খেয়েচে বোধ হয় বিকেল বেলায়। আমি যখন জানতে পারলুম তখনও কথা কইছিল।

রাখাল নাড়ী দেখিল, হাত দিয়া চোখের পাতা তুলিয়া পরীক্ষা করিল, বলিল, বোধ হয় ভয় নেই নতুন-মা, আমি একখানা গাড়ি ডেকে আনি, হাসপাতালে নিয়ে যাই।

বৌটি মাথা নাড়িয়া আপত্তি জানাইল।

রাখাল বলিল, এভাবে মরে লাভ কি বলুন তো? আর, আত্মহত্যার মতো পাপ নেই তা কি কখনো শোনেন নি? যে স্ত্রীলোকটি বলিতেছিল, বাড়িতে ডাক্তার আনিয়া চিকিৎসার চেষ্টা করা উচিত, রাখাল তাহার জবাবে নতুন-মাকে দেখাইয়া কহিল, ইনি যখন এসেছেন তখন টাকার জন্যে ভাবনা নেই—একজনের জায়গায় দশজন ডাক্তার এনে হাজির করে দিতে পারি, কিন্তু তাতে সুবিধে হবে না নতুন-মা। আর, হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে প্রাণটা যদি ওঁর বাঁচানো যায় পুলিশের হাত থেকে দেহটাকেও বাঁচানো যাবে, এ ভরসা আপনাদের আমি দিতে পারি!

নতুন-মা সম্মত হইয়া বলিলেন, তাই করো বাবা, গাড়ি আমার দাঁড়িয়েই আছে তুমি নিয়ে যাও।

তাঁহার আদেশে একজন দাসী সঙ্গে গিয়া পোঁছাইয়া দিতে রাজী হইল। নতুন-মা রাখালের হাতে কতকগুলা টাকা গুঁজিয়া দিলেন।

সন্ধ্যা শেষ হইয়াছে, আসন্ন রাত্রির প্রথম অন্ধকারে রাখাল অর্ধ-সচেতন এই অপরিচিতা বধূটিকে জোর করিয়া গাড়িতে তুলিয়া হাসপাতালের উদ্দেশে যাত্রা করিল। পথের মধ্যে উজ্জ্বল গ্যাসের আলোকে এই মরণপথযাত্রী নারীর মুখের চেহারা তাহার মাঝে মাঝে চোখে পড়িয়া মনে হইতে লাগিল যেন ঠিক এমনটি সে আর কখনও দেখে নাই। তাহার জীবনে মেয়েদের সে অনেক দেখিয়াছে। নানা বয়সের, নানা অবস্থার, নানা চেহারার। একহারা, দোহারা, তেহারা, চারহারা—খেংরা-কাঠির ন্যায়, ঢ্যাঙা, বেঁটে—কালো, সাদা, হলদে, পাঁশুটে—চুল-বাঁধা, চুল-ওঠা—পাস-করা, ফেল-করা—গোল ও লম্বা মুখের—এমন কত। আত্মীয়তার ও পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতায় অভিজ্ঞতা তাহার পর্যাপ্তেরও অধিক। এদের সম্বন্ধে এই বয়সেই তাহার আদেখ্‌লে-পনা ঘুচিয়াছে। ঠিক বিতৃষ্ণা নয়, একটা চাপা অবহেলা কোথায় তাহার মনের এককোণে অত্যন্ত সঙ্গোপনে পুঞ্জিত হইয়া উঠিতেছিল, কাল তাহাতে প্রথমে ধাক্কা লাগিয়াছিল নতুন-মাকে দেখিয়া। তের বৎসর পূর্বেকার কথা সে প্রায় ভুলিয়াই ছিল, কিন্তু সেই নতুন-মা যৌবনের আর একপ্রান্তে পা দিয়া কাল যখন তাহার ঘরের মধ্যে গিয়া দেখা দিলেন, তখন সকৃতজ্ঞ-চিত্তে আপনাকে সংশোধন করিয়া এই

কথাটাই মনে মনে বলিয়াছিল যে, নারীর সত্যকার রূপ যে কতবড় দুর্লভ-দর্শন তাহা জগতের অধিকাংশ লোকে জানেই না। আজ গাড়ির মধ্যে আলো ও আঁধারের ফাঁকে ফাঁকে মরণাপন্ন এই মেয়েটিকে দেখিয়া ঠিক সেই কথাটাই সে আর একবার মনে মনে আবৃত্তি করিল। বয়স উনিশ-কুড়ি, সাজসজ্জা-আভরণহীন দরিদ্র ভদ্র গৃহস্থের মেয়ে, অনশন ও অর্ধাশনে পাণ্ডুর মুখের 'পরে মৃত্যুর ছায়া পড়িয়াছে—কিন্তু রাখালের মুগ্ধ চক্ষে মনে হইল, মরণ যেন এই মেয়েটিকে একেবারে রূপের পারে পৌঁছাইয়া দিয়াছে। কিন্তু ইহা দেহের অক্ষুণ্ন সুষমায়, না অন্তরের নীরব মহিমায়, রাখাল নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিল না। হাসপাতালে সে তার যথাসাধ্য,—সাধ্যেরও অধিক করিবে সংকল্প করিল, কিন্তু এই দুঃখ-সাধ্য প্রচেষ্টার বিফলতার চিন্তায় করুণায় তাহার চোখের জল আসিয়া পড়িল। হঠাৎ সঙ্গিনী স্ত্রীলোকটির কাঁধের উপর হইতে মাথাটা টলিয়া পড়িতেছিল, রাখাল শশব্যস্তে হাত বাড়াইয়াই তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলাইয়া ফেলিল।

এই অপরিচিতার তুলনায় তাহার কত বড়-ঘরের মেয়েদেরই না এখন মনে পড়িতে লাগিল। সেখানে রূপের লোলুপতায় কি উগ্র অনাবৃত ক্ষুধা। দীনতার আচ্ছাদনে কত বিচিত্র আয়োজন, কত মহার্ঘ প্রসাধন—কি তার অপব্যয়! পরস্পরের ঈর্ষা-কাতর নেপথ্য-আলোচনায় কি জ্বালাই না সে বার বার চোখে দেখিয়াছে।

আর, সমাজের আর-একপ্রান্তে এই নিরাভরণ বধূটি? এই কুণ্ঠিতশ্রী, এই অদৃষ্টপূর্ব মাধুর্য ইহাও কি অহংকৃত আত্মম্ভরিতায় তাহারা উপহাসে কলুষিত করিবে?

সে ভাবিতে লাগিল, কি-জানি দায়গ্রস্ত কোন্ ভিখারী মাতা-পিতার কন্যা এ, কোন্ দুর্ভাগা কাপুরুষের হাতে ইহাকে তাহারা বিসর্জন দিয়াছিল। কি জানি, কতদিনের অনাহারে এই নির্বাক্ মেয়েটি আজ ধৈর্য হারাইয়াছে, তথাপি যে সংসার তাহাকে কিছুই দেয় নাই, ভিক্ষাপাত্র হাতে তাহাকে দুঃখ জানাইতে চাহে নাই। যতদিন পারিয়াছে মুখ বুজিয়া তাহারি কাজ, তাহারি সেবা করিয়াছে। হয়তো সে শক্তি আর নাই—সে শক্তি নিঃশেষিত—তাই কি আজ এ ধিক্কারে, বেদনায়, অভিমানে তাঁহারি কাছে নালিশ জানাইতে চলিয়াছে যে-বিধাতা তাঁর রূপের পাত্র উজাড় করিয়া দিয়া একদিন ইহাকে এ সংসারে পাঠাইয়াছিলেন?

কল্পনার জাল ছিঁড়িয়া গেল। রাখাল চকিত হইয়া দেখিল, হাসপাতালের আঙ্গিনায় গাড়ি আসিয়া থামিয়াছে। স্ট্রেচারের জন্য ছুটিতেছিল, কিন্তু মেয়েটি নিষেধ করিল। অবশিষ্ট সমগ্র শক্তি প্রাণপণে সজাগ করিয়া তুলিয়া সে ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, আমাকে তুলে নিয়ে যেতে হবে না, আমি আপনিই যেতে পারবো, এই বলিয়া সে সঙ্গিনীর দেহের 'পরে ভর দিয়া কোনমতে টলিতে টলিতে অগ্রসর হইল।

এখানে বৌটি কি করিয়া বাঁচিল, কি করিয়া আইনের উপদ্রব কাটিল, রাখাল কি করিল, কি দিল, কাহাকে কি বলিল, এ-সকল বিস্তারিত বিবরণ অনাবশ্যক। দিন চার-পাঁচ পরে রাখাল কহিল, কপালে দুঃখ যা লেখা ছিল তা ভোগ হলো, এখন বাড়ি চলুন।

মেয়েটি শান্ত কালো চোখদুটি মেলিয়া নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল, কোন কথা বলিল না। রাখাল কহিল, এখানকার শিক্ষিত, সুসভ্য সাম্প্রদায়িক বিধি-নিয়মে আপনার নাম হলো মিসেস চকারবুটি, কিন্তু এ অপমান আপনাকে করতে পারবো না। অথচ মুশকিল এই যে, কিছু-একটা বলে ডাকাও ত চাই।

শুনিয়া মেয়েটি একেবারে সোজা সহজ গলায় বলিল, কেন, আমার নাম যে সারদা। কিন্তু আমি কত ছোট, আমাকে আপনি বললে আমার বড় লজ্জা করে।

রাখাল হাসিয়া বলিল, করার কথাই ত। আমি বয়সে কত বড়। তা হলে, যাবার প্রস্তাবটা আমাকে এইভাবে করতে হয়—সারদা, এবার তুমি বাড়ি চলো।

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল, আমি আপনাকে কি বলে ডাকবো? নাম তো করা চলে না?

রাখাল বলিল, না চললেও উপায় আছে। আমার পৈতৃক নাম রাখাল—রাখাল-রাজ।

তাই ছেলেবেলায় নতুন-মা ডাকতেন রাজু বলে। এর সঙ্গে একটা 'বাবু' জুড়ে দিয়ে তো অনায়াসে ডাকা চলে সারদা।

মেয়েটি মাথা নাড়িয়া বলিল, ও একই কথা। আর গুরুজনেরা যা বলে ডাকেন তাই হয় নাম। আমাদের দেশে ব্রাহ্মণকে বলে দেব্‌তা। আমিও আপনাকে দেব্‌তা বলে ডাকবো।

ইঃ! বলো কি? কিন্তু ব্রাহ্মণত্ব আমার যে কানাকড়ির নেই সারদা!

নেই থাক। কিন্তু দেবতাত্ব ষোল আনায় আছে। আর, ব্রাহ্মণের ভালো-মন্দর আমরা বিচার করিনে, করতেও নেই।

জবাব শুনিয়া, বিশেষ করিয়া বলার ধরনটায় রাখাল মনে মনে একটু বিস্মিত হইল। সারদা পল্লীগ্রামের কোন্ এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের মেয়ে, সুতরাং যতটা অশিক্ষিতা ও অমার্জিতা বলিয়া সে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল ঠিক ততটা এখন মনে করিতে পারিল না। আর একটা বিষয় তাহার কানে বাজিল। পল্লীগ্রামে শূদ্ররাই সাধারণতঃ ব্রাহ্মণকে দেবতা বলিয়া সম্বোধন করে, তাহার নিজের গ্রামেও ইহার প্রচলন আছে, কিন্তু ব্রাহ্মণ-কন্যার মুখে এ যেন তাহার কেমন-কেমন ঠেকিল। তবে এক্ষেত্রে বিশেষ-কোন অর্থ যদি মেয়েটির মনে থাকে ত সে স্বতন্ত্র কথা। কহিল, বেশ, তাই বলেই ডেকো, কিন্তু এখন বাড়ি চলো। এরা আর তোমাকে এখানে রাখবে না।

মেয়েটি অধোমুখে নিরুত্তরে বসিয়া রহিল।

রাখাল ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া কহিল, কি বলো সারদা, বাড়ি চলো?

এবার সে মুখ তুলিয়া চাহিল। আস্তে আস্তে বলিল, আমি বাড়ি-ভাড়া দেবো কি করে? তিন-চাব মাসের বাকী পড়ে আছে, আমরা তাও ত দিতে পারিনি।

রাখাল হাসিয়া কহিল, সেজন্যে ভাবনা নেই।

সারদা সবিস্ময়ে কহিল, নেই কেন?

না থাকবার কারণ, বাড়ি-ভাড়া তোমার স্বামী দেবেন। লজ্জায়, অভাবের জ্বালায় বোধ হয় কোথাও লুকিয়ে আছেন, শীঘ্রই ফিরে আসবেন, কিংবা হয়তো এসেছেন, আমরা গিয়েই দেখতে পাবো।

না, তিনি আসেন নি।

না এসে থাকলেও আসবেন নিশ্চয়ই।

সারদা বলিল, না, তিনি আসবেন না।

আসবেন না? তোমাকে একলা ফেলে রেখে চিরকালের মতো পালিয়ে যাবেন—এ কি কখনো হতে পারে? নিশ্চয় আসবেন।

না।

না? তুমি জানলে কি করে?

আমি জানি।

তাহার কণ্ঠস্বরের প্রগাঢ়তায় তর্ক করিবার কিছু রহিল না। রাখাল স্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া বলিল, তা হলে হয় তোমার শ্বশুরবাড়ি, নয় তোমার বাপের বাড়িতে চলো। আমি পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেবো।

মেয়েটি নিঃশব্দ নতমুখে বসিয়া রহিল, উত্তর দিল না।

রাখাল একমুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া বলিল, কোথায় যাবে, শ্বশুরবাড়ি?

মেয়েটি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

তবে কি বাপের বাড়ি যেতে চাও?

সে তেমনি মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

রাখাল অধীর হইয়া উঠিল—এ তো বড় মুশকিল! এখানকার বাসাতেও যাবে না, শ্বশুরবাড়িতেও যাবে না, বাপের ঘরেও যেতে চাও না,—কিন্তু চিরকাল হাসপাতালে থাকবার ত ব্যবস্থা নেই সারদা। কোথাও যেতে হবে ত?

প্রশ্নটা শেষ করিয়াই সে দেখিতে পাইল মেয়েটির হাঁটুর কাছে অনেকখানি কাপড় চোখের জলে ভিজিয়া গেছে এবং এইজন্যই সে কথা না কহিয়া শুধু মাথা নাড়িয়াই এতক্ষণ প্রশ্নের উত্তর দিতেছিল।

ও কি সারদা, কাঁদচো কেন, আমি অন্যায় ত কিছু বলিনি!

শুনিবামাত্র সে তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া ফেলিল, কিন্তু তখনি কথা কহিতে পারিল না। রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করিতে সময় লাগিল, কহিল, আমি ভাবতে আর পারিনে—আমাকে মরতেও কেউ দিলে না।

রাখাল মনে মনে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু শেষ কথাটায় বিরক্ত হইল—এ অভিযোগটা যেন তাহাকেই। তথাপি কণ্ঠস্বর পূর্বের মতই সংযত রাখিয়া বলিল, মানুষে একবারই বাধা দিতে পারে সারদা, বার বার পারে না। যে মরতেই চায় তাকে কিছুতেই বাঁচিয়ে রাখা যায় না। আর ভাবতেই যদি চাও, তারও অনেক সময় পাবে। এখন বরঞ্চ বাসায় চলো, আমি গাড়ি ডেকে এনে তোমাকে পেঁছে দিয়ে আসি। আমার আরো ত অনেক কাজ আছে।

খোঁচাগুলি মেয়েটি অনুভব করিল কিনা বুঝা গেল না রাখালের মুখের পানে চাহিয়া বলিল, আমি যে ভাড়া দিতে পারবো না দেব্‌তা।

না পারো দিও না।

আপনি কি মাকে বলে দেবেন?

রাখাল কহিল, না। ছেলেবেলায় বাবা মারা গেলে তোমার মতো নিঃসহায় হয়ে আমিও একদিন তাঁর কাছে ভিক্ষে চাইতে যাই। ভিক্ষে কি দিলেন জানো? যা প্রয়োজন, যা চাইলাম, —সমস্ত। তারপরে হাত ধরে শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে এলেন,—অন্ন দিয়ে বস্ত্র দিয়ে, বিদ্যে দান করে আমাকে এত বড় করলেন। আজ তাঁরই কাছে যাবো পরের হয়ে দয়ার আর্জি পেশ করতে? না, তা করব না। যা করা উচিত তিনি আপনি করবেন, কাউকে তোমার সুপারিশ ধরতে হবে না।

মেয়েটি অল্পক্ষণ মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিল, আপনাকে কখনো ত এ বাড়িতে দেখিনি?

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কতদিন এ বাড়িতে এসেছো?

প্রায় দু'বছর।

রাখাল কহিল, এর মধ্যে আমার আসার সুযোগ হয়নি।

মেয়েটি আবার কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া বলিল, কলকাতায় কত লোকে চাকরি করে, আমার কি কোথাও একটা দাসীর কাজ যোগাড় হতে পারে না?

রাখাল বলিল, পারে। কিন্তু তোমার বয়স কম, তোমার উপর উপদ্রব ঘটতে পারে। তোমাদের ঘরের ভাড়া কত?

সারদা কহিল, আগে ছিল ছ টাকা, কিন্তু এখন দিতে হয় শুধু তিন টাকা।

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, হঠাৎ কমে গেল কেন? বাড়ি-আলাদের তো এ স্বভাব নয়।

সারদা বলিল, জানিনে। বোধ হয় ইনি কখনো তাঁর দুঃখ জানিয়ে থাকবেন।

রাখাল লাফাইয়া উঠিল, বলিল, তবেই দেখো। আমি বলচি তোমার ভাবনা নেই, তুমি চল। আচ্ছা তোমার খেতে-পরতে মাসে কত লাগে?

সারদা চিন্তা না করিয়াই কহিল, বোধ হয় আরও তিন-চার টাকা লাগবে।

রাখাল হাসিল, কহিল, তুমি বোধ হয় একবেলা খাবার কথাই ভেবে রেখেচো সারদা, কিন্তু তা-ও কুলোবে না। আচ্ছা, তুমি কি বাংলা লেখাপড়া জানো না?

সারদা কহিল, জানি। আমার হাতের লেখাও বেশ স্পষ্ট।

রাখাল খুশী হইয়া উঠিল, কহিল, তা হলে তো কোন চিন্তাই নেই। তোমাকে আমি লেখা এনে দেবো, যদি নকল করে দাও, তোমাকে দশ-পনেরো-কুড়ি টাকা পর্যন্ত আমি স্বচ্ছন্দে পাইয়ে দিতে পারবো; কিন্তু যত্ন করে লিখতে হবে, বেশ স্পষ্ট আর নির্ভুল হওয়া চাই। কেমন, পারবে তো?

সারদা প্রত্যুত্তরে শুধু মাথা নাড়িল, কিন্তু আনন্দে তাহার সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। দেখিয়া রাখালের আর একবার চমক লাগিল। অন্ধকার গৃহের মধ্যে আকস্মিক বিদ্যুদ্দীপালোকে এই মেয়েটির আশ্চর্য রূপে যেন সে একটা অত্যাশ্চর্য মূর্তির সাক্ষাৎ লাভ করিল।

রাখাল কহিল, যাই, এবার গাড়ি ডেকে আনি গে?

মেয়েটি বলিল, হাঁ আনুন। আর আমার ভাবনা নেই। বোধ হয়, এইজন্যেই আমি যেতে পেলাম না, ভগবান আমাকে ফিরিয়ে দিলেন।

রাখাল গাড়ি আনিতে গেল, ভাবিতে ভাবিতে গেল, সারদা আমাকে বিশ্বাস করিয়াছে। একদিকে এই কটি টাকা, আর একদিকে—? তুলনা করিতে পারে এমন কিছুই তাহার মনে পড়িল না।

বাসায় পোঁছিয়া রাখাল নতুন-মার সন্ধানে উপরে গিয়া শুনিল তিনি বাড়ি নাই। কখন এবং কোথায় গিয়াছেন দাসী খবর দিতে পারিল না। কেবল এইটুকু বলিতে পারিল যে, বাড়ির মোটরখানা আস্তাবলেই পড়িয়া আছে. সুতরাং হয় তিনি আর কোন গাড়ি পথের মধ্যে ভাড়া করিয়া লইয়াছেন, না হয় পায়ে হাঁটিয়াই গেছেন।

রাখাল উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, সঙ্গে কে গেছে?

দাসী কহিল, কেউ না। দরোয়ানজীকেও দেখলুম বাইরে বসে আছে।

আর নবীনবাবু?

দাসী কহিল. আমাদের বাবু? তিনি ত রোজ আসেন না। এলেও রাত্রি নটা-দশটা হয়।

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, রোজ আসেন না তার মানে? না এলে থাকেন কোথায়?

দাসী একটুখানি মুখ টিপিয়া হাসিল. কহিল, কেন, তাঁর কি বাড়ি-ঘরদোর নেই নাকি?

রাখাল আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করিল না, মনে মনে বুঝিল আসল ব্যাপারটা ইহাদের অজানা নয়। নীচে আসিয়া দেখিল সারদাকে ঘিরিয়া সেখানে মেয়েদের প্রকাণ্ড ভিড়। আর শিশুর দল. যাহারা তখন পর্যন্ত ঘুমায় নাই, তাহাদের আনন্দ-কলরোলে হাট বসিয়া গেছে। তাহাকে দেখিয়া সকলেই সরিয়া গেল.—যে-প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটির জিম্মায় সারদার ঘরের চাবি ছিল সে আসিয়া তালা খুলিয়া দিয়া গেল।

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল. তোমার স্বামীর কোন খবর পাওয়া যায়নি?

সারদা কহিল, না।

আশ্চর্য!

না. আশ্চর্য এমন আর কি।

বলো কি সারদা. এর চেয়ে বড় আশ্চর্য আর কিছু আছে নাকি?

সারদা ইহার জবাব দিল না। কহিল. আমি আলোটা জ্বালি. আপনি আমার ঘরে এসে একটু বসুন। ততক্ষণ মাকে একবার প্রণাম করে আসি গে।

রাখাল কহিল মা বাড়ি নেই।

সারদা কহিল. নেই কোথাও গেছেন বোধ করি। হয় কালীঘাটে. নয় দক্ষিণেশ্বরে—এমন প্রায়ই যান—কিন্তু এখুনি ফিরবেন। আমি আলোটা জ্বালি, হাত-মুখ ধোবার জল এনে দিই,—একটু বসুন, আমার ঘরে আপনার পায়ের ধুলো পড়ুক।

রাখাল সহাস্যে কহিল, পায়ের ধুলো পড়তে বাকী নেই সারদা, সে আগেই পড়ে গেছে।

সারদা বলিল, সে জানি। কিন্তু সে আমার অজ্ঞানে—আজ সজ্ঞানে পড়ুক আমি চোখে দেখি।

রাখাল কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। কথাটা অভাবনীয়ও নয়. অবাক হইবার মতোও নয়—সে তাহাকে মৃত্যুমুখ হইতে বাঁচাইয়াছে, এবং বাঁচিবার পথ দেখাইয়া দিয়াছে—এই মেয়েটি পল্লীগ্রামের যত অল্প-শিক্ষিতাই হউক. তাহার সকৃতজ্ঞ চিত্ত-তলে এমন একটি সকরুণ প্রার্থনা নিতান্তই স্বাভাবিক; কিন্তু কথাটির জন্য ত নয়, বলিবার অপরূপ বিশিষ্টতায় রাখাল অত্যন্ত বিস্ময় বোধ করিল, এবং বহু পরিচিত রমণীর মুখ ও বহু পরিচিত কণ্ঠস্বর তাহার চক্ষের পলকে মনে পড়িয়া গেল। একটু পরে বলিল আচ্ছা. আলো জ্বালো; কিন্তু আজ আমার কাজ আছে—কাল-পরশু আবার আমি আসবো।

আলো জ্বালা হইলে সে ক্ষণকালের জন্য ভিতরে আসিয়া তক্তপোশে বসিল. পকেট হইতে কয়েকটা টাকা বাহির করিয়া পাশে রাখিয়া দিয়া কহিল. এটা তোমার পারিশ্রমিকের সামান্য কিছু আগাম সারদা।

কিন্তু আমাকে দিয়ে আপনার কাজ চলে তবেই ত? প্রথমে হয়তো খারাপ হবে কিন্তু

আমি নিশ্চয় শিখে নেবো। দেখবেন আমার হাতের লেখা? আনবো কালি-কলম? বলিয়া সে তখনি উঠিতেছিল, কিন্তু রাখাল ব্যস্ত হইয়া বাধা দিল,—না না, এখন থাক। আমি জানি তোমার হাতের লেখা ভালো, আমার বেশ কাজ চলে যাবে।

সারদা একটুখানি শুধু হাসিল। জিজ্ঞাসা করিল, আপনার বাড়িতে কে কে আছেন দেব্‌তা?

রাখাল জবাব দিল, এখানে আমার তো বাড়ি নয়, আমার বাসা। আমি একলা থাকি।

তাঁদের আনেন না কেন?

রাখাল বিপদে পড়িল। এ প্রশ্ন তাহাকে অনেকেই করিয়াছে, জবাব দিতে সে চিরদিনই কুণ্ঠা বোধ করিয়াছে; ইহারও উত্তরে বলিল, শহরে আনা কি সহজ?

সহজ যে নয় এ কথা মেয়েটি নিজেই জানে। হয়তো তাহারও কোন পল্লী অঞ্চলের কথা মনে পড়িল, একটু চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এখানে কে তবে আপনার কাজ করে দেয়?

রাখাল বলিল, ঝি আছে।

রাঁধে কে? বামুনঠাকুর?

রাখাল সহাস্যে কহিল, তবেই হয়েছে। সামান্য একটি প্রাণীর রান্নার জন্যে একটা গোটা বামুনঠাকুর? আমি নিজেই করে নিই। কুকার বলে একটা জিনিসের নাম শুনেচো? তাতে আপনি রান্না হয়। শুধু খাবার সামগ্রীগুলো সাজিয়ে রেখে দিলেই হোল।

সারদা বলিল, আমি জানি। তারপরে খাওয়া হয়ে গেলে ঝি মেজে-ধুয়ে রেখে দিয়ে যায়?

হাঁ, ঠিক তাই।

সে আর কি কি কাজ করে?

রাখাল কহিল, যা দরকার সমস্ত করে দেয়। আমি তাকে বলি নানী—আমাকে কোন-কিছু ভাবতে হয় না। আচ্ছা, তোমার আজ কি খাওয়া হবে বলো তো? ঘরে জিনিসপত্র তো কিছু নেই, দোকান থেকে আনিয়ে দিয়ে যাবো?

সারদা বলিল, না। আজ আমার সকলের ঘরে নেমন্তন্ন। কিন্তু আপনাকে গিয়ে ত রান্নার চেষ্টা করতে হবে?

রাখাল কহিল, না, হবে না। যে করবার সে করে রেখেচে।

আচ্ছা ধরুন যদি তার অসুখ হয়ে থাকে?

না হয়নি। তার বুড়ো-হাড় খুব মজবুত। তোমাদের মতো অল্পে ভেঙে পড়ে না।

কিন্তু দৈবাতের কথা তো বলা যায় না, হতেও তো পারে—তা হলে?

রাখাল হাসিয়া বলিল, তা হলেও ভাবনা নেই। আমার বাসার কাছেই ময়রার দোকান, সে আমাকে ভালবাসে, কষ্ট পেতে দেয় না।

সারদা কহিল, আপনাকে সবাই ভালবাসে। তখনি বলিল, আপনি চা খেতে খুব ভালবাসেন—

কে তোমাকে বললে?

আপনি নিজেই সেদিন হাসপাতালে বলছিলেন। আপনার মনে নেই। অনেকক্ষণ তো কিছু খাননি, তৈরি করে আনবো? একটুখানি বসবেন?

কিন্তু চায়ের ব্যবস্থা তো তোমার ঘরে নেই, কোথায় পাবে?

সে আমি খুব পাবো, বলিয়া সারদা দ্রুতপদে উঠিয়া যাইতেছিল, রাখাল তাহাকে নিষেধ করিয়া বলিল, এমন সময়ে চা আমি খাইনে সারদা, আমার সহ্য হয় না।

তবে কিছু খাবার আনিয়ে দিই—দেবো? অনেকক্ষণ কিছু খাননি, নিশ্চয় আপনার খুব ক্ষিদে পেয়েছে।

কিন্তু কে এনে দেবে? তোমার তো লোক নেই।

আছে। হারু আমার খুব কথা শোনে, তাকে বললেই ছুটে যাবে। বলিয়াই সে আবার তেমনি ব্যস্ত হইয়া উঠিতে যাইতেছিল, কিন্তু এবারও রাখাল বারণ করিল।

সারদা জিদ করিল না বটে, কিন্তু তাহার বিষণ্ণ মুখের পানে চাহিয়া রাখালের আবার

সেই সকল বহু-পরিচিত মেয়েদের মুখ মনে পড়িল। ইহাদের মধ্যে তাহার অনেক আনাগোনা, অনেক জানাশুনা, অনেক সভ্যতা ভদ্রতার দেনা-পাওনা, কিন্তু ঠিক এই জিনিসটি সে যেন অনেকদিন হইল ভুলিয়া আছে। তাহার নিজের জননীর স্মৃতি অত্যন্ত ক্ষীণ অতি শৈশবেই তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন,—একখানি খোড়ো-ঘরের দাওয়ায় বেড়া দিয়া ঘেরা একটু ছোট্ট রান্নাঘর, সেখানে রাঙ্গা-পাড়ের কাপড়-পরা কে যেন রন্ধন করিতেন—হয়তো ইহার সবটুকুই তাহার কল্পনা—কিন্তু সে তাহার মা—সেই মায়ের একান্ত অস্ফুট মুখের ছবিখানি আজ হঠাৎ যেন তাহার চোখে পড়িতে লাগিল। মনের ভিতরটা কেমন-ধারা করিয়া উঠিতেই সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কিছু মনে করো না সারদা আজ আমি যাই। আবার যেদিন সময় পাবো আমি নিজে চেয়ে তোমার চা, তোমার জল-খাবার খেয়ে যাবো।

সারদা গলবস্ত্রে প্রণাম করিয়া বলিল, আমার লেখার কাজটা কবে এনে দেবেন?

এর মধ্যেই একদিন দিয়ে যাবো।

আচ্ছা।

তথাপি কিসের জন্য সে যেন ইতস্ততঃ করিতেছে অনুমান করিয়া রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, তুমি আর কিছু বলবে?

সারদা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, প্রথমে হয়তো আমার ঢের ভুল হবে। আপনি কিন্তু রাগ করবেন না। রাগ করে আমাকে ফেলে দিলে আর আমার দাঁড়াবার জায়গা নেই।

তাহার সভয় কণ্ঠের সকাতর প্রার্থনায় করুণায় বিগলিত হইয়া রাখাল বলিল, না সারদা, আমি রাগ করবো না। তুমি কিন্তু শিখে নেবার চেষ্টা কোরো।

প্রত্যুত্তরে এবার সে শুধু মাথা নাড়িয়া সায় দিল। তারপরে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ফিরিবার পথটা রাখাল হাঁটিয়াই চলিল। ট্রামের গাড়িতে অনেকের মধ্যে গিয়া বসিতে আজ তাহার কিছুতেই ইচ্ছা হইল না।

সে গরীব লোক, উল্লেখ করিবার মতো বিদ্যার পুঁজিও নাই, নাম করিবার মতো আত্মীয়-স্বজনও নাই, তবুও সে যে এই শহরে বহু গৃহে, বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারে আপন-জন হইয়া উঠিতে পারিয়াছিল সে কেবল তাহার নিজের গুণে। তাঁহাদের স্নেহ, সহৃদয়তার অভাব ছিল না, অনুকম্পাও প্রচুর ছিল, কিন্তু অন্তর্নিহিত একটা অনির্দিষ্ট উপেক্ষার ব্যবধানে কেহ তাহাকে এর চেয়ে কাছে টানিয়া কোনদিন লয় নাই। কারণ, সে ছিল শুধু রাখাল—তার বেশী নয়। ছেলে-টেলে পড়ায়, মেসে-টেসে থাকে। সেটা কোন্‌খানে না জানিলেও তাহার বাসার ঠিকানায় বরানুগমনের আমন্ত্রণলিপি ডাক-যোগে অনেক আসে। প্রীতিভোজের নিমন্ত্রণে নাম তাহার বাদ যায় না, এবং না গেলে সেদিনে না হউক, দু'দিন পরেও এ কথা তাঁহাদের মনে পড়ে। কাজের বাড়িতে তাহার অনুপস্থিতি বস্তুতঃই বড় বিসদৃশ; জীবনে অনেক বিবাহের ঘটকালি সে করিয়াছে, অনেক পাত্র-পাত্রী খুঁজিয়া বাছিয়া দিয়াছে—সে পরিশ্রমের সীমা নাই। হর্ষাপ্লুত পিতা-মাতা সাধুবাদে দুই কান পূর্ণ করিয়া তাহাকে বলিয়াছে, রাখাল বড় ভালো লোক, রাখাল বড় পরোপকারী। কৃতজ্ঞতার পারি-তোষিক এমনি করিয়া চিরদিন এইখানেই সমাপ্ত হইয়াছে। এজন্য বিশেষ কোন অভিযোগ যে তাহার ছিল তাও নয়। শুধু, কখনো হয়তো চাকরির নিষ্ফল উমেদারির দিনগুলা মাঝে মাঝে মনে পড়িত। কিন্তু সে এমনই বা কি!

ভিড়ের মধ্যে চলিতে চলিতে আজ আবার বার বার সেই-সকল বহু-পরিচিত মেয়েদের কথা মনে পড়িতে লাগিল। তাহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, হাবভাব, আলাপ-আলোচনা, পড়া-শুনা, হাসি-কান্না—এমন কত কি! ব্যক্ত-অব্যক্ত কত না চঞ্চল প্রণয়কাহিনী, মিলন-বিচ্ছেদের কত না অশ্রুসিক্ত বিবরণ!

কিন্তু রাখাল? বেচারা বড় ভালো লোক, বড় পরোপকারী। ছেলে-টেলে পড়ায়—মেসে-টেসে থাকে।

আর আজ? কি বলিল সারদা? বলিল, দেবতা, আমার অনেক ভুল হবে, কিন্তু তুমি ফেলে দিলে আমার আর দাঁড়াবার স্থান নেই।

হয়তো সত্যই নাই। কিংবা—? হঠাৎ তাহার ভারী হাসি পাইল। নিজের মনেই খিল-খিল করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, রাখাল বড় ভালো লোক—রাখাল বড় পরোপকারী।

পাশের অপরিচিত পথিক অবাক হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া সেও হাসিয়া ফেলিল। লজ্জিত রাখাল আর একটা গলি দিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

পাঁচ

বাসায় পেঁাছিয়া রাখাল দুইখানা পত্র পাইল—দুই-ই বিবাহের ব্যাপার। একখানায় ব্রজবিহারী জানাইয়াছেন, রেণুর বিবাহ এখন স্থগিত রহিল এবং সংবাদটা নতুন-বৌকে যেন জানানো হয়। অন্যান্য কয়েকটা মামুলি কথার পরে তিনি চিঠির শেষের দিকে লিখিয়াছেন, নানা হাঙ্গামায় সম্প্রতি অতিশয় ব্যস্ত, আগামী শনিবারে বিকালের দিকে নিজে তোমার বাসায় গিয়া সমুদয় বিষয় বিস্তারিত মুখে বলিব। দ্বিতীয় পত্র আসিয়াছে কর্তার নিকট হইতে। অর্থাৎ যাঁহার ছেলে-মেয়েকে সে পড়ায়। ভাইপোর বিবাহ হঠাৎ স্থির হইয়াছে দিল্লীতে, কিন্তু অতদূরে যাওয়া তাঁহার নিজের পক্ষে সম্ভবপর নয় এবং তেমন বিশ্বাসী লোকও কেহ নাই, সুতরাং বরকর্তা সাজিয়া রাখালকেই রওনা হইতে হইবে। সামনের রবিবারে যাত্রা না করিলেই নয়, অতএব শীঘ্র আসিয়া দেখা করিবে। এই কর্যদিনের কামাইয়ের জন্য যে তিনি ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার ক্ষতির উল্লেখ করেন নাই, ইহাই রাখাল যথেষ্ট মনে করিল। সেই যাই হউক, মোটের উপর দুইটি খবরই ভালো। রেণুর বিবাহ-ব্যাপারে তাহার মনের মধ্যে যথেষ্ট উদ্বেগ ছিল। 'এখন স্থগিত' থাকার অর্থ বেশ স্পষ্ট না হইলেও, পাগল বরের সহিত বিবাহ হইয়া যে চুকিয়া যায় নাই, ইহাতেই সে পুলকিত হইল। দ্বিতীয়, দিল্লী যাওয়া। ইহাও নিরানন্দের নহে। সেখানে প্রাচীনদিনের বহু স্মৃতি-চিহ্ন বিদ্যমান, এতদিন সে-সকল কথা কেবল পুস্তকে পড়িয়াছে ও লোকের মুখে শুনিয়াছে, এবার এই উপলক্ষে সমস্ত চোখে দেখা ঘটিবে।

পরদিন সকালেই সে চিঠি লইয়া নতুন-মার সঙ্গে দেখা করিল, তিনি হাসিমুখে জানাইলেন শুভ-সংবাদ পূর্বাহ্নেই অবগত হইয়াছেন, কিন্তু বিস্তারিত বিবরণের অপেক্ষায় অনুক্ষণ অধীর হইয়া আছেন। একটা প্রবল অন্তরায় যে ছিলই তাহা নিঃসন্দেহ, তথাপি কি করিয়া যে ঐ শান্ত দুর্বল প্রকৃতির মানুষটি একাকী এতবড় বাধা কাটাইয়া উঠিল তাহা সত্যিই বিস্ময়কর।

রাখাল কহিল, রেণু নিশ্চয়ই তার বাপের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল নতুন-মা, নইলে কিছুতে এ বিয়ে বন্ধ করা যেতো না।

নতুন-মা আস্তে আস্তে বলিলেন, জানিনে তো তাকে, হতেও পারে বাবা।

রাখাল জোর দিয়া বলিল, কিন্তু আমি তো জানি। তুমি দেখে নিয়ো মা, আমার অনুমানই সত্যি। সে নিজে ছাড়া হেমন্তবাবুকে কেউ থামাতে পারতো না।

নতুন-মা আর তর্ক করিলেন না, বলিলেন, যাই হোক, শনিবার বিকালে আমিও তোমার ওখানে গিয়ে হাজির থাকবো রাজু, সব ঘটনা নিজের কানেই শুনবো। আরও একটা কাজ হবে বাবা, আর একবার তোমার কাকাবাবুর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে আসতে পারবো।

তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া সে নীচে একবার সারদার ঘরটা ঘুরিয়া গেল, দেখিল, ইতিমধ্যেই সে ছেলেদের কাছে কাগজ-কলম চাহিয়া লইয়া নিবিষ্ট মনে হাতের লেখা পাকাইতে বসিয়াছে। রাখালকে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া এ-সকল সে লুকাইবার চেষ্টা করিল না, বরঞ্চ, যথোচিত মর্যাদার সহিত তাহাকে তক্তপোশে বসাইয়া কহিল, দেখুন তো দেবতা, এতে কি আপনার কাজ চলবে?

সারদার হস্তাক্ষর যে এতখানি সুস্পষ্ট হইতে পারে রাখাল ভাবে নাই, খুশী হইয়া বার বার প্রশংসা করিয়া কহিল, এ আমার নিজের লেখার চেয়েও ভাল সারদা, আমাদের খুব কাজ চলে যাবে। তুমি যত্ন করে লেখাপড়া শেখ, তোমার খাওয়া-পরার ভাবনা থাকবে না। হয়তো, তুমিই কত লোকের খাওয়া-পরার ভার নেবে।

শুনিয়া অকৃত্রিম আনন্দে মেয়েটির মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। রাখাল মিনিট-দুই

নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া পকেট হইতে একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া বলিল, টাকাটা তুমি কাছে রাখো সারদা, এ তোমারই। আমি এক বন্ধুর বিয়ে দিতে দিল্লী যাচ্ছি, ফিরতে বোধ হয় দশ-বারো দিন দেরি হবে- এসে তোমার লেখা এনে দেবো--কি বলো? কিছু ভেবো না—কেমন?

সারদা কহিল, আমার টাকার এখন দরকার ছিল না দেব্‌তা- সে-ই এখনও খরচ হয়নি।

তা হোক, তা হোক- এ টাকাও আপনিই শোধ হয়ে যাবে। যদি হঠাৎ আবশ্যক হয়, কার কাছে চাইবে বলো? কিন্তু আমার জন্যে চিন্তা কোরো না যেন, আমি যত শীঘ্র পারি চলে আসবো। এসেই তোমাকে লেখা দিয়ে যাবো।

সারদার নিকট বিদায় লইয়া রাখাল তাহার মনিব-বাটীতে উপস্থিত হইল, সেখানে কর্তা গৃহিণী ও তাহাতে বহু বাদানুবাদের পর স্থির হইল, সমস্ত দলবল লইয়া তাহাকে রবিবার রাত্রির গাড়িতেই যাত্রা করিতে হইবে। গৃহিণী বলিয়া দিলেন, রাখাল, তোমার নিজের বন্ধু-বান্ধব কেউ যেতে চায় তো স্বচ্ছন্দে নিয়ে যেয়ো,—সব খরচ তাদের। মনে রেখো, এ-পক্ষের তুমিই কর্তা, টাকাকড়ি, গয়নাগাঁটি, জিনিসপত্র, সমস্ত দায়িত্ব তোমার।

রাখালের সর্বাগ্রে মনে পড়িল তারককে। সে হুঁশিয়ার লোক, তাহাকে সঙ্গে লইতে হইবে, বিনা খরচায় এ সুযোগ নষ্ট করা হইবে না। কেবল একটা আশঙ্কা ছিল লোকটার একঝোঁকা নৈতিক বুদ্ধিকে। সেখানে উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন উঠিয়া পড়িলে তাহাকে রাজী করানো কঠিন হইবে; কিন্তু ইতিমধ্যে সে যে মাস্টারি লইয়া বর্ধমানে চলিয়া যাইতে পারে এ কথা তাহার মনেও হইল না। কারণ, তাহার ফিরিয়া আসার অপেক্ষা করিতে না পারুক, একখানা চিঠি লিখিয়াও রাখিয়া যাইবে না এমন হইতেই পারে না। রবিবারের এখনো তিনদিন বাকী, ইহার মধ্যে সে আসিয়া দেখা করিবেই, না হয় কাল একবার সময় করিয়া তাহাকে নিজেই তারকের মেসে গিয়া খবরটা দিয়া আসিতে হইবে। বাসায় ফিরিয়া রাখাল নানা কাজে ব্যাপৃত হইয়া পড়িল। সে শৌখিন মানুষ, এ-কয়দিনের অবহেলায় ঘরের বহু বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে, যাবার পূর্বে সে-সকল ঠিক করিয়া ফেলা চাই। সাহেববাড়ি হইতে একটা ভালো তোরঙ্গ কেনা প্রয়োজন, বিদেশে চাবি খুলিয়া কেহ কিছু চুরি করিতে না পারে। বরকর্তার উপযুক্ত মর্যাদার জামা-কাপড় আলমারিতে কি-কি আছে দেখা দরকার, না থাকিলে তাড়াতাড়ি তৈরি করাইয়া লওয়া একান্ত আবশ্যক। আর শুধু তারক ত নয়, যোগেশবাবুকেও একবার বলিতে হইবে। তাঁহার পশ্চিমে যাইবার অনেকদিনের শখ, কেবল অর্থাভাবেই মিটাইতে পারেন নাই। অফিসের বড়বাবুকে ধরিয়া যদি দিন-দশেকের ছুটি মঞ্জুর করানো যায় তো যোগেশ আজীবন কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিবে। মনিবগৃহেও অন্ততঃ একবারও যাওয়া চাই, না হইলে ছোটখাটো ভুলচুক ধরা পড়িবে কেন? আলোচনা দরকার, কারণ বিদেশে সমস্ত দায়িত্বই যে একা তাহার। এই সংক্ষিপ্ত সময়ে এত কাজ কি করিয়া যে সে সম্পন্ন করিবে ভাবিয়া পাইল না। শনিবারের বিকালটা তো কেবল নতুন-মা ও ব্রজবাবুর জন্যই রাখিতে হইবে, সেদিন হয়তো কিছুই করা যাইবে না। ইতিমধ্যে মনে করিয়া পোস্টাফিস হইতে কিছু টাকা তুলিতে হইবে, কারণ নিজের সম্বল না লইয়া পথ চলা বিপজ্জনক। কাজের ভিড়ে ও তাগাদায় রাখাল চোখে যেন অন্ধকার দেখিতে লাগিল; কিন্তু একটা কান তাহার অনুক্ষণ দরজায় পড়িয়াই থাকে—তারকের কড়া নাড়া ও কণ্ঠস্বরের প্রতীক্ষায়, কিন্তু তাহার দেখা নাই। এদিকে বৃহস্পতিবার পার হইয়া শুক্রবার আসিয়া পড়িল। দুপুরবেলা পোস্টাফিসে গেল সে টাকা তুলিতে। কিছু বেশি তুলিতে হইবে। মনে ছিল, যদি তারক বলিয়া বসে তাহার বাহিরে যাইবার মতো জামা-কাপড় নাই, তা হইলে কোনমতে এই বাড়তি টাকাটা তাহার হাতে গুঁজিয়া দিতে হইবে। এতে মুশকিল আছে। সে না করে ধার, না চায় দান, না লয় উপহার। একটা আশা, রাখালের পীড়াপীড়িতে সে অবশেষে হার মানে। সময় নষ্ট করা চলিবে না। পোস্টাফিস হইতেই একটা ট্যাক্সি লইতে হইবে। তারক একটু রাগ করিবে বটে—তা করুক।

কিন্তু টাকা তুলিতে অযথা বিলম্ব ঘটিল। বিরক্ত-মুখে বাহিরে আসিয়া গাড়ি ভাড়া করিতেছে, পাড়ার পিয়ন হাতে একখানা চিঠি দিল। লেখা তারকের। খুলিয়া দেখিল, সে বর্ধমানের কোন্ এক পল্লীগ্রাম হইতে সেই হেডমাস্টারির খবর দিয়াছে এবং আসিবার

পূর্বে দেখা করিয়া আসিতে পারে নাই বলিয়া দুঃখ জানাইয়াছে। নতুন-মা ও ব্রজবাবুকে প্রণাম নিবেদন করিয়াছে, এবং পত্রের উপসংহারে আশা করিয়াছে, অনতিকাল মধ্যেই দিন-কয়েকের ছুটি লইয়া না বলিয়া চলিয়া আসার অপরাধে স্বয়ং গিয়া ক্ষমাভিক্ষা করিবে। ইহাও লিখিয়াছে যে রেণুর বিবাহ বন্ধ হওয়ার সংবাদ সে জানিয়াই আসিয়াছে। রাখাল চিঠিটা পকেটে রাখিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, যাক ট্যাক্সিভাড়াটা বাঁচল।

পরদিন বিকালে রাখাল নূতন তোরঙ্গে কাপড়-চোপড় গুছাইয়া তুলিতেছিল, ফিরিতে দিন-দশেক দেরি হইবে, নতুন-মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাখাল প্রণাম করিয়া চৌকি অগ্রসর করিয়া দিল, তিনি বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কাল রাত্রেই তোমাদের যেতে হবে বুঝি বাবা?

হাঁ মা, কালই সবাইকে নিয়ে রওনা হতে হবে।

ফিরতে দিন-আষ্টেক দেরি হবে বোধ হয়?

হাঁ মা, আট-দশদিন লাগবে।

নতুন-মা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ক'টা বাজলো রাজু?

রাখাল দেয়ালের ঘড়ির পানে চাহিয়া বলিল, পাঁচটা বেজে গেছে। আমার ভয় ছিল আপনার আসতেই হয়তো বিলম্ব হবে, কিন্তু আজ কাকাবাবুই দেরি করলেন।

দেরি হোক বাবা, তিনি এলে বাঁচি।

রাখাল হাসিয়া বলিল, পাগলের সঙ্গে বিয়েটা যখন বন্ধ হয়ে গেছে তখন ভাবনার ত আর কিছু নেই মা! তিনি না আসতে পারলেও ক্ষতি নেই।

নতুন-মা মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না বাবা, কেবল রেণুই ত নয়, তোমার কাকাবাবুও রয়েছেন যে। আমি কেবলই ভাবি, ঐ নিরীহ শান্ত মানুষটি না জানি একলা কত লাঞ্ছনা, কত উৎপীড়নই সহ্য করেছেন। বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

রাখাল মনে মনে মামাবাবু হেমন্তকুমারের চাকার মতো মস্ত মুখখানা স্মরণ করিয়া নীরব হইয়া রহিল। এ কাজ যে সহজে হয় নাই তাহা নিশ্চয়।

নতুন-মা বলিতে লাগিলেন, এ বিয়ে স্থগিত রইলো তিনি এইমাত্র লিখেচেন। কিন্তু কিছুদিনের জন্যে না চিরদিনের জন্যে সে ত এখনো জানতে পারা যায়নি রাজু।

রাখাল বলিয়া উঠিল, চিরদিনের জন্যে মা, চিরদিনের জন্যে। ঐ পাগলদের ঘরে আপনার রেণু কখনো পড়বে না, আপনি নিশ্চিন্ত হোন।

নতুন-মা বলিলেন, ভগবান তাই করুন; কিন্তু ঐ দুর্বল মানুষটির কথা ভেবে মনের মধ্যে কিছুতে স্বস্তি পাচ্ছিনে রাজু। দিনরাত কত চিন্তা, কত রকমের ভয়ই যে হয় সে আর আমি বলবো কাকে?

রাখাল বলিল, কিন্তু ওঁকে কি আপনার খুব দুর্বল লোক বলে মনে হয় মা?

নতুন-মা একটুখানি ম্লান হাসিয়া কহিলেন, দুর্বল-প্রকৃতির উনি ত চিরদিনই রাজু। তাতে আর সন্দেহ কি!

রাখাল বলিল, দুর্বল লোকে কি এত আঘাত নিঃশব্দে সইতে পারে মা? জীবনে কত ব্যথাই যে কাকাবাবু সহ্য করেছেন সে আপনি জানেন না, কিন্তু আমি জানি। ঐ যে উনি আসচেন।

খোলা জানালার ভিতর দিয়া ব্রজবাবুকে সে দেখিতে পাইয়াছিল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল এবং তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলে সে একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল। নতুন-মা কাছে আসিয়া গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ব্রজবাবু চেয়ার টানিয়া উপবেশন করিলেন, বলিলেন, রেণুর বিয়ে ওখানে দিতে দিইনি, শুনেছো নতুন-বৌ?

হাঁ, শুনেচি। বোধ হয় খুব গোলমাল হলো?

সে তো হবেই নতুন-বৌ।

তুমি নির্বিরোধী শান্ত মানুষ, আমার বড় ভাবনা ছিল কি করে তুমি এ-বিয়ে বন্ধ করবে।

ব্রজবাবু বলিলেন, শান্তিই আমি ভালবাসি, বিরোধ করতে কিছুতে মন চায় না, এ কথা সত্যি। কিন্তু তোমার মেয়ে, অথচ তোমারই বাধা দেবার হাত নেই, কাজেই সব ভার এসে পড়লো আমার ওপর, একাকী আমাকেই তা বইতে হলো। সেদিন আমার বার বার কি কথা মনে হচ্ছিল জানো নতুন-বৌ, মনে হচ্ছিল আজ যদি তুমি বাড়ি থাকতে, সমস্ত বোঝা তোমার ঘাড়ে ফেলে দিয়ে আমি গড়ের মাঠে একটা বেঞ্চিতে শুয়ে রাত কাটিয়ে দিতাম। তাদের উদ্দেশে মনে মনে বললাম, আজ সে থাকলে তোমরা বুঝতে জুলুম করার সীমা আছে—সকলের ওপরেই সর্বকিছু চালানো যায় না।

সবিতা অধোমুখে নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন। সেদিনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিবার সাহস তাঁহার হইল না। রাখালও তেমনি নির্বাক স্তব্ধ হইয়া রহিল। ব্রজবাবু নিজে হইতে ইহার অধিক ভাঙিয়া বলিলেন না।

মিনিট দুই-তিন সকলেই চুপ করিয়া থাকার পরে রাখাল বলিল, কাকাবাবু, আজ বড় আপনাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

ব্রজবাবু বলিলেন, তার হেতুও যথেষ্ট আছে রাজু। এই ছ-সাতদিন কারবারের কাগজপত্র নিয়ে ভারী খাটতে হয়েচে।

রাখাল সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, সব ভালো ত কাকাবাবু?

ব্রজবাবু বলিলেন, ভালো একেবারেই নয়। সবিতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, তোমার সেই টাকাটা আমি বছর-খানেক আগে তুলে নিয়ে ব্যাঙ্কে রেখেছিলাম, ভেবেছিলাম, আমার নিজের কারবারের চেয়ে বরঞ্চ এদের হাতেই ভয়ের সম্ভাবনা কম। এখন দেখচি ঠিকই ভেবেছিলাম। এখন এর ওপরেই ভরসা নতুন-বৌ, এটা না নিলেই এখন নয়।

সবিতা এবার মুখ তুলিয়া চাহিলেন, বলিলেন, না নিলে কি নষ্ট হবার ভয় আছে?

আছে বৈ কি নতুন-বৌ—বলা তো যায় না।

সবিতা চুপ করিয়া রহিলেন।

ব্রজবাবু কহিলেন, কি বলো নতুন-বৌ, চুপ করে রইলে যে?

সবিতা মিনিট-দুই নিরুত্তরে থাকিয়া বলিলেন, আমি আর কি বলবো মেজকর্তা। টাকা তুমিই দিয়েছিলে, তোমার কাজেই যদি যায় ত যাবে। কিন্তু আমারো ত আর কিছু নেই।

শুনিয়া ব্রজবাবু যেন চমকাইয়া গেলেন। খানিক পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, ঠিক কথা নতুন-বৌ, এ দুঃসাহস করা আমার চলে না। তোমার টাকা আমি তোমাকেই ফিরিয়ে দেবো। কাল একবার আসবে?

যদি আসতে বলো আসবো।

আর তোমার গয়নাগুলো?

তুমি কি রাগ করে বলচো মেজকর্তা?

ব্রজবাবু সহসা উত্তর দিতে পারিলেন না। তাঁহার চোখের দৃষ্টি বেদনায় মলিন হইয়া উঠিল, তারপরে বলিলেন, নতুন-বৌ, যার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দিতে যাচ্চি আমি রাগ করে—এমন কথা আজ তুমিও ভাবতে পারলে?

সবিতা নতমুখে নীরব হইয়া রহিলেন।

ব্রজবাবু বলিলেন, আমি একটুও রাগ করিনি নতুন-বৌ, সরল মনেই ফিরিয়ে দিতে চাইচি। তোমার জিনিস তোমার কাছেই থাক, ও ভার বয়ে বেড়াবার আর আমার সামর্থ্য নেই।

সবিতা এখনও তেমনি নির্বাক হইয়া রহিলেন, কোন জবাবই দিতে পারিলেন না।

সন্ধ্যা হয়, ব্রজবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন, আজ তা হলে যাই। কাল এমনি সময়ে একবার এসো—আমার অনুরোধ উপেক্ষা করো না নতুন-বৌ।

রাখাল তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, একটি বন্ধুর বিয়ে দিতে কাল রাতের গাড়িতে আমি দিল্লী যাচ্চি কাকাবাবু, ফিরতে বোধ করি আট-দশদিন দেরি হবে।

ব্রজবাবু বলিলেন, তা হোক, কিন্তু বিয়ে কি কেবল দিয়েই বেড়াবে রাজু, নিজে করবে না?

রাখাল সহাস্যে কহিল, আমাকে মেয়ে দেবে এমন দুর্ভাগা সংসারে কে আছে কাকাবাবু?

শুনিয়া ব্রজবাবুও হাসিলেন, বলিলেন, আছে রাজু। যারা আমাকে মেয়ে দিয়েছিল সংসারে তারা আজও লোপ পায়নি। তোমাকে মেয়ে দেবার দুর্ভাগ্য তাদের চেয়ে বেশী নয়। বিশ্বাস না হয় তোমার নতুন-মাকে বরঞ্চ আড়ালে জিজ্ঞেসা করো, তিনি সায় দেবেন। চললাম নতুন-বৌ, কাল আবার দেখা হবে।

সবিতা কাছে আসিয়া পায়ের ধুলো লইয়া প্রণাম করিলেন; তিনি অস্ফুটে বোধ হয় আশীর্বাদ করিতে করিতেই বাহির হইয়া গেলেন।

পরদিন ঠিক এমনি সময়ে ব্রজবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হাতে তাঁহার শিল মোহর করা একটা টিনের বাক্স। সবিতা পূর্বাহ্নেই আসিয়াছিলেন, বাক্সটা তাঁহার সামনে টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া বলিলেন, এটা এতদিন ব্যাঙ্কেই জমা ছিল, এর ভেতরে তোমার সমস্ত গহনাই মজুত আছে দেখতে পাবে। আর এই নাও তোমার বায়ান্ন হাজার টাকার চেক। আজ আমি খালাস পেলাম নতুন-বৌ, আমার বোঝা বয়ে বেড়াবার পালা সাঙ্গ হলো।

কিন্তু তুমি যে বলেছিলে এ-সব গয়না তোমার রেণু পরবে?

ব্রজবাবু কহিলেন, গয়না তো আমার নয় নতুন-বৌ, তোমার। যদি সেদিন কখনো আসে তাকে তুমিই দিও।

রাখাল বারে বারে ঘড়ির প্রতি চাহিয়া দেখিতেছিল, ব্রজবাবু তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমার বোধ করি সময় হয়ে এলো রাজু?

রাখাল সলজ্জে স্বীকার করিয়া বলিল, ও-বাড়ি হয়ে সকলকে নিয়ে স্টেশনে যেতে হবে কিনা—

তবে আমি উঠি। কিন্তু ফিরে এসে একবার দেখা করো রাজু। এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হঠাৎ কথাটা মনে পড়ায় কহিলেন, কিন্তু আজ ত তোমার নতুন-মার একলা যাওয়া উচিত নয়। কেউ পৌঁছে না দিলে—

রাখাল বলিল, একলা নয় কাকাবাবু। নতুন-মার দরোয়ান, নিজের মোটর, সমস্ত মোড়েই দাঁড়িয়ে আছে।

ওঃ—আছে? বেশ, বেশ। নতুন-বৌ, যাই তাহলে?

সবিতা কাছে আসিয়া কালকের মতো প্রণাম করিয়া পায়ের ধুলো লইলেন, আস্তে আস্তে বলিলেন, আবার কবে দেখা পাবো মেজকর্তা?

যেদিন বলে পাঠাবে আসবো। কোন কাজ আছে কি নতুন-বৌ?

না, কাজ কিছু নেই।

ব্রজবাবু হাসিয়া বলিলেন, শুধু এমনিই দেখতে চাও?

এ প্রশ্নের জবাব কি! সবিতা ঘাড় হেঁট করিয়া রহিলেন।

ব্রজবাবু বলিলেন, আমি বলি এ-সবের প্রয়োজন নেই নতুন-বৌ। আমার জন্যে মনের মধ্যে আর তুমি অনুশোচনা রেখো না যা কপালে লেখা ছিল ঘটেছে—গোবিন্দ মীমাংসাও তা'র একরকম করে দিয়েচেন,—আশীর্বাদ করি তোমরা সুখী হও, আমাকে অবিশ্বাস করো না নতুন-বৌ, আমি সত্যি কথাই বলচি।

সবিতা তেমনিই অধোমুখে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রাখালের মনে পড়িল আর বিলম্ব করা সঙ্গত নয়। অবিলম্বে গাড়ি ডাকিয়া তোরঙ্গটা বোঝাই দিতে হইবে। এবং এই কথাটাই বলিতে বলিতে সে ব্যস্তসমস্তে বাহির হইয়া গেল।

সবিতা মুখ তুলিয়া চাহিলেন, তাঁহার দুই চোখে অশ্রুর ধারা বহিতেছিল। ব্রজবাবু একটুখানি সরিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, তোমার রেণুকে একবার দেখতে চাও কি নতুন-বৌ?

না মেজকর্তা সে প্রার্থনা আমি করিনে।

তবে কাঁদচো কেন? কি আমার কাছে তুমি চাও?

যা চাইবো দেবে বলো?

ব্রজবাবু উত্তর দিতে পারিলেন না, শুধু তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সবিতা কহিলেন, কতকাল বাঁচবো মেজকর্তা, আমি কি নিয়ে থাকবো?

ব্রজবাবু এ জিজ্ঞাসারও উত্তর দিতে পারিলেন না, ভাবিতে লাগিলেন। এমনি সময়ে বাহিরে রাখালের শব্দ-সাড়া পাওয়া গেল, সবিতা তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছিয়া ফেলিলেন এবং পরক্ষণেই দ্বার ঠেলিয়া সে ঘরে প্রবেশ করিল। কহিল, নতুন-মা, আপনার ড্রাইভার জিজ্ঞেসা করছিল, আর দেরি কতো? চলুন না ভারী বাক্সটা আপনার গাড়িতে তুলে দিয়ে আসি?

নতুন-মা বলিলেন, রাজু আমাকে বিদায় করতে পারলেই বাঁচে, আমি ওর আপদ-বালাই।

রাখাল হাতজোড় করিয়া জবাব দিল, মায়ের মুখে ও-নালিশ অচল নতুন-মা। এই রইলো আপনার রাজুর দিল্লী যাওয়া—ছেলেবেলার মতো আর একবার আজ মার কোলেই আশ্রয় নিলাম। এখান থেকে আর যেতে দিচ্চিনে মা—যত কষ্টই ছেলের ঘরে হোক।

সবিতা লজ্জায় যেন মরিয়া গেলেন। রাখাল বলিয়া ফেলিয়াই নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়াছিল, কিন্তু ভালোমানুষ ব্রজবাবু তাহা লক্ষ্যও করিলেন না। বরঞ্চ বলিলেন, বেলা গেছে নতুন-বৌ, বাক্সটা তোমার গাড়িতে রাজু তুলে দিয়ে আসুক, আমি ততক্ষণ ওর ঘর আগলাই। এই বলিয়া নিজেই বাক্সটা তাহার হাতে তুলিয়া দিলেন।

প্রশ্নের উত্তর চাপা পড়িয়া রহিল, রাখালের পিছনে পিছনে নতুন-মা নীরবে বাহির হইয়া গেলেন।

ছয়

বিবাহ দিয়া রাখাল দিন দশ-বার পরে দিল্লী হইতে ফিরিয়া আসিল। বলা বাহুল্য, বরকর্তার কর্তব্যে তাহার ত্রুটি ঘটে নাই এবং কর্তা-গিন্নী অর্থাৎ মনিব ও মনিব-গৃহিণী তাহার কার্যকুশলতায় যৎপরোনাস্তি আনন্দ লাভ করিলেন।

কিন্তু তাহার এই কয়টা দিনের দিল্লী প্রবাস কেবল এইটুকুমাত্র ঘটনাই নয়, তথায় সে রীতিমত প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়া আসিয়াছে। তাহার একটা ফল এই হইয়াছে যে, বিবাহযোগ্য আকাঙ্ক্ষিত পাত্র হিসাবে তাহাকে কয়েকটি মেয়ে দেখানো হইয়াছে। সাদামাটা সাধারণ গৃহস্থ-ঘরের মেয়ে, পশ্চিমে থাকিয়া তাহাদের স্বাস্থ্য ও বয়স বাড়িয়াছে, কিন্তু অভিভাবকগণের নানা অসুবিধায় এখনো পাত্রস্থ করা হয় নাই। পীড়াপীড়ির উত্তরে রাখাল বলিয়া আসিয়াছে যে, কলিকাতায় তাহার কাকাবাবু ও নতুন-মার অভিমত জানিয়া পরে চিঠি লিখিবে। তাহার এ সৌভাগ্যের কারণ বন্ধু যোগেশ। সে বরযাত্রীর দলে ভিড়িয়া নিখরচায় দিল্লী, হস্তিনাপুর, কেল্লা, কুতুব মিনার ইত্যাদি এ-যাবৎ লোকমুখে শুনা দ্রষ্টব্য বস্তুনিচয় দেখিতে পাইয়াছে, অতএব বন্ধুকৃত্য বাকী রাখে নাই, কৃতজ্ঞতার ঋণ ষোল আনায় পরিশোধ করিয়াছে। লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, রাখালবাবু আজও বিবাহ করেন নাই কেন? যোগেশ জবাব দিয়াছে, ওর শখ। আমাদের মতো সাধারণ মানুষের সঙ্গে ওদের মিলবে এমন আশা করাই যে অন্যায়। কন্যাপক্ষীয় সসঙ্কোচে প্রশ্ন করিয়াছে, উনি কলিকাতায় করেন কি? যোগেশ তৎক্ষণাৎ উত্তর করিয়াছে, বিশেষ কিছুই নয়। তার পর মুচকিয়া হাসিয়া কহিয়াছে, করার দরকারই বা কি!

এ কথার নানা অর্থ।

কলিকাতার বিশিষ্ট লোকদের বিবিধ তথ্য রাখালের মুখে-মুখে। বাড়ির মেয়েদের পর্যন্ত নাম জানা। নূতন ব্যারিস্টার, সদ্য পাস-করা আই-সি-এস-দের উল্লেখ সে ডাক-নাম ধরিয়া করে। পচু বোস, ডম্বল সেন, পটল বাঁড়ুয্যে—শুনিয়া অত দূর-প্রবাসের সামান্য চাকরিজীবী বাঙালীরা অবাক হইয়া যায়; কিন্তু এতকাল বিবাহের কথায় রাখাল শুধু যে মুখেই আপত্তি করিয়াছে তাই নয়, মনের মধ্যেও তার ভয় আছে। কারণ, নিজের অবস্থা

সম্বন্ধে সে অচেতন নয়। সে জানে, এই কলিকাতা শহরে তাহার পরিচিত বন্ধু-পরিধি যথেষ্ট সংকুচিত না করিয়া পরিবার প্রতিপালন করা তাহার সাধ্যাতীত। যে-পরিবেষ্টনে এতকাল সে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়াছে, সেখানে ছোট হইয়া থাকার কল্পনা করিতেও সে পরাঙ্মুখ। তথাপি, নিঃসঙ্গ জীবনের নানা অভাব তাহাকে বাজে। বসন্তে বিবাহোৎসবের বাঁশি মাঝে মাঝে তাহাকে উতলা করে, বরানুগমনের সাদর আমন্ত্রণে মনটা হয়তো হঠাৎ বিরূপ হইয়া উঠে, সংবাদপত্রে কোথায় কোন্ আত্মঘাতিনী অনূঢ়া কন্যার পাণ্ডুর মুখ অনেক সময়ে তাহাকে যেন দেখা দিয়া যায়, হয়তো বা অকারণ অভিমানে কখনো মনে হয়, সংসারে এত প্রাচুর্য, এত অভাব, এত সাধারণ, এত নিরন্তরের মধ্যে শুধু সেই কি কাহারো চোখে পড়ে না? শুধু তাহাকেই মালা দিতে কোথাও কোন কুমারীই কি নাই?

কিন্তু এ-সকল তাহার ক্ষণিকের। মোহ কাটিয়া যায়, আবার সে আপনাকে ফিরিয়া পায়· হাসে, আমোদ করে, ছেলে পড়ায়, সাহিত্যালোচনায় যোগ দেয়,—আহ্বান আসিলে বিবাহের আসর সাজাইতে ছোটে, নব বর-বধূকে ফুলের তোড়া দিয়া শুভকামনা জানায়। আবার দিনের পর দিন যেমন কাটিতেছিল তেমনি কাটে। এতদিনের এই মনোভাবের এবার একটু পরিবর্তন ঘটিয়াছে দিল্লী হইতে ফিরিয়া। এবারে সে দেখিয়াছে কলিকাতাই সমস্ত দুনিয়া নয়, ইহারও বাহিরে বাঙালী বাস করে, তাহারাও ভদ্র,—তাহারাও মানুষ। তাহাকেও কন্যা দিতে প্রস্তুত এমন পিতা-মাতা আছে। কলিকাতায় যে-সমাজ ও যে-মেয়েদের সংস্পর্শে সে এতকাল আসিয়াছে, প্রবাসেব সাধারণ ঘরের সে মেয়েগুলি হয়তো অনেক বিষয়ে খাটো। স্ত্রী বলিয়া পরিচয় করাইয়া দিতে হয়তো আজও তাহার লজ্জা করিবে, তথাপি এই নূতন অভিজ্ঞতা তাহাকে সান্ত্বনা দিয়াছে, বল দিয়াছে, ভরসা দিয়াছে।

সংসারে কাহারো ভার গ্রহণের শক্তি তাহার নাই। পরের মুখে-শেখা এই আত্ম-অবিশ্বাস এতদিন সকল বিষয়েই তাহাকে দুর্বল করিয়াছে। সে ভাবিয়াছে স্ত্রী-পুত্র কন্যা—তাহাদের কতদিকে কতরকমে প্রয়োজন, খাওয়া-পরা বাড়ি-ভাড়া হইতে আরম্ভ করিয়া রোগ শোক বিদ্যা অর্জন—দাবীর অন্ত নাই! এ মিটাইবে সে কোথা হইতে? কিন্তু তাহার এই সংশয়ে প্রথম কুঠার হানিয়াছে সারদা,—অকূল সমুদ্র-মাঝে সে যেদিন তাহাকে আশ্রয় করিয়াছে—প্রত্যুত্তরে তাহাকেও যেদিন সে অভয় দিয়া বলিয়াছে, তোমার ভয় নেই সারদা, আমি তোমার ভার নিলাম। সারদা তাহাকে বিশ্বাস করিয়া ঘরে ফিরিয়াছে,—বাঁচিতে চাহিয়াছে। এই পরের বিশ্বাসই রাখালকে এতদিনে নিজের প্রতি বিশ্বাসবান্ করিয়াছে। আবার এই বস্তুটাই তাহার বহুগুণে বাড়িয়া গেছে, এবার প্রবাস হইতে ফিরিয়া। তাহার কেবলই মনে হইয়াছে সে অক্ষম নয়, দুর্বল নয়, সংসারে অনেকের মতো সেও অনেক-কিছু পারে। এই নবজাগ্রত চেতনার বলিষ্ঠ চিত্ত লইয়া সে প্রথমেই দেখা করিতে গেল সারদার সঙ্গে। ঘরে তালা বন্ধ। একটি ছোট ছেলে খেলা করিতেছিল; সে বলিল, বৌদি গেছে ওপরে গিন্নীমার ঘরে—রাত্তিরে আমাদের সক্কলের নেমন্তন্ন।

রাখাল উপরে গিয়া দেখিল সমারোহ ব্যাপার, লোক-খাওয়ানোর বিপুল আয়োজন চলিতেছে। রমণীবাবু অকারণে অতিশয় ব্যস্ত, কাজের চেয়ে অকাজই বেশী করিতেছেন এবং সারদা কোমরে কাপড় জড়াইয়া জিনিসপত্র ভাঁড়ারে গুছাইয়া তুলিতেছে। রমণীবাবু যেন বাঁচিয়া গেলেন—এই যে রাজু এসেছ! নতুন-বৌ?

সবিতা অন্যত্র ছিলেন, চীৎকারে কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রমণীবাবু হাঁফ ছাড়িয়া বলিলেন, যাক বাঁচা গেছে—রাজু এসে পড়েছে। বাবা, এখন থেকে সব ভার তোমার।

সবিতা বলিলেন, সেই ভালো, তুমি এখন ঘরে গিয়ে একটু জিরোও গে, আমরা নিস্তার পাই।

সারদা অলক্ষ্যে একটু হাসিল; রাখালকে জিজ্ঞাসা করিল, কবে এলেন?

কাল।

কাল? তবে কালকেই এলেন না যে বড়ো?

অনেক কাজ ছিল, সময় পাইনি।

সবিতা সহাস্যে বলিলেন, ওকে মরা বাঁচিয়েছে বলে রাজুর ওপর মস্ত দাবী।

সারদা সন্দেশের ঝুড়িটা তুলিয়া লইয়া গেল।

রাখাল রমণীবাবুকে নমস্কার করিল এবং সবিতাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এত ধুমধাম কিসের নতুন-মা?

সবিতা স্মিতমুখে কহিলেন, এমনিই।

রমণীবাবু বলিলেন, হুঁ—এমনিই বটে, সেই মেয়ে তুমি। পরে তাঁহাকে দেখাইয়া বলিলেন, উনি আধামূল্যে একটা মস্ত সম্পত্তি খরিদ করলেন, এ তারই খাওয়া। আমার সিঙ্গাপুরের পার্টনার এসেছে কলিকাতায়—বি. সি. ঘোষ নাম শুনেছো? শোনোনি—আচ্ছা, আজ রাত্তিরে তাকে দেখতে পাবে, কোটী টাকার মালিক। আরও আছে আমার এখানকার বন্ধু-বান্ধব উকিল-এটর্নী. মায় দু-তিনজন ব্যারিস্টার পর্যন্ত। একটু গান-বাজনাও হবে—খাসা গাইছে আজকাল মালতীমালা—শুনে সুখ পাবে হে। সবিতা একটু বাধা দিবার চেষ্টা করিতেই বলিয়া উঠিলেন, নাও, ছলনা রাখো। কিন্তু কপাল করেছিলে বটে! দেশে থাকতে কোন এক শালাকে অনেক টাকা ধার দিয়েছিলেন, সেইটেই হঠাৎ আদায় হয়ে গেল। ডোবা কড়ি বাবাজী, ডোবা কড়ি,—এমন কখনো হয় না। নিতান্তই বরাতের জোর! ব্যাটা ভয়ে পড়ে কেমন দিয়ে ফেললে! কিন্তু তাতেই কি কুলোলো? হাজার-দশেক কম পড়ে যায়, আমাকে আবদার ধরলেন, সেজবাবু, ওটা তুমি দিয়ে দাও। বললুম, শ্রীচরণে অদেয় কি আছে বলো? এ দেহ-মন-প্রাণ সবই তো তোমার! এই বলিয়া তিনি অত্যন্ত অরুচিকর স্থূল রসিকতার আনন্দে নিজেই হিঃ হিঃ হিঃ করিয়া টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিলেন। রাখাল লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া রহিল।

রমণীবাবু চলিয়া গেলে সবিতা বলিলেন, বেলা হলো, এইখানেই স্নান করে দুটি খেয়ে নাও বাবা, ও-বেলায় তোমাকে আবার অনেক খাটতে হবে। অনেক কাজ।

রাখাল কহিল, কাজে ভয় পাইনে মা, খাটতেও রাজী আছি কিন্তু এ-বেলাটা নষ্ট করতে পারবো না। আমাকে ও-বাড়িতে একবার যেতে হবে।

কাল গেলে হয় না?

না।

তবে কখন আসবে বলো?

আসবো নিশ্চয়ই, কিন্তু কখন কি করে বলবো মা?

তারক এখানে নেই বুঝি?

না, সে তার বর্ধমানের মাস্টারিতে গিয়ে ভর্তি হয়েছে। থাকলেও হয়তো আসতো না।

তাহার তীব্র ভাবান্তর সবিতা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, একটু প্রসন্ন করিতে কহিলেন, ওঁর ওপর রাগ করো না রাজু, ওঁদের কথাবার্তাই এমনি।

এই ওকালতিতে রাখাল মনে মনে আরও চটিয়া গেল, বলিল, না মা, রাগ নয়, একটা গরুর ওপর রাগ করতে যাবোই বা কিসের জন্যে। বলিয়াই চলিয়া গেল। সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে কহিল, নাঃ—কৃতজ্ঞতার ঋণ মনে রাখা কঠিন।

যদিচ, রাখাল মনে মনে বুঝিয়াছে, যে-লোকটি নতুন-মার অত টাকার দেনা শোধ করিয়াছে তাহার নাম রমণীবাবু জানে না, তথাপি সেই ধর্মপ্রাণ সদাশয় মানুষটির প্রতি এই অশিষ্ট ভাষা সে ক্ষমা করিতে পারিল না। অথচ নতুন-মা আমলই দিলেন না যেন কথাটা কিছুই নয়। পরিশেষে তাঁহারই প্রতি লোকটার কদর্য রসিকতা। কিন্তু এবার আর তাহার রাগ হইল না; বরঞ্চ উহাই যেন তাহার মনের জ্বালাটাকে হঠাৎ হালকা করিয়া দিল। সে মনে মনে বলিল, এ ঠিকই হয়েছে। এই ওঁর প্রাপ্য। আমি মিথ্যে জ্বলে মরি।

বৌবাজারে ট্রাম হইতে নামিয়া গলির মধ্যে ঢুকিয়া ব্রজবিহারীবাবুর বাটীর সম্মুখে আসিয়া রাখালের মনে হইল তাহার চোখে ধাঁধা লাগিয়াছে—সে আর কোথাও আসিয়া পড়িয়াছে। এ কি! দরজায় তালা দেওয়া, উপরের জানালাগুলো সব বন্ধ—একটা নোটিশ ঝুলিতেছে—বাড়ি ভাড়া দেওয়া হইবে। সে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া নিজেকে প্রকৃতিস্থ করিয়া গলির মোড়ে মুদির দোকানে আসিয়া উপস্থিত হইল। দোকানী অনেকদিনের, এ-অঞ্চলের সকল ভদ্রগৃহেই সে মাল যোগায়। গিয়া ডাকিল, নবদ্বীপ, কাকাবাবুর বাড়ি ভাড়া কি-রকম?

নবদ্বীপ তাহাকে ভিতরে আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি কিছু জানেন না রাখালবাবু?

না, আমি এখানে ছিলাম না।

নবদ্বীপ কহিল, দেনার জন্য বাবু বাড়িটা বিক্রি করে দিলেন যে।

বাড়ি বিক্রি করে দিলেন! কিন্তু তাঁরা সব কোথায়?

গিন্নী নিজের মেয়ে নিয়ে গেছেন ভায়ের বাড়ি। ব্রজবাবু রেণুকে নিয়ে বাসা ভাড়া করেছেন।

বাসাটা চেনো নবদ্বীপ?

চিনি, বলিয়া সে হাত দিয়া দেখাইয়া কহিল, এই সোজা গিয়ে বাঁ-হাতি গলিটার দুখানা বাড়ির পরেই সতের নম্বরের বাড়ি।

সতের নম্বরে আসিয়া রাখাল দরজায় কড়া নাড়িল, দাসী খুলিয়া দিয়া তাহাকে দেখিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল। রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, ফটিকের মা, কাকাবাবু কোথায়?

ওপরে রান্না করচেন।

বামুন নেই?

না!

চাকর?

মধু আছে, সে গেছে ওষুধ আনতে।

ওষুধ কেন?

দিদিমণির জ্বর, ডাক্তার দেখ্‌চে।

রাখাল কহিল, জ্বরের অপরাধ নেই। কবে এখানে আসা হলো?

দাসী বলিল, চার দিন। চার দিনই জ্বরে পড়ে।

ভিজা স্যাঁতসেঁতে উঠানময় জিনিসপত্র ছড়ানো, সিঁড়িটা ভাঙ্গা, রাখাল উপরে উঠিয়া দেখিল সামনের বারান্দার এককোণে লোহার উনুন জ্বালিয়া ব্রজবাবু গলদঘর্ম। সাগু নামিয়াছে, রান্নাও প্রায় শেষ হইয়াছে, কিন্তু হাত পুড়িয়াছে, তরকারি পুড়িয়াছে, ভাত ধরিয়া চোঁয়া গন্ধ উঠিয়াছে।

রাখালকে দেখিয়া ব্রজবাবু লজ্জা ঢাকিতে বলিয়া উঠিলেন, এই দ্যাখো রাজু, ফটিকের মার কাণ্ড! উনুনে এত কয়লা ঢেলেছে যে আঁচটা আন্দাজ করতে পারলাম না। ফ্যানটা যেন—একটু গন্ধ মনে হচ্ছে, না?

রাখাল কহিল, তা হোক। আপনি উঠুন ত কাকাবাবু, বেলা বারোটা বেজে গেছে—গোবিন্দর পুজোটি সেরে নিন, আমি ততক্ষণ নতুন করে ভাতটা চড়িয়ে দিই—ফুটে উঠতে দশ মিনিটের বেশী লাগবে না। রেণু কৈ? বলিয়া সে পাশের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল সে নিজের বিছানায় শুইয়া। রাজুদাকে দেখিয়া তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। রাখাল কোনমতে নিজেরটা সামলাইয়া লইয়া বলিল, কান্নাটা কিসের? জ্বর কি কারো হয় না? ও দুদিনে সেরে যাবে, আর আমি ত মরিনি রেণু, ভাবনার কি আছে? উঠে বসো? মুখ-ধোয়া, কাপড়-ছাড়া হয়েছে ত?

রেণু মাথা নাড়িতেই রাখাল চেঁচাইয়া ডাকিল, ফটিকের মা, তোমার দিদিমণিকে সাগু দিয়ে যাও—বড্ড দেরি হয়ে গেছে। সে আসিলে বলিল, ভাতটা ধরে গেছে ফটিকের মা, ওতে চলবে না। তুমি, আমি, মধু আর কাকাবাবু—চারজনের মতো চাল ধুয়ে ফেলো, আমি নীচে থেকে চট করে স্নানটা সেরে আসি। কাঁচা আনাজ কিছু আছে ত?

আছে।

বেশ, তাও দুটো কুটে দাও দিকি, একটা চচ্চড়ি রেঁধে নিই,—আমি আবার এক তরকারি দিয়ে ভাত খেতে পারিনে।

রেলিঙের উপর কাচা-কাপড় শুকাইতেছিল, রাখাল টানিয়া লইয়া নীচে চলিল, বলিতে বলিতে গেল, কাকাবাবু, দেরি করবেন না, শিগগির উঠুন। রেণু, নেয়ে এসে যেন দেখতে পাই তোমার খাওয়া হয়ে গেছে। মধু এসে পড়লে যে হয়—

বিষণ্ণ, নীরব গৃহের মাঝে হঠাৎ কোথা হইতে যেন একটা চেঁচামেচির ঝড় বহিয়া গেল।

স্নানের ঘরে ঢুকিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখাল ভিজা মেজেয় পড়িয়া মিনিট দুই-তিন হাউ হাউ করিয়া কান্না জুড়িয়া দিল—ছেলেবেলায়, অকস্মাৎ যেদিন বিসূচিকায় তাহার বাপ মরিয়াছিল ঠিক সেদিনের মতো। তার পরে উঠিয়া বসিল; ঘটি-কয়েক জল মাথায় ঢালিয়া কাপড় ছাড়িয়া বাহিরে আসিল। একেবারে সহজ মানুষ—কে বলিবে ঘরে কপাট দিয়া এইমাত্র সে বালকের মতো মাটিতে পড়িয়া কি কাণ্ডই করিতেছিল।

রাঁধা-বাড়ায় রাখাল অপটু নয়। নিজের জন্য এ কাজ তাহাকে নিত্য করিতে হয়। সে অল্পক্ষণেই সমস্ত সারিয়া ফেলিল। তাহার তাড়ায় ঠাকুরের পূজা, ভোগ প্রভৃতি সমাধা হইতেও আজ অযথা বিলম্ব ঘটিল না। রাখাল পরিবেশন করিয়া সকলকে খাওয়াইয়া, নিজে খাইয়া নীচে হইতে গা ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া, আবার যখন উপরে আসিল তখন বেলা তিনটা বাজিয়াছে। রেণু অদূরে বসিয়া সমস্ত দেখিতেছিল, শেষ হইতে বলিল, রাজুদা, তুমি আমাদেরও হারিয়েছো। তোমার যে বৌ হবে সে ভাগ্যবতী; কিন্তু বিয়ে কি তুমি করবে না?

রাখাল হাসিয়া বলিল, কি করে করবো ভাই, অতবড় ভাগ্যবতীর দেখা মিলবে তবে ত?

না, সে হবে না। বাবাকে ধরে এবার আমি নিশ্চয় তোমার একটি বিয়ে দিয়ে দেবো।

তাই দিও, আগে সেরে ওঠো। বিনোদ ডাক্তার আজ কি বললে? জ্বরটা ছাড়চে না কেন?

ফটিকের মা দাঁড়াইয়াছিল, বলিল, ডাক্তারবাবু আজ ত আসেন নি, এসেছিলেন পরশু। সেই এক ওষুধই চলচে।

শুনিয়া রাখাল স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার শঙ্কিত মুখের প্রতি চাহিয়া রেণু লজ্জা পাইয়া কহিল, রোজ ওষুধ বদলানো বুঝি ভালো! আর মিছামিছি ডাক্তারকে টাকা দিতে থাকলেই বুঝি অসুখ সেরে যায় ফটিকের মা? আমি এতেই ভালো হয়ে যাবো তোমরা দেখে নিও।

রাখাল কথা কহিল না, বুঝিল দুর্দশায় পড়িয়া সামান্য গুটিকয়েক টাকাও আর সে পিতার খরচ করাইতে চাহে না।

তুমি কি চলে যাচ্ছো রাজুদা?

আজ যাই ভাই, কাল সকালেই আবার আসবো।

নিশ্চয় আসবে ত?

নিশ্চয় আসবো। আমি না আসা পর্যন্ত কাকাবাবুকে উনুনের কাছেও যেতে দিও না রেণু।

শুনিয়া রেণু কত যেন কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল, বলিল, কাল যদি আমার জ্বর না থাকে আমি রাঁধবো রাজুদা?

কিছুতেই না। ঝিকে সাবধান করিয়া দিয়া কহিল, আমি না এলে কাউকে কিছু করতে দিও না ফটিকের মা। এই বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

বিনোদ ডাক্তার পাড়ার লোক, একটু দূরে বাড়ি—নীচের তলায় ডিস্‌পেনসারি, সেখানে তাঁহার দেখা মিলিল; রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, রেণুর জ্বরটা কি রকম ডাক্তারবাবু? আজও ছাড়েনি কেন?

বিনোদবাবু বলিলেন, আশা করি সহজ। কিন্তু আজও যখন—তখন দিন-দুই না গেলে ঠিক বলা যায় না রাখাল।

ডাক্তার এই পরিবারের বহুদিনের চিকিৎসক, সকলকেই জানেন। ইহার পর ব্রজবাবুর আকস্মিক দুর্ভাগ্য লইয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করিলেন, বিস্ময় প্রকাশ করিলেন, শেষে বলিলেন, তুমি যখন এসে পড়েচো রাখাল, তখন ভাবনা নেই। আমি সকালেই যাবো।

নিশ্চয় যাবেন ডাক্তারবাবু, আমাদের ডাকবার লোক নেই।

ডাকবার দরকার নেই রাখাল, আমি আপনিই যাবো।

সেখান হইতে ফিরিয়া রাখাল নিজের বাসায় আসিয়া শুইয়া পড়িল। মন একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। ব্রজবাবুর দুর্দশা যে কত বৃহৎ ও সর্বনাশের পরিমাণ যে কিরূপ গভীর, নানা কাজের মধ্যে এ কথা এখনো সে ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ পায় নাই, নির্জনে ঘরের মধ্যে এইবার তাহার দু'চোখ বাহিয়া হুহু করিয়া জল পড়িতে লাগিল। কোথায় যে

ইহার কূল এবং এই দুঃখের দিনে সে যে কি করিতে পারে ভাবিয়া পাইল না। কি করিয়া যে এত শীঘ্র এমনটি ঘটিল তাহা কল্পনার অগোচর। তার উপর রেণু পীড়িত। পাড়ায় টাইফয়েড জ্বর হইতেছে সে জানিত. ডাক্তারের কথার মধ্যেও এমনি একটা সন্দেহের ইঙ্গিত সে লক্ষ্য করিয়াছে। উপদেশ দিবার লোক নাই, শুশ্রূষা করিতে কেহ নাই. চিকিৎসা করাইবার অর্থও হয়তো হাতে নাই। এই নিরীহ নির্বিরোধী মানুষটির কথা আগাগোড়া চিন্তা করিয়া তাহার সংসারে ধর্মবুদ্ধি, ভগবৎভক্তি, সাধুতা সকলের 'পরেই যেন ঘৃণা ধরিয়া গেল। সে ভাবিতেছিল. দিল্লী হইতে ফিরিয়া নানাবিধ অপব্যয়ে তাহার নিজের হাতও শূন্য, পোস্টাফিসে সামান্য যাহা অবশিষ্ট আছে তাহার 'পরে একটা দিনও নির্ভর করা চলে না. অথচ, এই রেণু তাহার কাছেই একদিন মানুষ হইয়াছে। কিন্তু সে কথা আজ থাক। তাহারই চিকিৎসায় তাহারই কাছে গিয়া হাত পাতিবে সে কি করিযা? যদি না থাকে। সে জানে. যে-বাটীতে সে ছেলে পড়ায় তাঁহারা অত্যন্ত কৃপণ। বন্ধু-বান্ধব অনেক আছে সত্য, কিন্তু সেখানে আবেদন করা তেমনি নিষ্ফল। অনেক 'বড়লোক' গোপনে তাহারই কাছে ঋণী, সে-ঋণ নিজে সে না ভুলিলেও তাঁহারা ভুলিয়াছেন।

সহসা মনে পড়িল নতুন-মাকে। কিন্তু দীপশিখা জ্বলিযাই স্তিমিত হইয়া আসিল-সেখানে দাও বলিয়া দাঁড়ানোর কল্পনাও তাহাকে কুণ্ঠিত করিল। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিবেই বা কি এবং বলিবেই বা কি করিয়া। এ পথ নয়, কিন্তু আর-একটা পথও তাহার চোখে পড়িল না; কিন্তু সে বলিলে ত চলিবে না, পথ তাহার চাই-ই তাহাতে পাইতেই হইবে।

দাসী আসিয়া খাবার কথা বলিলে সে নিষেধ করিযা জানাইল তাহার অন্যত্র নিমন্ত্রণ আছে। এমন প্রায়ই থাকে।

ঝি চলিয়া গেলে সে-ও দ্বারে চাবি দিল। রাখাল শৌখিন লোক. বেশভূষার সামান্য অপরিচ্ছন্নতাও তাহার সহ্য হয না. কিন্তু আজ সে কথা তাহার মনেই পড়িল না যেমন ছিল তেমনিই বাহির হইয়া গেল।

নতুন-মার বাটীতে আসিয়া যখন পৌঁছিল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। সম্মুখে খান-কয়েক মোটর দাঁড়াইয়া. বৃহৎ অট্টালিকা বহুসংখ্যক বিদ্যুৎ-দীপালোকে সমুজ্জ্বল, দ্বিতলের বড় ঘরে বাদ্যযন্ত্র বাঁধাবাঁধির শব্দ উঠিয়াছে. গৃহস্বামিনী নিরতিশয় ব্যস্ত—ভাগ্যবান আমন্ত্রিতগণের আদর-আপ্যায়নে ত্রুটি না ঘটে—রাখালকে দেখিয়া একমুহূর্ত থমকিয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিলেন, এতক্ষণে বুঝি আমাদের মনে পড়লো বাবা?

এ-কয়দিন যে নতুন-মাকে সে দেখিয়াছে. এ যেন সে নয়, অভিনব ও বহুমূল্য বেশ-ভূষার পারিপাট্যে তাঁহার বয়সটাকে যেন দশ বৎসর পিছনে ঠেলিযা দিয়াছে. রাখাল কেমন একপ্রকার হতবুদ্ধির মতো চাহিয়া রহিল. সহসা উত্তর দিতে পারিল না। তিনি তখনই আবার বলিলেন, আজ একটু কাজ করে দিতে বলেছিলুম বলে বুঝি একেবারে রাত্তির করে এলে রাজু?

রাখাল নম্রভাবে বলিল, কাজ সারতে দেরি হয়ে গেল মা। তা ছাড়া আমার না-আসতে পারায় ক্ষতি ত কিছুই হয়নি।

না, ক্ষতি হয়নি সত্যি, কিন্তু তখন বলে গেলেই ভালো হতো। তাঁহার কণ্ঠস্বরে এবার একটু বিরক্তির সুর মিশিল।

রাখাল বলিল. তখন নিজেও জানতাম না নতুন-মা। তারপরে আর সময় পেলাম না।

কে-একজন ডাকিতে সবিতা চলিয়া গেলেন, মিনিট-পাঁচেক পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন রাখাল তেমনি দাঁড়াইয়া আছে, বলিলেন, দাঁড়িয়ে কেন রাজু, ঘরে গিযে বসো গে।

রাখাল কিছুতেই সঙ্কোচ কাটাইতে পারে না, কিন্তু তাহার না বলিলেই নয়. শেষে আস্তে আস্তে বলিল, একটা বিশেষ প্রয়োজনে এসেছি নতুন-মা, আমাকে আজ কিছু টাকা দিতে হবে।

সবিতা সবিস্ময়ে চাহিলেন, বলিতে বোধ হয় তাঁহারও বাধিল, কিন্তু বলিলেন. টাকা?

টাকা ত নেই রাজু—যা ছিল ওটা কিনতেই সব খরচ হয়ে গেছে, ও-বেলাই ত শুনে গেলে?

কিছুই নেই মা?

না থাকার মধ্যেই। ঘর করতে সামান্য যদি কিছু থাকেও খুঁজে দেখতে হবে। সে অবসর ত নেই।

সারদা নানা কাজে আনাগোনা করিতেছিল, কথাটা শুনিতে পাইয়া কাছে আসিয়া বলিল, আমার কাছে দশ টাকা আছে, এনে দেবো?

রাখাল তাহার মুখের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া কহিল, তুমি দেবে? আচ্ছা, দাও।

সারদা বলিল, মিনুর দিদিমার হাতে টাকা আছে, জিনিস রাখলে ধার দেয়।

তাঁর কাছে আমাকে নিয়ে যেতে পারো সারদা?

কেন পারবো না—তিনি ত বুড়োমানুষ। কিন্তু আমার তো জিনিস কিছু নেই—

তবু চলো না দেখি গে।

আসুন।

তাহাদের যাইবার সময় সবিতা বলিলেন, তা বলে না খেয়ে নীচে থেকেই যেন চলে যেও না রাজু—

রাখাল ফিরিয়া দাঁড়াইল, কহিল, আজ বড় অ-বেলায় খাওয়া হয়েছে নতুন-মা, ক্ষিদের লেশ নেই। আজ আমাকে ক্ষমা করতে হবে। এই বলিয়া সে সারদার পিছনে নীচে নামিয়া গেল। সবিতা আর তাহাকে অনুরোধ করিলেন না।

রাখাল চলিয়া গেছে, সারদা নিজের ঘরের দুই-একটা বাকী কাজ সারিয়া লইয়া পুনরায় উপরে যাইবার উপক্রম করিতেছে, সবিতা আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাহার বিছানায় বসিয়া পড়িয়া কহিলেন, একটা পান দাও ত মা, খাই।

এ ভাগ্য কখনো সারদার হয় নাই, সে বর্তিয়া গেল। তাড়াতাড়ি হাতটা ধুইয়া ফেলিয়া পান সাজিতে বসিতেছে, তিনি বলিলেন, রাজু না খেয়ে রাগ করে চলে গেল?

এত কাজের মধ্যেও ব্যাপারটা ভিতরে ভিতরে তাঁহাকে বিঁধিতেছিল, ঝাড়িয়া ফেলিতে পারেন নাই।

সারদা মুখ তুলিয়া কহিল, না মা, রাগ করে ত নয়।

রাগ করে বৈ কি। ও সকাল থেকেই একটু রেগে ছিল, তাতে আবার টাকা দিতে পারিনি—তুমি বুঝি দশ টাকা তারে দিলে?

না মা, আমার কাছে নিলেন না, মিনুর দিদিমার কাছ থেকে এক শ' টাকা এনে দিলুম।

এমনি? শুধু-হাতে সে দিল যে বড়ো?

সারদা বলিল, না, এমনি তো নয়। উনি হাতের সোনার ঘড়িটা আমাকে খুলে দিয়ে বললেন, এর দাম তিন শ' টাকা, তিনি যা দেন নিয়ে এসো। ওঁর চা-বাগানের কিছু কাগজ আছে, তাই বিক্রি করে এই মাসেই শোধ দেবেন বললেন।

সবিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, হঠাৎ টাকার দরকার ওর হলো কিসে?

সারদা কহিল, কে-একটি মেয়ে বড় পীড়িত, তারই চিকিৎসার জন্যে।

মেয়েটি কে যে তার জন্যে রাতারাতি ওকে ঘড়ি বন্ধক দিতে হয়?

সে ত জানিনে মা! কিন্তু, বোধ হয় তার খুব শক্ত অসুখই হয়েছে। টাকার অভাবে পাছে মারা যায়, এই তাঁর ভয়। মেয়েটির বাপ নাকি ছেলেবেলায় ওঁকে মানুষ করেছিলেন।

সবিতা আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, ছেলেবেলায় ওকে মানুষ করেছিল বললে? এ ওর বানানো গল্প। রাজুকে কে মানুষ করেচে আমি জানি। তাঁর মেয়ের চিকিৎসায় পরকে ঘড়ি বাঁধা দিতে হয় না।

সারদা তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, বানানো গল্প বলে ত মনে হয় না মা। বলতে গিয়ে চোখে জল এলো—বললেন, এঁদেরও বিত্ত-বিভব অনেক ছিল, কিন্তু হঠাৎ ব্যবসা নষ্ট হয়ে দেনার জন্যে বাড়ি-ঘর পর্যন্ত বিক্রি করে দিতে হলো, অথচ দিল্লী যাবার আগেও এমন দেখে যাননি। আজ গিয়ে দেখেন শয্যাগত মেয়েটিকে দেখবার কেউ নেই—

বুড়ো বাপ আপনি বসেছে রাঁধতে—কিন্তু জানে না কিছুই—হাত পুড়েচে, ভাত পুড়েচে, তরকারি পুড়ে গন্ধ উঠেছে—রাখালবাবুকে সমস্ত আবার রাঁধতে হলো, তবে সকলের খাওয়া হয়। তাই এখানে আসতে তাঁর দেরি। আমাকে বলেছিলেন এ দুঃসময়ে তাদের সাহায্য করতে। মেয়েটির ত মা নেই—তাকে একটু দেখতে। আমি রাজী হয়ে বলেচি, যা আপনি আদেশ করবেন তাই আমি করব।

সারদা পান দিল। সেটা তাঁর হাতে ধরাই রহিল; জিজ্ঞাসা করলেন; রাজু বললে হঠাৎ ব্যবসা নষ্ট হয়ে দেনার দায়ে তাঁর বাড়ি পর্যন্ত বিক্রি হয়ে গেল? দিল্লী যাবার আগেও তা দেখে যায়নি?

হাঁ, তাই ত বললেন।

অসম্ভব।

সারদা চুপ করিয়া রহিল। সবিতা পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন, রাজু বললে মেয়েটির মা নেই—মারা গেছে বুঝি?

সারদা বলিল, মা যখন নেই তখন মরে গেছে নিশ্চয়, আর কি হতে পারে মা?

সবিতা উঠিয়া গেলেন। মিনিট পাঁচ-ছয় পরে সারদা প্রদীপ নিবাইয়া ঘর বন্ধ করিতেছিল, তিনি ফিরিয়া আসিলেন। পরনে সে বস্ত্র নাই, গায়ে সে-সব আভরণ নাই, মুখ উদ্বেগে ম্লান,—বলিলেন, আমার সঙ্গে তোমাকে একবার বাইরে যেতে হবে।

কোথায় মা?

রাজুর বাসায়।

এই রাত্তিরে? আমি নিশ্চয় বলচি মা, তিনি দুঃখ একটু করেছেন, কিন্তু রাগ করে চলে যাননি। তা ছাড়া, বাড়িতে কত কাজ, কত লোক এসেচে, সবাই খুঁজবে যে মা?

কেউ জানতে পারবে না সারদা, আমরা যাবো আর আসবো।

সারদা সন্দিগ্ধ-স্বরে কহিল, ভাল হবে না মা, হয়তো একটা গোলমাল উঠবে। বরঞ্চ কাল দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পরে গেলে কেউ জানতেও পারবে না।

সবিতা কয়েক-মুহূর্ত তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, আজ রাত্তির যাবে, কাল সকাল যাবে, তারপরে দুপুরবেলায় খাওয়া-দাওয়া সেরে তবে যাবো? ততক্ষণে যে পাগল হয়ে যাবো সারদা?

এই উৎকণ্ঠার হেতু সারদা বুঝিল না, কিন্তু আর আপত্তিও করিল না,—নীরব হইয়া রহিল।

যে-দরজায় ভাড়াটেরা যাতায়াত করে সেখানে আসিয়া উভয়ে উপস্থিত হইলেন এবং মিনিট-দুই পরে পথচারী একটা খালি ট্যাক্সি ডাকিয়া তাহাতে উঠিয়া বসিলেন। চোখ পড়িল ঠিক উপরেই—আলোকোজ্জ্বল প্রশস্ত কক্ষটি তখন সঙ্গীতে হাস্যে ও আনন্দ-কলরবে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। একটি রুমালে বাঁধা বাণ্ডিল সারদার হাতে দিয়া সবিতা বলিলেন, আঁচলে বেঁধে রাখো ত মা, রাজু আমার হাত থেকে হয়তো নেবে না—তুমি তাকে দিও।

দশ মিনিট পরে তাঁহারা পায়ে হাঁটিয়া রাখালের ঘরের সম্মুখে আসিয়া দেখিলেন বাহিরে হইতে কবাট বন্ধ, ভিতরে কেহ নাই। দুজনে নিঃশব্দে ফিরিয়া আসিয়া গাড়িতে বসিলেন এবং আরো মিনিট-পাঁচেক পরে বৌবাজারের একটা বৃহৎ বাটীর সম্মুখে আসিয়া তাঁহাদের গাড়ি থামিল। নামিতে হইল না, দেখা গেল সে গৃহেরও দ্বার রুদ্ধ। পথের আলো উপরের অবরুদ্ধ জানালায় গিয়া পড়িয়াছে; সেখানে বড় বড় লাল অক্ষরে নোটিশ ঝুলিতেছে—বাড়ি ভাড়া দেওয়া যাইবে।

নিদারুণ বিপদের মুখে নিজেকে মুহূর্তে সামলাইয়া ফেলিবার শক্তি সবিতার অসাধারণ। তাঁহার মুখ দিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস পর্যন্ত পড়িল না, গৃহে ফিরিবার আদেশ দিয়া গাড়ির কোণে মাথা রাখিয়া পাষাণ মূর্তির ন্যায় বসিয়া রহিলেন।

ঠিক কি হইয়াছে অনুমান করা সারদার কঠিন, কিন্তু সে এটা বুঝিল যে, রাখাল মিথ্যা বলিয়া আসে নাই এবং সত্যই ভয়ানক কি-একটা ঘটিয়াছে।

ফিরিবার পথে সে সবিতার শিথিল হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ কার বাড়ি মা? এই বাড়িই বিক্রি হয়ে গেছে?

হাঁ।

এ'র মেয়ের অসুখের কথাই তিনি বলছিলেন?

জবাব না পাইয়া সে আবার আস্তে আস্তে বলিল. কোথায় তাঁরা আছেন খোঁজ নেওয়া যে দরকার।

কোথায়, কার কাছে খোঁজ নেবো সারদা?

কাল নিশ্চয় রাখালবাবু আমাকে নিতে আসবেন।

কিন্তু যদি না আসে? আমার বাড়িতে আর যদি সে পা দিতে না চায়?

সারদা চুপ করিয়া রহিল। রাখাল টাকা চাহিয়াছে, তিনি দিতে পারেন নাই, এইটুকু মাত্রকে উপলক্ষ করিয়া নতুন-মার এতবড় উৎকণ্ঠা আবেগ ও আত্মগ্লানিতে তাহার মনের মধ্যে অত্যন্ত ধাঁধা লাগিল; তাহার সন্দেহ জন্মিল বিষয়টা বস্তুতঃ এই নয়, ভিতরে কি একটা নিষ্ঠুর রহস্য আছে। সবিতা যে রমণীবাবুর পত্নী নয়—এ কথা না জানার ভান করিলেও বাটীর সকলেই মনে মনে বুঝিত। তাহারা ভান করিত ভয়ে নয়, শ্রদ্ধায়। সবাই জানিত এ কোন বড়ঘরের মেয়ে, বড়ঘরের বৌ—আচারে আচরণে বড়, হৃদয়ে বড়, দয়া-দাক্ষিণ্যে ও সৌজন্যে আরও বড়, তাই তাঁহার এ দুর্ভাগ্য কাহারও উল্লাসের বস্তু ছিল না, ছিল পরিতাপ ও গভীর লজ্জার। দীর্ঘদিন একত্র বাস করিয়া সকলে তাঁহাকে এতই ভালবাসিত।

গলির মোড় ঘুরিতে কোন-একটা দোকানের তীব্র আলোর রেখা আসিয়া পলকের জন্য সবিতার মুখের 'পরে পড়িল; সারদা দেখিল, তাতে যেন প্রাণ নাই, হাতের তালুটা হঠাৎ মনে হইল, অতিশয় শীতল, সে সভয়ে একটা নাড়া দিয়া ডাকিল, মা?

কেন মা?

বহুক্ষণ পর্যন্ত আর কোন সাড়া নাই—অন্ধকারেও সারদার মনে হইল, তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতেছে, সে সাহস করিয়া হাত বাড়াইয়া দেখিল তাই বটে। সযত্নে আঁচলে মুছাইয়া দিয়া বলিল, মা, আমি আপনার মেয়ে, আমার আপনার বলতে সংসারে কেউ নেই, আমাকে যা করতে বলবেন আমি তাই করবো।

কথাগুলি সামান্যই। সবিতা উত্তরে কিছুই বলিলেন না, শুধু হাত বাড়াইয়া তাহাকে বুকের 'পরে টানিয়া লইলেন। অশ্রুবাষ্পের নিরুদ্ধ আবেগে সমস্ত দেহটা তাঁহার বার-কয়েক কাঁপিয়া উঠিল, তার পরে বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা সারদার মাথার উপরে একটি একটি করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

দুজনে বাড়ি ফিরিয়া যখন আসিলেন তখনও মালতীমালার গান চলিতেছে—তাঁহাদের স্বল্পকালের অনুপস্থিতি কেহ লক্ষ্য করে নাই। সবিতা নীচে হইতে স্নান করিয়া গিয়া উপরে উঠিতে ঝি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল মা, এখন নেয়ে এলে? মাথা ঘুরছিল বোধ করি?

হাঁ।

তাহলে কাপড় ছেড়ে একটু শুয়ে পড়ো গে মা সারাদিন যে খাটুনি হয়েছে।

সারদা কহিল, এদিকে আমি আছি মা, কোন ভাবনা নেই। দরকার হলেই আপনাকে ডেকে আনবো।

তাই এনো সারদা, আমি একটু শুই গে।

সে রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা কোনমতে চুকিল, অভ্যাগতেরা একে একে বিদায় লইয়া গেলেন, খাটের শিয়রে বসিয়া সারদা ধীরে ধীরে সবিতার মাথায়, কপালে হাত বুলাইয়া দিতেছিল; ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে রমণীবাবু প্রবেশ করিয়া তিক্তস্বরে কহিলেন, আচ্ছা

খেলাই খেললে! বাড়িতে কোন-একটা কাজ হলে তোমারও কোন-একটা ঢং করা চাই। এ তোমার স্বভাব। লোকেরা গেছে—এবার নাও ছলা-কলা রেখে একটু উঠে বসো,—একখানা ভালো কাপড় অন্ততঃ পরো—বিমলবাবু দেখা করতে আসচেন।

এরূপ উক্তি অভাবিত নয়, নূতনও নয়। বস্তুতঃ এমনিই কিছু-একটা সবিতা মনে মনে আশঙ্কা করিতেছিল, ক্লান্তস্বরে বলিল, দেখা কিসের জন্যে?

কিসের জন্যে! কেন, তারা কি ভিখিরী যে খেতে পায় না? বাড়িতে নেমন্তন্ন অথচ বাড়ির গিন্নীরই দেখা নেই। বেশ বটে!

সবিতা কহিল, নেমন্তন্ন হলেই কি বাড়ির গিন্নীর সঙ্গে দেখা করা প্রথা নাকি?

রমণীবাবু বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, প্রথা নাকি? প্রথা নয় জানি—স্ত্রী হলে আলাপ-পরিচয় করতে কেউ চায় না—কিন্তু তারা সব জানে।

সারদার সম্মুখে সবিতা লজ্জায় মরিয়া গেল। সারদা নিজেও পলাইবার চেষ্টা করিল কিন্তু উঠিতে পারিল না। এদিকে উত্তেজনা পাছে হাঁকাহাঁকিতে দাঁড়ায়, এই ভয় সবিতার সবচেয়ে বেশী, তাই নম্রভাবেই কহিলেন, আমি বড় অসুস্থ, তাঁকে বলো গে আজ দেখা হবে না।

কিন্তু ফল হইল উলটা। এই সহজ কণ্ঠের অস্বীকারে রমণীবাবু ক্ষেপিয়া গেলেন, চেঁচাইয়া উঠিলেন—আলবৎ দেখা হবে। সে কোটিপতি লোক তা জানো? বছরে আমার কত টাকার মাল কাটায় খবর রাখো? আমি বলছি—

দরজার বাইরে জুতার শব্দ শুনা গেল এবং চাকরটা সম্মুখে আসিয়া হাত দিয়া দেখাইয়া দিল।

সবিতা মাথার কাপড়টা কপাল পর্যন্ত টানিয়া দিয়া উঠিয়া বসিল। বিমলবাবু ঘরে ঢুকিয়া নমস্কার করিয়া নিজেই একটা চৌকি টানিয়া লইয়া বলিলেন, শুনতে পেলুম আপনি হঠাৎ বড় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, কিন্তু কালই বোধ হয় আমাকে কানপুরে যেতে হবে, হয়তো আর ফিরতে পারবো না, অমনি বোম্বাই হয়ে জাহাজে সোজা কর্মস্থলে রওনা হতে হবে। ভাবলুম, মিনিট-খানেকের জন্যে হলেও একবার সাক্ষাৎ করে জানিয়ে যাই আপনার আতিথ্যে আজ বড় তৃপ্তিলাভ করেচি।

সবিতা আস্তে আস্তে বলিল, আমার সৌভাগ্য।

লোকটির বয়স চল্লিশ, চুলে পাক ধরিতে শুরু করিয়াছে, কিন্তু সযত্ন-সতর্কতায় দেহ স্বাস্থ্য ও রূপে পরিপূর্ণ; কহিলেন, খবর পেলুম রমণীবাবু আজকাল প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়েন, আর আপনার শরীরও যে ভালো থাকে না সে তো স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছি। আপনার আর বছরের ফটোর সঙ্গে আজ মিল খুঁজে পাওয়া দায়—এমনি হয়েছে চেহারা।

শুনিয়া সবিতা মনে মনে লজ্জা পাইল, বলিলেন, আমার ফটো আপনি দেখেছেন নাকি?

দেখেচি বৈ কি! আপনাদের একসঙ্গে তোলা ছবি রমণীবাবু পাঠিয়েছিলেন। তখন থেকেই ভেবে রেখেচি, ছবির মালিককে একবার চোখে দেখবো। সে সাধ আজ মিটলো। চলুন না একবার আমাদের সিঙ্গাপুরে, দিন-কয়েকে সমুদ্র-যাত্রাও হবে, আর দেহটাও একটু বদলাবে। আমার ক্রস স্ট্রীটে একখানি ছোট বাড়ি আছে, তার উপর তলায় দিনরাত সাগরের হাওয়া বয়, সকাল সন্ধ্যায় সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত দেখতে পাওয়া যায়। রমণীবাবু যেতে রাজী হয়েছেন, শুধু আপনার সম্মতি আদায় করে নিয়ে যদি যেতে পারি ত জানবো এবার দেশে আসা আমার সার্থক হলো।

রমণীবাবু উল্লাসভরে বলিয়া উঠিলেন, আপনাকে ত কথা দিয়েছি বিমলবাবু আমি আসছে সপ্তাহেই রওনা হতে পারবো। সমুদ্রের জল-বাতাসের আমার বিশেষ প্রয়োজন। শরীরের স্বাস্থ্য—আপনি বলেন কি! ও হলো সকলের আগে।

বিমলবাবু কহিলেন, সে সৌভাগ্য হলে হয়তো এক জাহাজেই আমরা যাত্রা করতে পারবো। সবিতার উদ্দেশে স্মিতমুখে বলিলেন, অনুমতি হয় ত উদ্যোগ আয়োজন করি—আমার অফিসেও একটা তার করে দিই—বাড়িটার কোথাও যেন কোন ত্রুটি না থাকে? কি বলেন?

সবিতা মাথা নাড়িয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, না, এখন কোথাও যাবার আমার সুবিধে হবে না।

শুনিয়া রমণীবাবু আর একবার গরম হইয়া উঠিলেন—কেন সুবিধে হবে না, শুনি? লেখা-পড়া কাল-পরশু শেষ হয়ে যাবে, দরোয়ান চাকর বাড়িতে রইলো, ভাড়াটেরা রইলো, যাবার বাধাটা কি? না সে হবে না বিমলবাবু, সঙ্গে নিয়ে আমি যাবোই। না বললেই হবে? আমার শরীর খারাপ—আমার দেখাশোনা করবে কে? আপনি স্বচ্ছন্দে টেলিগ্রাম করে দিন।

বিমলবাবু পুনশ্চ সবিতাকেই লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, দিই একটা তার করে?

জবাব দিতে গিয়া এবার দুজনের চোখাচোখি হইয়া গেল, সবিতা সলজ্জে তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি আনত করিয়া কহিল, না। আমি যেতে পারবো না।

রমণীবাবু ভয়ানক রাগিয়া উঠিলেন—না কেন? আমি বলচি তোমাকে যেতে হবে। আমি সঙ্গে নিয়ে যাবোই।

বিমলবাবুর মুখ অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল, বলিলেন, কি করে নিয়ে যাবেন রমণীবাবু, বেঁধে?

হাঁ, দরকার হয় ত তাই।

তা হলে আর কোথাও নিয়ে যাবেন, আমি সে অন্যায়ের ভার নিতে পারবো না।

কি জানি, ঠিক প্রবেশমুখেই এই ব্যক্তির উচ্চ কলরব তাঁহার শ্রুতিগোচর হইয়াছিল কিনা। বলিলেন, আচ্ছা, আজ তা হলে উঠি—আপনি বিশ্রাম করুন। অসুস্থ শরীরের ওপর হয়তো অত্যাচার করে গেলুম—তবু, যাবার পূর্বে আমার অনুরোধই রইল—আমি প্রতি মাসে আপনাকে প্রিপেড টেলিগ্রাম করবো—এই প্রার্থনা জানিয়ে—দেখি কতবার না বলে তার জবাব দিতে পারেন। এই বলিয়া তিনি একটু হাসিলেন, বলিলেন,—নমস্কার—নমস্কার রমণীবাবু, আমি চললুম।

তিনি বাহির হইয়া গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে রমণীবাবুও নীচে নামিয়া গেলেন। রমণীবাবুর বন্ধু বলিয়া এবং অশিক্ষিত ব্যবসায়ী মনে করিয়া এই লোকটির সম্বন্ধে যে ধারণা সবিতার জন্মিয়াছিল, চলিয়া গেলে মনে হইল হয়ত তাহা সত্য নয়।

সাত

সারদা বলিল, মা, খাবেন না কিছু

না।

এক গেলাস জল আর একটা পান দিয়ে যেতে বলবো

না, দরকার নেই।

আলোটা নিবিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যাবো?

তাই যাও সারদা, তোমার রাত হয়ে যাচ্চে।

তথাপি উঠি-উঠি করিয়াও তাহার দেরি হইতেছিল, রমণীবাবু ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন, নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন যাক বাঁচা গেল, আজকের মতো কোনরকমে মান-রক্ষেটা হলো। ভদ্রলোক খাসা মানুষ অতবড় দরের লোক তা দেমাক অহঙ্কার নেই, তোমার জন্যে ত ভারী ভাবনা, একশো-বার অনুরোধ করে গেলো, কাল সকালে যেন একটা খবর পাঠিয়ে দিই। কি জানি, নিজেই হয়তো বা একটা মস্ত ডাক্তার নিয়ে সকালে হাজির হয়ে যায়—বলা যায় না কিছু—ওদের ত আর আমাদের মতো টাকার মায়া নেই—দশ-বিশ হাজার থাকলেই বা কি, গেলেই বা কি! রথমার কোম্পানি—ডিরেক্টারই বলো আর শেয়ার-হোল্ডারই বলো, যা করে ঐ মিস্টার ঘোষাল। বললুম যে তোমাকে, লোকটা কোটি টাকার মালিক! কোটি টাকা! জারমানি, হল্যান্ডের সঙ্গে মস্ত কারবার—বছরে দু-চার বার এমন য়ুরোপ ঘুরে আসতে হয়—জেনেরাল ম্যানেজার শপ্ সাহেবই ওর মাইনে পায় তিন হাজার টাকা। মস্ত লোক। জাভার চিনি চালানিতেই গেল বছরে—

মুনাফার রোমাঞ্চকর অঙ্কটা আর বলা হইল না,--বাধা পড়িল। সবিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি যে আবার ফিরে এলে, -বাড়ি গেলে না?

কোন্ প্রসঙ্গে কি কথা! প্রশ্নটা তাঁহার আনন্দবর্ধন করিল না এবং বুঝিলেন যে, তাঁহার 'মস্ত লোকের' বিবরণে সবিতা বিন্দুমাত্র মনঃসংযোগ করে নাই। একটু থতমত খাইয়া কহিলেন, বাড়ি? নাঃ আজ আর যাবো না।

কেন?

নাঃ—আজ আর--

সবিতা একমুহূর্ত তাঁহার প্রতি চাহিয়া কহিলেন, মদের গন্ধ বেরুচ্চে- তুমি মদ খেয়েচো?

মদ আমি? 'ইশাবাস। মাত্র একটি ফোঁটা - বুঝলে না

কোথায় খেলে, এই বাড়িতে?

শোন কথা! বাড়িতে নয় তো কি শুঁড়ির দোকানে দাঁড়িয়ে খেয়ে এলুম?

মদ আনালে কে বললে?

কে বললে! এমন কথা কখনও শুনিনি। বাড়িতে দু-দশজন ভদ্রলোককে আহ্বান করলে ও একটু না আনিয়ে রাখলে কি হয়? তাই-

সকলেই খেলে?

খেলে না? ভালো জিনিস অভাব করলে কোন্ শালা না খায় শুনি? অবাক করলে যে তুমি?

বিমলবাবু খেলেন?

রমণীবাবু এবার একটু ইতস্ততঃ করিলেন বলিলেন, না, আজ ও একটু চাল দেখিয়ে গেল। নইলে ওর কীর্তি-কাহিনী জানতে বাকী নেই আমার। জানি সব।

সবিতা একটু মৌন থাকিয়া বলিলেন, জানবে বৈ কি। আচ্ছা, যাও এখন। রাত হয়েছে, ও ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো গে।

বলার ধরনটা শুধু কর্কশ নয়, রূঢ়। সারদার কানেও অপমানকর ঠেকিল। আজ সন্ধ্যার পর হইতেই সবিতার নীরস কণ্ঠস্বরের প্রচ্ছন্ন রুক্ষতা রমণীবাবুকে বিঁধিতেছিল, এই কথায় সহসা অগ্নিকাণ্ডের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন--আজ তোমার হয়েছে কি বলো ত? মেজাজ দেখি যে ভারী গরম। এতটা ভাল নয় নতুন-বৌ!

সারদার ভয় হইল, এইবার বুঝি একটা বিশ্রী কলহ বাধিবে, কিন্তু সবিতা নীরবে চোখ বুজিয়া তেমনিই শুইয়া রহিল, একটা কথারও জবাব দিল না।

রমণীবাবু কহিতে লাগিলেন, ওই যে বলেচি, সবাই জানে তুমি স্ত্রী নও—তাতেই লেগেছে যত আগুন। কিন্তু জানে না কে? সারদা জানে না, না বাড়ির লোকের অজানা? একটা মিছে কথা কতদিন চাপা থাকে? এতে অপমানটা তোমার কি করলুম শুনি?

সবিতা উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার চোখের দৃষ্টি বর্শার ফলার মত তীক্ষ্ণ ও কঠিন, কহিলেন, এ কথা তুমি ছাড়া আর কোন পুরুষ মুখে আনতেও লজ্জা পেতো কেবল পুরুষ-মানুষ বলেই, কিন্তু তোমাকে বলা বৃথা। তোমার কথায় আমার অপমান হয়েচে আমি একবারও বলিনি।

সারদা ভয়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল—কি করচেন মা, থামুন।

রমণীবাবু কহিলেন, মুখে বলোনি সত্যি, কিন্তু মনে ভাবচো ত তাই।

সবিতা উত্তর দিল, না, মুখেও বলিনি, মনেও ভাবিনি। তোমার স্ত্রী-পরিচয়ে আমার মর্যাদা বাড়ে না সেজবাবু। ওতে শুধু চক্ষুলজ্জা বাঁচে, নইলে সত্যিকারের লজ্জায় ভেতরটা আমার পুড়ে কালি হয়ে ওঠে।

কেন? কেন শুনি?

কি হবে শুনে? এ কি তুমি বুঝবে যে, আমি যাঁর স্ত্রী তোমরা কেউ তাঁর পায়ের ধুলোর যোগ্য নও।

সারদা পুনরায় ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিল—এত রাত্তিরে কি করচেন মা আপনারা? দোহাই মা, চুপ করুন।

কিন্তু কেহই কান দিল না। রমণীবাবু কড়া গলায় হাঁকিলেন, সত্যি? সত্যি নাকি?

সবিতা কহিল, সত্যি কিনা তুমি নিজে জানো না? সমস্ত ভুলে গেলে? সেদিন তিনি ছাড়া সংসারে কেউ ছিল আমাদের রক্ষা করতে পারতো? শুধু হাড়-মাস রক্ষে করাই ত নয়, মান-ইজ্জত রক্ষে করেছিলেন। নিজে কত বড় হলে এতখানি ভিক্ষে দিতে পারে কখনো পারো ভাবতে? আমি তাঁর স্ত্রী। আমার সে ক্ষতি সয়েছে, এটুকু সইবে না?

রমণীবাবু উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া যে কথাটা মুখে আসিল তাহাই কহিলেন, তবে বললে তুমি রাগ করতে যাও কিসের জন্যে?

সবিতা বলিল, শুধু আজই ত বলোনি, প্রায়ই বলে থাকো। কথাটা কটু, তাই শুনলে হঠাৎ কানে লাগে, কিন্তু অন্তরটা তখনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলে ওঠে আমার এই ভালো যে, এ লোকটা আমার কেউ নয়, এর সঙ্গে আমার কোন সত্যিকার সম্বন্ধ নেই।

সারদা অবাক হইয়া মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু অশিক্ষিত রমণীবাবুর পক্ষে এ উক্তির গভীর তাৎপর্য বুঝা কঠিন, তিনি শুধু এইটুকু বুঝিলেন যে, ইহা অত্যন্ত বড় এবং অপমানকর। তাই সদম্ভে প্রশ্ন করিলেন, তবে তার কাছে ফিরে না গিয়ে আমার কাছেই পড়ে থাকো কিসের জন্যে?

সবিতা কি-একটা জবাব দিতে যাইতেছিল, কিন্তু সারদা হঠাৎ মুখে হাত চাপা দিয়া বন্ধ করিয়া দিল, কার সঙ্গে ঝগড়া করচেন মা, রাগের মাথায় সব ভুলে যাচ্ছেন?

সবিতা সেই হাতটা সরাইয়া দিয়া কহিল, না সারদা, আর আমি ঝগড়া করবো না। ওঁর যা মুখে আসে বলুন আমি চুপ করে রইলুম।

আচ্ছা, কাল এর সমুচিত ব্যবস্থা করবো, বলিয়া রমণীবাবু ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং মিনিট-দুই পরে সদর রাস্তায় তাঁহার মোটরের শব্দে বুঝা গেল তিনি বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

সারদা সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, সমুচিত ব্যবস্থাটা কি মা?

জানিনে সারদা। ও-কথা অনেকবার শুনেচি, কিন্তু আজো মানে বুঝতে পারিনি।

কিন্তু মিছিমিছি কি অনর্থ বাধলো বলুন ত।

সবিতা মৌন হইয়া রহিল।

সারদা নিজেও ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, রাত হলো এবার আমি যাই মা।

যাও মা।

সেই মাত্র ভোর হইয়াছে, সারদার ঘরের দরজায় ঘা পড়িল। সে উঠিয়া দ্বার খুলিতেই সবিতা প্রবেশ করিয়া বলিলেন, রাজু এলেই আমাকে খবর দিতে ভুলো না সারদা।

তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া সারদা শঙ্কিত হইল, বলিল, না মা, ভুলবো কেন, এলেই খবর দেবো।

সবিতা বলিলেন, দরোয়ান খবর নিয়েছে রাত্তিরে রাজু ঘরে ফেরেনি। কিন্তু যেখানেই থাক আজ তোমাকে নিয়ে যেতে সে আসবেই।

তাই ত বলেছিলেন।

আজই আসবে বলেছিল ত?

না, তা বলেন নি, শুধু বলেছিলেন মেয়েটির অসুখে তাঁকে সাহায্য করতে।

তুমি স্বীকার করেছিলে ত?

করেছিলুম বৈ কি।

কোনরকম আপত্তি করোনি ত মা?

না মা, কোন আপত্তি করিনি।

সবিতা বলিলেন, আমি এখন তবে যাই, তুমি ঘরের কাজকর্ম সারো, সে এলেই যেন জানতে পারি সারদা। এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

ঘরের কাজ সারদার সামান্যই, তাড়াতাড়ি সারিয়া ফেলিয়া সে প্রস্তুত হইয়া রহিল,— ডাকিতে আসিলে যেন বিলম্ব না হয়। তোরঙ্গ খুলিয়া যে দুই-একখানি ভালো কাপড়

ছিল তাহাও বাঁধিয়া রাখিল—সঙ্গে লইতে হইবে। অবিনাশবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে তাহার বেশী ভাব, তাহাকে গিয়া জানাইয়া রাখিল ঘরের চাবিটা সে রাখিয়া যাইবে, যেন সন্ধ্যায় প্রদীপ দেওয়া হয়। দূর-সম্পর্কের এক বোনের বড় অসুখ, তাহাকে শুশ্রূষা করিতে হইবে।

বেলা দশটা বাজে, সবিতা আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন,—রাজু আসেনি সারদা?

না মা।

তুমি হযত যেতে পারবে না এমন সন্দেহ তার ত হয়নি?

হওয়া ত উচিত নয় মা। আমি একটুও অনিচ্ছে দেখাই নি। তখনি রাজী হয়েছিলুম।

তবে আসচে না কেন? সকালেই ত আসার কথা। একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, দরোয়ানকে পাঠিযে দিই আর একবার দেখে আসুক সে বাসায় ফিরেচে কি না। বলিয়া চলিয়া গেলেন।

কাল হইতে সারদা নিরন্তর চিন্তা করিয়াছে কে এই পীড়িত মেয়েটি। তাহার কৌতূহলের সীমা নাই, তবুও এই নিরতিশয় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত রমণীকে প্রশ্ন করিয়া সে নিঃসংশয় হইতে পারে নাই। কাল রাখালকে জিজ্ঞাসা করিলেই হয়ত উত্তর মিলিত, কিন্তু তখন এ প্রয়োজন তাহার ছিল না, মনেও পড়ে নাই।

এমনি করিয়া সকাল গেল, দুপুর গেল, বিকাল পার হইয়া রাত্রি ফিরিয়া আসিল, কিন্তু রাখালের দেখা নাই। আরও পরে সে যে আসিতে পারে এ আশাও যখন গেল তখন সবিতা আসিয়া সারদার বিছানায় শুইয়া পড়িলেন, একটা কথাও বলিলেন না। কেবল চোখ দিয়া অবিরল জল পড়িতে লাগিল। সারদা মুছাইয়া দিতে গেলে তিনি হাতটা তাহার সরাইয়া দিলেন।

ঝি আসিয়া খবর দিল বিমলবাবু আসিয়াছেন দেখা করিতে।

সবিতা কহিলেন, তাঁকে বলো গে বাবু বাড়ি নেই।

ঝি কহিল, তিনি নিজেই জানেন। বললেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন বাবুর সঙ্গে নয়।

সবিতার চক্ষে বিরক্তি ও ক্রোধ প্রকাশ পাইল, কিন্তু কি ভাবিয়া ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া উঠিয়া গেলেন। পথে ঝি বলিল, মা ঘরে গিয়ে কাপড়খানা ছেড়ে ফেলুন, একটু ময়লা দেখাচ্চে।

আজ এদিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না, দাসীর কথায় হুঁশ হইল, পরিধেয় বস্ত্রটা সত্যই দেখা করিবার মতো নয়।

মিনিট দশ-পনেরো পরে যখন বসিবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন তখন ত্রুটি ধরিবার কিছু নাই, সবুজ রঙের অনুজ্জ্বল আলোকে মুখের শুষ্কতাও ঢাকা পড়িল।

বিমলবাবু দাঁড়াইয়া উঠিয়া নমস্কার করিলেন, বলিলেন, হয়ত ব্যস্ত করলুম, কিন্তু কাল বড় অসুস্থ দেখে গিয়েছিলুম, আজ না এসে পারলুম না।

সবিতা কহিল, আমি ভাল আছি। আপনার কানপুরে যাওয়া হয়নি?

না। এখান থেকে গিয়ে শুনতে পেলুম আমার জ্যাঠামশাই বড় পীড়িত, তাই—

নিজের জ্যাঠামশাই বুঝি?

না, নিজের ঠিক নয়,—বাবার খুড়তুতো ভাই—কিন্তু—

এক বাড়িতে আপনাদের সব একান্নবর্তী পরিবার বুঝি?

না, তা নয়। আগে তাই ছিল বটে, কিন্তু—

এখান থেকে গিয়েই হঠাৎ তাঁর অসুখের খবর পেলেন বুঝি?

না, ঠিক হঠাৎ নয়—ভুগচেন অনেকদিন থেকে, তবে—

তা হলে কালকেও হযত যেতে পারবেন না—খুব ক্ষতি হবে ত?

বিমলবাবু বলিলেন, ক্ষতি একটু হতে পারে, কিন্তু মানুষ কি কেবল ব্যবসার লাভ-লোকসান খতিয়েই জীবন কাটাবে? রমণীবাবু নিজেও ত একজন ব্যবসায়ী, কিন্তু কারবারের বাইরে কি কিছু করেন না?

সবিতা বলিল, করেন, কিন্তু না করলেই তাঁর ছিল ভালো!

বিমলবাবু হাসিয়া বলিলেন, কালকের রাগ আপনার আজও পড়েনি। রমণীবাবু আসবেন কখন?

সবিতা কহিল, জানিনে, না আসাই সম্ভব।

না আসাই সম্ভব? কখন গেলেন আজ?

আজকে নয়, কাল রাত্তিরে আপনাদের যাবার পরেই চলে গেছেন।

বিমলবাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, আশা করি আর বেশী রাগারাগি করে যাননি। কাল তিনি সামান্য একটু অপ্রকৃতিস্থ ছিলেন বলেই বোধ করি ও-রকম অকারণ জোর-জবরদস্তি করেছিলেন, আজ নিশ্চয়ই নিজের অন্যায় টের পেয়েছেন।

সবিতার কাছে কোন জবাব না পাইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, কাল আমার অপরাধও কম হয়নি। সিঙ্গাপুরে যেতে অস্বীকার করার পরেও আপনাকে বারংবার অনুরোধ করা আমার ভারী অনুচিত হয়েচে। নইলে এ-সব কিছুই ঘটতো না। তারই ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে আজ আমার আসা। কাল বড় অসুস্থ ছিলেন, আজ বাস্তবিক সুস্থ হয়েছেন, না একজনের 'পরে রাগ করে আর একজনকে শাস্তি দিচ্ছেন, বলুন ত সত্যি করে?

উত্তর দিতে গিয়া দুজনার চোখাচোখি হইল, সবিতা চোখ নামাইয়া বলিল, আমি ভালই আছি। না থাকলেই বা আপনি তার কি উপায় করবেন বিমলবাবু?

বিমলবাবু বলিলেন, উপায় করা ত শক্ত নয়, শক্ত হচ্চে অনুমতি পাওয়া। সেইটি পেতে চাই।

না, সে আপনি পাবেন না।

না পাই, অন্ততঃ রমণীবাবুকে ফোন করে জানাবার হুকুম দিন। আপনি নিজে ত জানাবেন না।

না, জানাবো না। কিন্তু আপনিই বা জানাতে এত ব্যস্ত কেন বলুন?

বিমলবাবু কয়েক-মুহূর্ত স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তারপরে ধীরে ধীরে কহিলেন, কালকের চেয়ে আজ আপনি যে ঢের বেশী অসুস্থ তা ঘরে পা দেওয়া মাত্রই চোখে দেখতে পেয়েচি চেষ্টা করেও লুকোতে পারেন নি। তাই ব্যস্ত।

উত্তর দিতে সবিতারও ক্ষণকাল বিলম্ব হইল, তার পরে কহিল, নিজের চোখকে অত নির্ভুল ভাবতে নেই বিমলবাবু, ভারী ঠকতে হয়।

বিমলবাবু কহিলেন, হয় না তা বলিনে, কিন্তু পরের চোখই কি নির্ভুল? সংসারে ঠকার ব্যাপার যখন আছেই তখন নিজের চোখের জন্যেই ঠকা ভালো। এতে তবু একটা সান্ত্বনা পাওয়া যায়।

সবিতার হাসিবার মতো মানসিক অবস্থা নয়—হাসির কথাও নয়,—অনিশ্চিত, অজ্ঞাত আতঙ্কে মন বিপর্যস্ত, তথাপি পরমাশ্চর্য এই যে, মুখে তাঁহার হাসি আসিয়া পড়িল। এ হাসি মানুষের সচরাচর চোখে পড়ে না,—যখন পড়ে রক্তে নেশা লাগে। বিমলবাবু কথা ভুলিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন,—ইহার ভাষা স্বতন্ত্র—পরিপূর্ণ মদিরাপাত্র তৃষ্ণার্ত মদ্যপের চোখের দৃষ্টির সহজতা যেন এক মুহূর্তে বিকৃত করিয়া দিল এবং সে চাহনির নিগূঢ় অর্থ নারীর চক্ষে গোপন রহিল না। সবিতার অনতিকাল পূর্বের সন্দেহ ও সম্ভাবিত ধারণা এইবার নিঃসংশয় প্রত্যয়ে সর্বাঙ্গ ভরিয়া যেন লজ্জার কালি ঢালিয়া দিল। তাহার মনে পড়িল এই লোকটা জানে সে স্ত্রী নয়, সে গণিকা। তাই অপমানে ভিতরটা যতই জ্বালা করিয়া উঠুক, কড়া গলায় প্রতিবাদ করিয়া ইহারই সম্মুখে মর্যাদাহানির অভিনয় করিতেও তাহার প্রবৃত্তি হইল না। বিগত রাত্রির ঘটনা স্মরণ হইল। তখন অপমানের প্রত্যুত্তরে সেও অপমান কম করে নাই, কিন্তু এই লোকটি অমার্জিত-রুচি অল্প-শিক্ষিত রমণীবাবু নয়—উভয়ের বিস্তর প্রভেদ—এ হয়ত অপমানের পরিবর্তে একটা কথাও বলিবে না, হয়ত শুধু অবজ্ঞার চাপা হাসি ওষ্ঠাধরে লইয়া বিনয়-নম্র নমস্কারে ক্ষমা-ভিক্ষা চাহিয়া নিঃশব্দে প্রস্থান করিবে।

মিনিট দুই-তিন নীরবে কাটিল, বিমলবাবু বলিলেন, কৈ জবাব দিলেন না আমার

সবিতা মুখ তুলিয়া কহিল, কি জিজ্ঞেসা করেছিলেন আমার মনে নেই।

এমনি অন্যমনস্ক আজ?

কিন্তু ইহারও উত্তর না পাইয়া বলিলেন, আমি বলছিলাম, আপনি সত্যিই ভালো নেই। কি হয়েছে জানতে পাইনে?

না।

আমাকে না বলুন ডাক্তারকে ত স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন।

না, তাও পারিনে।

এ কিন্তু আপনার বড় অন্যায়। কারণ, যে দোষী সে পাচ্ছে না দণ্ড, পাচ্ছে যে মানুষ সম্পূর্ণ নির্দোষ।

এ অভিযোগেরও উত্তর আসিল না। বিমলবাবু বলিতে লাগিলেন, কাল যা দেখে গেছি, আজ তার চেয়ে আপনি ঢের বেশী খারাপ। হয়ত আবার জবাব দেবেন আমার দেখার ভুল হয়েছে, হয়ত বলবেন নিজের চোখকে অবিশ্বাস করতে কিন্তু একটা কথা আজ বলবো আপনাকে। গ্রহ-চক্র শিশুকাল থেকে অনেক ঘুরিয়েছে আমাকে, এই দুটো চোখ দিয়ে অনেক কিছুই সংসারের দেখতে হয়েছে,—বিশেষ ভুল তাদের হয়নি—হলে মাঝ-নদীতেই অদৃষ্ট-তরী ডুব মারতো, কূলে এসে ভিড়তো না। আমার সেই দুটো চোখ আজ হলফ করে জানাচ্চে আপনি ভালো নেই—তবু কিছুই করতে পারবো না—মুখ বুজে চলে যাবো এ যে সহ্য করা কঠিন।

আবার দুজনের চোখে-চোখে মিলিল, কিন্তু এবার সবিতা দৃষ্টি আনত করিল না, শুধু চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। সম্মুখে তেমনি নীরবে বসিয়া বিমলবাবু। তাঁহার লালসা-দীপ্ত চোখে উদ্বেগের সীমা নাই—নিষেধ মানিতে চাহে না—ডাক্তার ডাকিতে ছুটিতে চায়। আর সেখানে? অর্থ নাই, লোক নাই, অজানা কোন্ একটা গৃহের মধ্যে পড়িয়া সন্তান তাঁহার রোগশয্যায়। তাহার নিরুপায় মাতৃ-হৃদয় গভীর অন্তরে হাহাকার করিয়া উঠিল—শুধু অব্যক্ত বেদনায় নয়, লজ্জায় ও দুঃসহ অনুশোচনায়। কিছুতেই আর সে বসিয়া থাকিতে পারিল না, উদ্গত অশ্রু কোনমতে সংবরণ করিয়া দ্রুত উঠিয়া পড়িল, কহিল, আর আমাকে কষ্ট দেবেন না বিমলবাবু, আমার কিছুই চাইনে, আমি ভাল আছি। বলিয়াই একটা নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। বিমলবাবু বিস্ময়াপন্ন হইলেন, কিন্তু রাগ করিলেন না, বুঝিলেন ইহা কঠিন মান-অভিমানের ব্যাপার—দু'দিন সময় লাগিবে।

পরদিন বেলা যখন দশটা, অনেক দূরে গাড়ি রাখিয়া দরোয়ানের পিছনে পিছনে সবিতা সতেরো নম্বর বাটীর দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। ফটিকের মা বাহিরে যাইতেছিল, থমকিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে আপনি?

তুমি কে মা?

আমি ফটিকের মা। এ-বাড়ির অনেকদিনের ঝি।

কোথায় যাচ্চো ফটিকের মা?

দাসী হাতের বাটিটা দেখাইয়া কহিল, দোকানে তেল আনতে। কর্তার পা লেগে হঠাৎ সব তেলটুকু পড়ে গেলো, তাই যাচ্চি আবার আনতে।

বামুন আসেনি বুঝি?

না মা, এখনো আসেনি। শুনেচি নাকি কাল আসবে। আজো কর্তাই রাঁধচেন।

রাজু বাড়ি নেই বুঝি?

তাঁকে চেনেন? না মা, তিনি বাড়ি নেই, ছেলে পড়াতে গেছেন। এলেন বলে।

আর রেণু কেমন আছে ফটিকের মা?

তেমনি, কি জানি কেন জ্বরটা ছাড়চে না মা, সকলের বড় ভাবনা হয়েছে।

কে দেখছে?

আমাদের বিনোদ ডাক্তার। এখনি আসবেন তিনি। আপনি কে মা?

আমি এ'দের গাঁয়ের বৌ ফটিকের মা, খুব দূর-সম্পর্কের আত্মীয়। কলকাতায় থাকি, শুনতে পেলুম রেণুর অসুখ, তাই খবর নিতে এলুম। কর্তা আমাকে জানেন।

তাঁকে খবর দিয়ে আসবো কি?

না, দরকার নেই ফটিকের মা, আমি নিজেই যাচ্ছি ওপরে। তুমি তেল নিয়ে এসো গে।

দরোয়ান দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে কহিল. তুমি মোড়ে গিয়ে দাঁড়াও গে মহাদেব. আমাব সময় হলে তোমাকে ডেকে পাঠাবো, গাড়িটা যেন সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকে।

বহুৎ আচ্ছা মাইজী, বলিয়া মহাদেব চলিয়া গেল।

সবিতা উপরে উঠিয়া বারান্দার যে দিকটায় কর্তা রান্নার ব্যাপারে ব্যতিব্যস্ত সেখানে গিয়া দাঁড়াইল। পায়ের শব্দ কর্তার কানে গেল. কিন্তু ফিরিয়া দেখিবার ফুরসত নাই, কহিলেন, তেল আনলে? জলটা ফুটে উঠেচে ফটিকের মা, আলু-পটোল একসঙ্গে চড়াবো. না পটোলটা আগে সেদ্ধ করে নেবো?

সবিতা কহিলেন, একসঙ্গেই দাও মেজকর্তা. যা হোক একটা হবেই।

ব্রজবাবু ফিরিয়া চাহিয়া কহিলেন, নতুন-বৌ! কখন এলে? বসো। না না, মাটিতে না --মাটিতে না, বড় ধুলো। আমি আসন দিচ্চি, বলিয়া হাতের পাত্রটা তাড়াতাড়ি নামাইয়া রাখিতেছিলেন, সবিতা হাত বাড়াইয়া বাধা দিল,—করচো কি? তুমি হাতে করে আসন দিলে আমি বসবো কি করে?

তা বটে। কিন্তু এখন আর দোষ নেই—দিই না ও-ঘর থেকে একটা এনে?

না।

সবিতা সেইখানে মাটিতে বসিয়া পড়িয়া বলিল, দোষ সেদিনও ছিল. আজও আছে, মরণের পরেও থাকবে মেজকর্তা। কিন্তু সে-কথা আজ থাক। বামুন কি পাওয়া যাচ্চে না?

পাওয়া অনেক যায় নতুন-বৌ, কিন্তু গলায় একটা পৈতে থাকলেই ত হাতে খাওয়া যায় না। রাখাল কাল একজনকে ধরে এনেছিল. কিন্তু বিশ্বাস করতে পারলাম না। আবার কাল একজনকে ধরে আনবে বলে গেছে।

কিন্তু এ লোকটাও যে তোমার জেরায় টিকবে না মেজকর্তা।

ব্রজবাবু হাসিলেন, কহিলেন, আশ্চর্য নয়, অন্ততঃ সেই ভয়ই করি। কিন্তু উপায় কি!

সবিতা কহিল, আমি যদি কাউকে ধরে এনে বলি রাখতে—রাখবে মেজকর্তা?

ব্রজবাবু বলিলেন, নিশ্চয় রাখবো।

জেরা করবে না?

ব্রজবাবু আবার হাসিলেন. বলিলেন, না গো না, করবো না। এটুকু জানি. তোমার জেরায় পাস করে তবে সে আসবে। সে আরও কঠিন। যে যাই করুক, তুমি যে বুড়ো-বামুনের জাত মারবে না তাতে সন্দেহ নেই।

আমি বুঝি ঠকাতে পারিনে?

না, পারো না। মানুষকে ঠকানো তোমার স্বভাব নয়।

সবিতার দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিতেই সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইল পাছে ঝরিয়া পড়িলে ব্রজবাবু দেখিতে পান।

রাখাল আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার দুই হাতে দুটা পুঁটুলি, একটায় তরি-তরকারি. অন্যটায় সাগু বার্লি মিছরি ফল-মূল প্রভৃতি রোগীর পথ্য। নতুন-মাকে দেখিয়া প্রথমে সে আশ্চর্য হইল, তার পরে হাতের বোঝা নামাইয়া রাখিয়া পায়ের ধুলো লইয়া প্রণাম করিল। ব্রজবাবুকে কহিল, আজ বড্ড বেলা হয়ে গেল কাকাবাবু, এবার আপনি ঠাকুরঘরে যান, উদ্যোগ-আয়োজন করে নিন, আমি নেয়ে এসে বাকী রান্নাটুকু সেরে ফেলি। এই বলিয়া সে একমুহূর্ত রান্নার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, কড়ায় ওটা কি ফুটছে?

ব্রজবাবু বলিলেন, আলু-পটোলের ঝোল।

আর?

আর? আর ভাতটা হবে বৈ ত নয় রাজু।

এতগুলো লোকে কি শুধু ঐ দিয়ে খেতে পারে কাকাবাবু? জল কৈ, কুটনো বাটনা কোথায়, রান্নার কিছুই ত চোখে দেখিনে। বারান্দায় ঝাঁট পর্যন্ত পড়েনি—ধুলো জমে রয়েচে. এত বেলা পর্যন্ত আপনারা করছিলেন কি? ফটিকের মা গেল কোথায়?

ব্রজবাবু অপ্রতিভভাবে কহিলেন, হঠাৎ পা লেগে তেলটা পড়ে গেল কিনা—সে গেছে দোকানে কিনতে—এলো বলে।

মধু?

মধু পেটের ব্যথায় সকাল থেকে পড়ে আছে, উঠতে পর্যন্ত পারেনি। রুগীর কাজ—সংসারের কাজ—একা ফটিকের মা-

খুব ভালো, বলিয়া রাখাল মুখ গম্ভীর করিল। তাহার দৃষ্টি পড়িল এক কড়া ঘোলের প্রতি, জিজ্ঞাসা করিল এত ঘোল কিনলে কে?

ব্রজবাবু বলিলেন, ঘোল নয়, ছানার জল। ভাল কাটলো না কেন বলো ত? রেণু খেতেই চাইলে না।

শুনিয়া রাখাল জ্বলিয়া গেল, কহিল, বুদ্ধির কাজ করেছে যে খায়নি। সংসারের ভার তাহার 'পরে, রাত্রি জাগিয়া অর্থ-চিন্তা করিয়া, ছুটাছুটি, পরিশ্রম করিয়া সে অত্যন্ত ক্লান্ত, মেজাজ রুক্ষ হইয়া পড়িয়াছে, রাগ করিয়া কহিল, আপনার কাজই এমনি। এটুকু তৈরি করেও যে রুগীকে খাওয়াবেন তাও পারেন না।

সবিতার সম্মুখে নিজের অপটুতার জন্য তিরস্কৃত হইয়া ব্রজবাবু এমন কুণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন যে মুখ দেখিলে দয়া হয়। কোন কৈফিয়ত তাঁহার মুখে আসিল না; কিন্তু সে দেখিবার রাখালের সময় নাই, কহিল, যান আপনি ঠাকুরঘরে, যা করবার আমিই করচি।

ব্রজবাবু লজ্জিত-মুখে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ঠাকুরঘরের কোন কাজই এখন পর্যন্ত হয় নাই—সমস্ত তাঁহাকেই করিতে হইবে। আর একবার স্নানের জন্য নীচে যাইতেছিলেন সবিতা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, কহিলেন, আজ কিন্তু পুজো-আহ্নিক তাড়াতাড়ি সেরে নিতে হবে মেজকর্তা, দেরি করলে চলবে না।

কেন?

কেনর উত্তর সবিতা দিল না, মুখ ফিরাইয়া রাখালকে বলিলেন, তোমার কাকাবাবুর জন্যে আগে একটুখানি মিছরি ভিজিয়ে দাও ত রাজু—কাল গেছে ওঁর একাদশী—এখন পর্যন্ত জলস্পর্শ করেন নি!

রাখাল ও ব্রজবাবু উভয়েই সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিল; ব্রজবাবু বলিলেন, এ কথাও তোমার মনে আছে নতুন-বৌ? আশ্চর্য!

সবিতা কহিল, আশ্চর্যই ত! কিন্তু দেরি করতে পারবে না বলে দিচ্ছি। নইলে গোবিন্দর দোরগোড়ায় গিয়ে এমনি হাঙ্গামা শুরু করবো যে ঠাকুরের মন্ত্র পর্যন্ত তুমি ভুলে যাবে। যাও, শান্ত হয়ে পুজো করো গে, কোন ভাবনা আর তোমাকে ভাবতে হবে না।

ফটিকের মা তেল লইয়া হাজির হইল। রাখাল স্টোভ জ্বালিয়া বার্লি চড়াইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আর দুধ নেই ফটিকের মা?

না বাবু, কর্তা সবটা নষ্ট করে ফেলেছেন।

তা হলে উপায় কি হবে? রেণু খাবে কি?

নতুন-মা এবার একটু হাসিলেন, বলিলেন, দুধ না-ই থাকলো বাবা, তাতে ভয় পাবার আছে কি? এ-বেলাটা বার্লিতেই চলে যাবে। কিন্তু তুমি নিজে যেন কর্তার মতো বার্লিটাও নষ্ট করে ফেলো না।

না মা, আমি অতো বেহিসেবী নয়। আমার হাতে কিছু নষ্ট হয় না।

শুনিয়া নতুন-মা আবার একটু হাসিলেন, কিছু বলিলেন না। খানিক পরে সেখান হইতে উঠিয়া তিনি নীচে নামিয়া আসিলেন। উঠানের একধারে কল-ঘর, জলের শব্দেই চেনা গেল, খুঁজিতে হইল না। কবাট ভেজানো ছিল, ঠেলিতেই খুলিয়া গেল। ভিতরে ব্রজবাবু স্নান করিতেছিলেন, শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, সবিতা ভিতরে ঢুকিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া কহিল, মেজকর্তা, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

বেশ ত, বেশ ত, চলো বাইরে যাই—

সবিতা কহিল, না, বাইরে বাইরের লোকে দেখতে পাবে। এখানে একলা তোমার কাছে আমার লজ্জা নেই।

ব্রজবাবু জড়সড়োভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, কি কথা নতুন-বৌ?

সবিতা কহিল, আমি এ বাড়ি থেকে যদি না যাই তুমি কি করতে পারো আমার?

ব্রজবাবু তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া হতবুদ্ধি হইয়া বলিলেন, তার মানে?

সবিতা বলিল, যদি না যাই তোমার সম্মুখে আমার গায়ে হাত দিতে কেউ পারবে না, পুলিশ ডেকে আমাকে ধরিয়ে দিতে তুমি পারবে না, পরের কাছে নালিশ জানানোও অসম্ভব, না গেলে কি করতে পারো আমার?

ব্রজবাবু ভয়ে কাষ্ঠহাসি হাসিয়া কহিলেন, কি যে ঠাট্টা করো নতুন-বৌ তার মাথামুণ্ড নেই। নাও সরো, দোর খোলো—দেরি হয়ে যাচ্চে।

সবিতা উত্তর দিল, আমি ঠাট্টা করিনি মেজকর্তা সত্যিই বলচি, কিছুতে দোর খুলবো না যতক্ষণ না জবাব দেবে।

ব্রজবাবু অধিকতর ভীত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, ঠাট্টা না হয়তো এ তোমার পাগলামি। পাগলামির কি কোন জবাব আছে?

জবাব না থাকে ত থাকো পাগলের সঙ্গে একঘরে বন্ধ। দোর খুলবো না।

লোকে বলবে কি?

তাদের যা ইচ্ছে বলুক।

ব্রজবাবু কহিলেন, ভালো বিপদ! জোর করে থাকার কথা কেউ শুনেচে কখনো দুনিয়ায়? তা হলে ত আইন-কানুন বিচার-আচার থাকে না, জোর করে যার যা খুশি তাই করতে পারে সংসারে?

সবিতা কহিল, পারেই ত। তুমি কি করবে বলো না?

এখানে থাকবে, নিজের বাড়িতেও যাবে না?

না। নিজের বাড়ি আমার এই, যেখানে স্বামী আছে, সন্তান আছে। এতদিন পরের বাড়িতে ছিলুম, আর সেখানে যাবো না।

এখানে থাকবে কোথায়?

নীচে এতগুলো ঘর পড়ে আছে তার একটাতে থাকবো। লোকের কাছে দাসী বলে আমার পরিচয় দিও তোমার মিথ্যে বলাও হবে না।

তুমি ক্ষেপেছো নতুন-বৌ, এ কখনো পারি?

এ পারবে না, কিন্তু ঢের বেশী শক্ত কাজ আমাকে দূর করা। সে পারবে কি করে? আমি কিছুতে যাবো না মেজকর্তা, তোমাকে নিশ্চয় বলে দিলুম।

পাগল! পাগল!

পাগল কিসে? জোর করছি বলে? তোমার ওপর করবো না ত সংসারে জোর করবো কার ওপর? আর জোরের পরীক্ষাই যদি হয় আমার সঙ্গে তুমি পারবে না।

কেন পারবো না?

কি করে পারবে? তোমার ত আর টাকাকড়ি নেই--গরীব হয়েছো--মামলা করবে কি দিয়ে?

ব্রজবাবু হাসিয়া ফেলিলেন। সবিতা জানু পাতিয়া তাঁহার দুই পায়ের উপর মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া রহিল। আজ তিন দিন হইল সে সর্ববিষয়েই উদাসীন, বিভ্রান্তচিত্ত অনির্দেশ্য শূন্য-পথে অনুক্ষণ ক্ষ্যাপার মতো ঘুরিয়া মরিতেছে, নিজের প্রতি লক্ষ্য করিবার মুহূর্ত সময় পায় নাই। তাহার অসংহত রুক্ষ কেশরাশি বর্ষার দিগন্ত প্রসারিত মেঘের মতো স্বামীর পা ঢাকিয়া চারিদিকে ভিজা মাটির 'পরে নিমেষে ছড়াইয়া পড়িল। হেঁট হইয়া সেইদিকে চাহিয়া ব্রজবাবু হঠাৎ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, তোমার মেয়ের জন্যই ত ভাবনা নতুন-বৌ। আচ্ছা, দেখি যদি—

বক্তব্য শেষ করিতে সবিতা দিল না, মুখ তুলিয়া চাহিল। দু চোখ জলে ভাসিতেছে কহিল, না মেজকর্তা, মেয়ের জন্যে আর আমি ভাবিনে। তাকে দেখবার লোক আছে, কিন্তু তুমি? এই ভার মাথায় দিয়ে একদিন আমাকে এ-সংসারে তুমি এনেছিলে—

সহসা বাধা পড়িল, তাহার কথাও সম্পূর্ণ হইতে পাইল না, বাহিরে ডাক পড়িল, রাখালবাবু?

রাখাল উপর হইতে সাড়া দিল, আসুন ডাক্তারবাবু।

সবিতা দাঁড়াইয়া উঠিয়া ঘরের দ্বার খুলিয়া একদিকে সরিয়া দাঁড়াইল। ব্রজবাবু বাহির হইয়া গেলেন।

আট

ঠাকুরঘরের ভিতরে ব্রজবাবু এবং বাহিরে মুক্ত দ্বারের অনতিদূরে বসিয়া সবিতা অপলক-চক্ষে চাহিয়া স্বামীর কাজগুলি নিরীক্ষণ করিতেছিল। একদিন এই ঠাকুরের সকল দায়িত্ব ছিল তাহার নিজের, সে না করিলে স্বামীর পছন্দ হইত না। তখন সময়াভাবে অন্যান্য বহু সাংসারিক কর্তব্য তাহাকে উপেক্ষা করিতে হইত। তাই পিসশাশুড়ী নানা ছলে তাহার নানা ত্রুটি ধরিয়া নিজের গোপন বিদ্বেষের উপশম খুঁজিতেন, আশ্রিত ননদেরা বাঁকা কথায় মনের ক্ষোভ মিটাইত, বলিত, তাহারা কি বামুনের ঘরের মেয়ে নয়? দেব-দেবতার কাজকর্ম কি জানে না? পূজা-অর্চনা, ঠাকুর-দেবতা কি নতুন-বৌয়ের বাপের বাড়ির একচেটে যে সে-ই শুধু শিখে এসেছে? এ-সকল কথার জবাব সবিতা কোনদিন দিত না। কখনো বাধ্য হইয়া এ-ঘরের কাজ যদি অপরকে করিতে দিতে হইত, সারাদিন তাহার মন-কেমন করিতে থাকিত, চুপি চুপি আসিয়া ঠাকুরের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাহিয়া বলিত গোবিন্দ, অযত্ন হচ্চে বাবা জানি, কিন্তু উপায় যে নেই।

সেদিন নিরবচ্ছিন্ন শুচিতা ও নিচ্ছিদ্র অনুষ্ঠানে কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিই না তাহার ছিল। আর আজ? সেই গোপাল-মূর্তি তেমনি প্রশান্ত-মুখে আজও চাহিয়া আছেন, অভিমানের কোন চিহ্ন ও-দুটি চোখে নাই।

এই পরিবারে এতবড় যে প্রলয় ঘটিল, ভাঙ্গা-গড়ায় এই গৃহে যুগান্ত বহিয়া গেল, এতবড় পরিবর্তন ঠাকুর কি জানিতেও পারেন নাই! একেবারে নির্বিকার উদাসীন? তাহার অভাবের দাগ কি কোথাও পড়িল না, তাহার এতদিনের এত সেবা শুষ্ক জলরেখার ন্যায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল!

বিবাহের পরেই তাহার গুরু-মন্ত্রের দীক্ষা হয়, পরিজনগণ আপত্তি করিয়া বলিয়াছিল, এত ছোট বয়সে ওটা হওয়া উচিত নয়, কারণ অবহেলায় অপরাধ স্পর্শিতে পারে। ব্রজবাবু কান দেন নাই, বলিয়াছিলেন, বয়সে ছোট হলেও ও-ই বাড়ির গৃহিণী, আমার গোবিন্দর ভার নেবে বলেই ওকে ঘরে আনা, নইলে প্রয়োজন ছিল না। সে প্রয়োজন শেষ হয় নাই, ইষ্ট-মন্ত্রও সে ভুলে নাই, তথাপি সবই ঘুচিয়াছে; সেই গোবিন্দর ঘরে প্রবেশের অধিকারও আর তাহার নাই, দূরে, বাহিরে বসিতে হইয়াছে।

ডাক্তার বিদায় করিয়া রাখাল হাসিমুখে লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল, বলিল, মায়ের আশীর্বাদের চেয়ে ওষুধ আছে নতুন-মা? বাড়িতে পা দিয়েছেন দেখেই জানি আর ভয় নেই, রেণু সেরে গেছে।

নতুন-মা চাহিয়া রহিলেন, ব্রজবাবু দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, রাখাল কহিল, জ্বর নেই, একদম নরম্যাল! বিনোদবাবু নিজেই ভারী খুশী, বলিলেন, ও-বেলায় যদি বা একটু হয়, কাল আর জ্বর হবে না। আর ভাবনা নেই, দিন-দুয়ের মধ্যেই সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়ে উঠবে। নতুন-মা, এ শুধু আপনার আশীর্বাদের ফল, নইলে এমন হয় না। আজ রাত্তিরে নিশ্চিন্ত হয়ে একটু ঘুমোনো যাবে, কাকাবাবু, বাঁচা গেল।

খবরটা সত্যিই অভাবিত। রেণুর পীড়া সহজ নহে, ক্রমশঃ বক্রগতি লইতেছে এই ছিল আতঙ্ক। মরণ-বাঁচনের কঠিন পথে দীর্ঘকাল অনিশ্চিত সংগ্রাম করিয়া চলিবার জন্যই সকলে যখন প্রস্তুত হইতেছিলেন তখন আসিল এই আশার অতীত সুসংবাদ। সবিতা গলায় আঁচল দিয়া বহুক্ষণ মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া বসিলেন, চোখ মুছিয়া কহিলেন, রাজু, চিরজীবী হও বাবা,—সুখে থাকো।

রাখালের আনন্দ ধরে না, মাথা হইতে গুরুভার নামিয়া গেছে, বলিল, মা, আগেকার দিনে রাজা-রানীরা গলার হার খুলে পুরস্কার দিতেন।

শুনিয়া সবিতা হাসিলেন, বলিলেন, হার তো তোমার গলায় মানাবে না বাবা, যদি বেঁচে থাকি বৌমা এলে তাঁর গলাতেই পরিয়ে দেবো।

রাখাল বলিল, এ-জন্মে সে গলা ত খুঁজে পাওয়া যাবে না মা, মাঝে থেকে আমিই বঞ্চিত হলুম। জানেন ত, আমার অদৃষ্টে মুখের অন্ন ধুলোয় পড়ে—ভোগে আসে না।

সবিতা বুঝিলেন, সে সে-দিনের তাঁহার গৃহে নিমন্ত্রণের ব্যাপারটাই ইঙ্গিত করিল।

রাখাল বলিতে লাগিল, রেণু সেরে উঠুক, হার না পাই মিষ্টি-মুখ করবার দাবী কিন্তু ছাড়বো না। কিন্তু সেও অন্যদিনের কথা, আজ চলুন একবার রান্নাঘরের দিকে। এ ক'দিন শুধু ভাত খেয়ে আমাদের দিন কেটেছে কেউ গ্রাহ্য করিনি, আজ কিন্তু তাতে চলবে না, ভালো করে খাওয়া চাই। আসুন তার ব্যবস্থা করে দেবেন।

চলো বাবা যাই, বলিয়া সবিতা উঠিয়া গেলেন। সেখানে দূরে বসিয়া রাখালকে দিয়া তিনি সমস্তই করিলেন এবং যথাসময়ে সকলের ভালো করিয়াই আজ আহারাদি সমাধা হইল। সবাই জানিত সবিতা এখনো কিছুই খান নাই, কিন্তু খাবার প্রস্তাব কেহ মুখে আনিতেও ভরসা করিল না; কেবল ফটিকের মা নূতন লোক বলিয়া এবং না-জানার জন্যই কথাটা একবার বলিতে গিয়াছিল, কিন্তু রাখাল চোখের ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া দিল।

সকলের মুখেই আজ একটা নিরুদ্বেগ হাসি-খুশী ভাব, যেন হঠাৎ কোন যাদুমন্ত্রে এ-বাটীর উপরে হইতে ভূতের উৎপাত ঘুচিয়া গেছে। রেণুর জ্বর নাই, সে আরামে ঘুমাইতেছে, মেঝেয় একটা মাদুর পাতিয়া ক্লান্ত রাখাল চোখ বুজিয়াছে, মধুর সাড়াশব্দ নাই, সম্ভবতঃ তাহার পেটের ব্যথা থামিয়াছে, নীচে হইতে খনখন ঝনঝন আওয়াজ আসিতেছে, বোধ হয় ফটিকের মা উচ্ছিষ্ট বাসনগুলো আজ বেলাবেলি মাজিয়া লইতেছে। সবিতা আসিয়া কর্তার ঘরের দ্বার ঠেলিয়া চৌকাঠের কাছে বসিল,—ওগো, জেগে আছো?

ব্রজবাবু জাগিয়াই ছিলেন, বিছানায় উঠিয়া বসিলেন।

সবিতা কহিল, কৈ আমার জবাব দিলে না।

ব্রজবাবু বলিলেন, তোমাকে রাখাল তখন ডেকে নিয়ে গেল, জবাবটা জেনে নেবার সময় পেলাম না।

কার কাছে জেনে নেবে—আমার কাছে?

ব্রজবাবু বলিলেন, আশ্চর্য হচ্চো কেন নতুন-বৌ, চিরদিন এই ব্যবস্থাই ত হয়ে এসেছে। সেদিনও ত রাখালের ঘরে অনেকদিনের মুলতুবি সমস্যার সমাধান করে নিলুম তোমার কাছে। খোঁজ নিলে শুনতে পাবে তার একটারও অন্যথা হয়নি।

সবিতা নতমুখে বসিয়া আছে দেখিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, প্রশ্ন যেদিক থেকেই আসুক, জবাব দিয়ে এসেছো তুমি—আমি নয়। তার পরে হঠাৎ একদিন, আমার লক্ষ্মী-সরস্বতী, দুই-ই করলে অন্তর্ধান, বুদ্ধির থলিটি গেল আমার হারিয়ে, তখন থেকে জবাব দেবার ভার পড়লো আমার নিজের 'পরে, দিয়েও এসেছি, কিন্তু তার দুর্গতি যে কি সে ত স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্চো নতুন-বৌ।

সবিতা মুখ তুলিয়া কহিল, কিন্তু এ যে আমার নিজের প্রশ্ন, মেজকর্তা।

ব্রজবাবু বলিলেন, কিন্তু প্রশ্ন ত সহজ নয়। এর মধ্যে আছে সংসার, সমাজ, পরিবার, আছে সামাজিক রীতিনীতি, আছে লৌকিক-পারলৌকিক ধর্ম-সংস্কার, আছে তোমার মেয়ের কল্যাণ-অকল্যাণ, মান-মর্যাদা, তার জীবনের সুখ-দুঃখ। এতবড় ভয়ানক জিজ্ঞাসার জবাব তুমি নিজে ছাড়া কে দেবে বলো ত? আমার বুদ্ধিতে কুলুবে কেন? তুমি বললে, যদি তুমি না যাও, যদি জোর করে এখানে থাকো, কি আমি করতে পারি। কি করা উচিত আমি ত জানিনে নতুন-বৌ, তুমিই বলে দাও।

সবিতা নিরুত্তরে বসিয়া বহুক্ষণ পর্যন্ত কত-কি ভাবিতে লাগিল, তার পরে জিজ্ঞাসা করিল, মেজকর্তা, তোমার কারবার কি সত্যিই সমস্ত নষ্ট হয়ে গেছে?

হাঁ, সত্যিই সমস্ত নষ্ট হয়ে গেছে।

আমি টাকাটা বার করে না নিলে কি হতো?

তাতেও বাঁচতো না—শুধু ডুবতে হয়তো বছরখানেক দেরি ঘটতো।

তোমার হাতে টাকাকড়ি এখন কি আছে?

কিছুই না। আমার সেই হীরের আংটিটা বিক্রি করে পাঁচ শ টাকা পেয়েচি, তাতেই চলচে।

কোন্ আংটিটা? আমার ব্রত উদযাপনের দক্ষিণে বলে আমি নিজে কিনে যেটা তোমার হাতে পরিয়ে দিয়েছিলুম—সেইটে? তুমি তাকে বিক্রি করেছো?

সে ছাড়া আমার আর কিছু ছিল না, তা তো জানো নতুন-বৌ।

সবিতা আবার কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া কহিল, যে দুটো তালুক ছিল সেও কি গেছে?

ব্রজবাবু বলিলেন, যায় নি, কিন্তু যাবে। বাঁধা পড়েছে, উদ্ধার করতে পারবো না।

কয়েক মুহূর্ত নীরবে কাটিলে সবিতা প্রশ্ন করিল, তোমার এ-পক্ষের স্ত্রীর কি রইলো?

ব্রজবাবু বলিলেন, তাঁর নামে পটলডাঙগায় দুখানা বাড়ি খরিদ করা হয়েছিল তা আছে। আর আছে গয়না, আছে পঁচিশ-ত্রিশ হাজার টাকার কাগজ। তাঁর এবং তাঁর মেয়ের চলে যাবে, কষ্ট হবে না।

রেণুর কি আছে মেজকর্তা?

কিছু না। সামান্য খানকয়েক গহনা ছিল, তাও বোধ হয় ভুল করে তাঁরা নিয়ে চলে গেছেন।

শুনিয়া রেণুর মা অধোমুখে স্তব্ধ হইয়া রহিল।

ব্রজবাবু বলিলেন, ভাবচি, রেণু ভালো হলে আমরা দেশে চলে যাবো। সেখানে শুধু দয়া করে মেয়েটিকে কেউ যদি নেয় ওর বিয়ে দেবো, তার পরেও যদি বেঁচে থাকি, গোবিন্দর সেবা করে পাড়াগাঁয়ে কোনরকমে বাকী দিন কটা আমার কেটে যাবে—এই ভরসা।

কিন্তু সবিতার কাছে কোন উত্তর না পাইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, একটা মুশকিল হয়েছে রেণুকে নিয়ে তাকে রাজী করাতে পারিনি। তাকে তুমি জানো না, কিন্তু সে হয়েছে তোমার মতোই অভিমানী, সহজে কিছু বলে না কিন্তু যখন বলে তার আর অন্যথা করানো যায় না। যেদিন এই বাসাটায় চলে এলাম, সেদিন রেণু বললে, চলো বাবা আমরা দেশে চলে যাই। কিন্তু আমার বিয়ে দেবার তুমি চেষ্টা কোরো না, আমার বাবাকে একলা ফেলে রেখে আমি কোথাও যেতে পারবো না। বললাম, আমি ত বুড়ো হয়েছি মা, ক'টা দিনই বা বাঁচবো, কিন্তু তখন তোর কি হবে বল দিকি? ও বললে, বাবা, তুমি ত আমার অদৃষ্ট বদলাতে পারবে না। ছেলেবেলায় মা যাকে ফেলে দিয়ে যায়, যার বিয়ের দিনে অজানা-বাধায় সমস্ত ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, বাপের রাজ-সম্পদ যাব ভোজবাজীর মতো বাতাসে উড়ে যায়, তাকে সুখ-ভোগের জন্যে ভগবান সংসারে পাঠান না, তার দুঃখের জীবন দুঃখেই শেষ হয়। এই আমার কপালের লেখা বাবা, আমার জন্যে ভেবে ভেবে আর তুমি কষ্ট পেয়ো না। বলিতে বলিতে সহসা গলাটা তাঁহার ভারী হইয়া আসিল, কিন্তু সামলাইয়া লইয়া কহিলেন, রেণু কথাগুলো বললে বিরক্ত হয়েও নয়, দুঃখের ধাক্কায় ব্যাকুল হয়েও নয়। ও জানে ওর ভাগ্যে এ-সব ঘটবেই। ওর মুখের উপর বিষাদের কালো ছায়া নেই, বললেও খুব সহজে—কিন্তু যা মুখে এলো তাই বলা নয়, খুব ভেবেচিন্তেই বলা। তাই ভয় হয়, এ থেকে হয়তো ওকে সহজে টলানো যাবে না। তবু ভাবি নতুন-বৌ, এ দুর্ভাগ্যেও এই আমার মস্ত সান্ত্বনা যে, রেণু আমার শোক করতে বসেনি, আমাকে মনে মনেও একবারো সে তিরস্কার করেনি।

স্বামীর প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া সবিতার দুই চোখে জল ভরিয়া আসিল, কহিল, মেজ-কর্তা, বেঁচে থেকে সমস্তই চোখে দেখবো, কানে শুনবো, কিন্তু কিছুই করতে পাবো না?

ব্রজবাবু বলিলেন, কি করতে চাও নতুন-বৌ, রেণু তো কিছুতেই তোমার সাহায্য নেবে না! আর আমি—

সবিতার জিহ্বা শাসন মানিল না, অকস্মাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, রেণু কি জানে আমি আজও বেঁচে আছি মেজকর্তা?

কথা কয়টি সামান্যই, কিন্তু প্রশ্নটি যে তাঁহার কতদিকে কতভাবে তাঁহার রাত্রির স্বপ্ন, দিনের কল্পনা ছাইয়া আছে, এ সংবাদ সে ছাড়া আর কে জানে? পাংশু-মুখে চাহিয়া উত্তরের জন্য তাহার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। ব্রজবাবু চুপ করিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, হাঁ সে জানে।

জানে আমি বেঁচে আছি?

জানে। সে জানে তুমি কলকাতায় আছ—সে জানে তুমি অগাধ ঐশ্বর্যে সুখে আছো!

সবিতা মনে মনে বলিল, ধরণী দ্বিধা হও।

ব্রজবাবু কহিতে লাগিলেন, সে তোমার সাহায্য নেবে না, আর আমি—গোবিন্দর শেষের

ডাক আমি কানে শুনতে পেয়েচি নতুন-বৌ, আমার গোনা-দিন ফুরিয়ে এলো, তবু যদি আমাকে কিছু দিয়ে তুমি তৃপ্তি পাও আমি নেবো। প্রয়োজন আছে বলে নয়—আমার ধর্মের অনুশাসন—আমার ঠাকুরের আদেশ বলে নেবো। তোমার দান হাত পেতে নিয়ে আমি পুরুষের শেষ অভিমান নিঃশেষ করে দিয়ে তৃণের চেয়েও হীন হযে সংসার থেকে বিদায় হবো। তখন যদি তাঁর শ্রীচরণে স্থান পাই।

সবিতা স্বামীর মুখের দিকে চাহিতে পারিল না, কিন্তু স্পষ্ট বুঝিল তাঁহার চোখ দিয়া দু'ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। সেইখানে স্তব্ধ নতমুখে বসিয়া তাঁহার সকালের কথাগুলা মনে হইতে লাগিল। মনে পড়িল, তখন স্বামীর স্নানের ঘরে ঢুকিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া সে তাঁহাকে জোর করিয়া বলিয়াছিল, যদি না যাই কি করতে পারো আমার? পায়ে মাথা রাখিয়া বলিয়াছিল, এই ত আমার গৃহ, এখানে আছে আমার কন্যা, আছে আমার স্বামী। আমাকে বিদায় করে সাধ্য কার?

কিন্তু এখন বুঝিল কথাগুলো তাহার কত অর্থহীন, কত অসম্ভব। কত হাস্যকর তাহার জোর করার দাবী, তাহার ভিত্তিহীন শূন্যগর্ভ আস্ফালন। আজ এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া এক কুলত্যাগিনী নারী ও অপর প্রান্তে দাঁড়াইয়া তাহার স্বামী, তাহার পীড়িত সন্তানই শুধু নয়, মাঝখানে আছে সংসার, আছে ধর্ম, আছে নীতি, আছে সমাজ-বন্ধনের অসংখ্য বিধিবিধান। কেবলমাত্র অশ্রুজলে ধুইয়া, স্বামীর পায়ে মাথা কুটিয়া এতবড় গুরুভার টলাইবে সে কি করিয়া? আর কথা কহিল না, স্বামীর উদ্দেশে আর একবার নীরবে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

রাখালের ঘুম ভাঙিয়াছে, সে আসিয়া কহিল, আমি বলি বুঝি নতুন-মা চলে গেছেন।

না বাবা, এইবার যাবো। রেণু কেমন আছে?

ভালো আছে মা, এখনো ঘুমোচ্চে।

মেজকর্তা, আমি যাই এখন?

এসো।

রাখাল কহিল, মা, চলুন আপনাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসি। কাল আবার আসবেন তো?

আসবো বৈ কি বাবা। এই বলিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন, পিছনে চলিল রাখাল।

পথে আসিতে গাড়ির মধ্যে বসিয়া সবিতা আজিকার সমস্ত কথা, সমস্ত ঘটনা মনে মনে আলোচনা করিতেছিল। তাহার তের বৎসর পূর্বেকার জীবন যা-কিছুর সঙ্গে গাঁথা ছিল, আজ আবার তাহাদের মাঝখানেই তাহার দিন কাটিল। স্বামী, কন্যা, রাখাল-রাজ এবং কুলদেবতা গোবিন্দ-জীউ। গৃহত্যাগের পরে হইতে অনুক্ষণ আত্মগোপন করিয়াই তাহার এতকাল কাটিয়াছে, কখনো তীর্থে বাহির হয় নাই, কোন দেব-মন্দিরে প্রবেশ করে নাই, কখনো গঙ্গাস্নানে যায় নাই—কত পর্বদিন, কত শুভক্ষণ, কত স্নানের যোগ বহিয়া গেছে—সাহস করিয়া কোনদিন পথের বারান্দায় পর্যন্ত দাঁড়ায় নাই পাছে পরিচিত কাহারো সে চোখে পড়ে। সেদিন রাখালের ঘরের মধ্যে অকস্মাৎ একটুখানি আবরণ উঠিয়াছে,—আজ সকলের কাছেই তাহার ভয় ভাঙ্গিল, লজ্জা ঘুচিল। রেণু এখনো শুনে নাই, কিন্তু শুনিতে তাহার বাকী থাকিবে না। তখন সেও হয়তো এমনি নীরবেই ক্ষমা করিবে। তাহার 'পরে কাহারো রাগ নাই, অভিমান নাই; ব্যথা দিতে এতটুকু কটাক্ষ পর্যন্ত কেহ করে নাই। দুঃখের দিনে সে যে দয়া করিয়া তাহাদের খোঁজ লইতে আসিয়াছে ইহাতেই সকলে কৃতজ্ঞ। ব্যস্ত হইয়া ব্রজবাবু স্বহস্তে দিতে আসিয়াছিলেন তাহাকে বসিবার আসন—যেন অতিথির পরিচর্যায় কোথাও না ত্রুটি হয়। অর্থাৎ পরিপূর্ণ বিচ্ছেদের আর বাকী কিছু নাই, চলিয়া আসিবার কালে সবিতা এই কথাটাই নিঃসংশয়ে জানিয়া আসিল।

রেণু জানে তাহার পিতা নিঃস্ব। সে জানে তাহার ভবিষ্যতের সকল সুখ-সৌভাগ্যের আশা নির্মূল হইয়াছে। কিন্তু এই লইয়া শোক করিতে বসে নাই, দুর্দশাকে সে অবিচলিত ধৈর্যে স্বীকার করিয়াছে। সঙ্কল্প করিয়াছে, ভালো হইয়া দরিদ্র পিতাকে সঙ্গে করিয়া সে

তাহাদের নিভৃত পল্লীগৃহে ফিরিয়া যাইবে- তাঁহার সেবা করিয়া সেইখানেই জীবন অতিবাহিত করিবে।

ব্রজবাবু বলিয়াছিলেন, বেণু জানে মা তাহার বাঁচিয়া আছে—মা তাহার অগাধ ঐশ্বর্যে সুখে আছে। স্বামীর এই কথাটা তাহার যতবার মনে পড়িল, ততবারই সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া লজ্জায় কণ্টকিত হইয়া উঠিল। ইহা মিথ্যা নয়, -কিন্তু ইহাই কি সত্য? মেয়েকে সে দেখে নাই, রাখালের মুখে আভাসে তাহার রূপের বিবরণ শুনিয়াছে,—শুনিয়াছে সে নাকি তাহার মায়েব মতোই দেখিতে। নিজের মুখ মনে করিয়া সে-ছবি আঁকিবার চেষ্টা করিল, স্পষ্ট তেমন হইল না, তবুও বোগ-তপ্ত তাহাব আপন মুখই যেন তাহার মানসপটে বাববার ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

পাড়াগাঁযের দুঃখ-দুর্দশার কত সম্ভব-অসম্ভব মূর্তিই যে তাহাব কল্পনায আসিতে যাইতে লাগিল তাহাব সংখ্যা নাই,—এবং সমস্তই যেন সেই একটিমাত্র পান্ডুর, রুগ্ন মুখ-খানিকেই সর্বদিকে ঘিরিয়া। সংসারে নিরাসক্ত দরিদ্র পিতা ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন, কিছুই তাঁহার চোখে পড়ে না, -সেইখানে রেণু একেবারে একা। দুর্দিনে সান্ত্বনা দিবার বন্ধু নাই, বিপদে ভরসা দিবার আত্মীয় নাই সেখানে দিনের পবে দিন তাহাব কেমন কবিয়া কাটিবে? যদি কখনো এমনি অসুখে পড়ে- তখন? হঠাৎ যদি বৃদ্ধ পিতার পরলোকের ডাক আসে সেদিন? কিন্তু উপায় নাই- উপায নাই! তাহার মনে হইতে লাগিল পিঞ্জরে বদ্ধ কবিযা তাহারি চোখের উপর যেন সন্তানকে তাহাব কাহারা হত্যা করিতেছে।

সবিতাব চৈতন্য হইল যখন গাড়ি আসিযা তাহার দবজায দাঁড়াইল। উপবে উঠিতে ঝি আসিয়া চুপি চুপি বলিল মা, বাবু বড় রাগ কবেছেন।

কখন এলেন তিনি?

অনেকক্ষণ। বড় ঘরে বসে বিমলবাবুর সঙ্গে কথা কইচেন।

তিনি কখন এলেন?

একটু আগে। এখন হঠাৎ সে ঘরে গিয়ে কাজ নেই মা, রাগটা একটু পড়ুক।

সবিতা ভ্রূকুটি করিল, কহিল, তুমি নিজের কাজ করো গে।

সে স্নান করিয়া কাপড় ছাড়িযা বসিবার ঘরে আসিয়া যখন দাঁড়াইল তখন সন্ধ্যার আলো জ্বালা হইয়াছে, বিমলবাবু দাঁড়াইয়া উঠিয়া নমস্কার কবিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন আছেন আজ?

ভালো আছি। বসুন।

তিনি বসিলে সবিতা নিজেও গিয়া একটা চৌকিতে উপবেশন করিল। বিমলবাবু বলিলেন, শুনলুম আপনি দুপুরের পূর্বেই বেরিয়েছিলেন—আজ আপনার খাওয়া পর্যন্ত হয়নি।

সবিতা কহিল, না তার সময পাইনি।

রমণীবাবু মুখ মেঘাচ্ছন্ন করিয়া বসিয়াছিলেন কহিলেন, কোথায যাওয়া হয়েছিল আজ?

সবিতা কহিল, আমার কাজ ছিল।

কাজ সমস্ত দিন?

নইলে সমস্ত দিন থাকতে যাবো কেন? আগেই ত ফিবতে পারতুম।

রমণীবাবু ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, শুনতে পাই আজকাল প্রায়ই তুমি বাড়ি থাকো না—কাজটা কি ছিল একটু শুনতে পাইনে?

সবিতা কহিল, না, সে তোমার শোনবার নয়। বিমলবাবু, আজও আপনার যাওয়া হলো না?

বিমলবাবু বলিলেন, না হলো না। জ্যাঠামশাই একটু না সারলে বোধ করি যেতে পারবো না।

কথাটা তাঁহার শেষ হইবামাত্র রমণীবাবু সরোষে বলিয়া উঠিলেন, আমাকে জিজ্ঞাসা করে কি তুমি বাইরে গিয়েছিলে?

সবিতা শান্তভাবে উত্তর দিল, তুমি ত তখন ছিলে না।

জবাবটা ক্রোধ উদ্রেক করিবার মতো নয়, কিন্তু তিনি রাগিয়াই ছিলেন, তাই হঠাৎ চেঁচাইয়া উঠিলেন—থাকি না-থাকি সে আমি বুঝবো, কিন্তু আমার হুকুম ছাড়া তুমি এক-পা বার হবে না আজ স্পষ্ট করে বলে দিলুম। শুনতে পেলে?

শুনিতে সকলে পাইলেন; বিমলবাবু সঙ্কোচে ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, রমণীবাবু আজ আমি উঠি—কাজ আছে।

না না আপনি বসুন। কিন্তু এই সব বেলাল্লাপনা আমি যে বরদাস্ত করিনে তাই শুধু ওকে জানিয়ে দিলুম।

সবিতা প্রশ্ন করিল, বেলাল্লাপনা তুমি কাকে বল?

বলি, তুমি যা করে বেড়াচ্চো তাকে। যখন তখন যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ানোকে।

কাজ থাকলেও যাবো না?

না। আমি যা বলবো সেই তোমার কাজ। অন্য কাজ নেই।

তাই ত এতকাল করে এসেচি সেজবাবু, কিন্তু এখন কি আমাকে তোমার অবিশ্বাস হয়?

অবিশ্বাস তাহার প্রতি কোনদিন হয় না, তবু ক্রোধের উপর রমণীবাবু বলিয়া বসিলেন, হয়, একশোবার হয়। তুমি সীতা না সাবিত্রী যে অবিশ্বাস হতে পারে না? একজনকে ঠকাতে পেরেচো, আমাকে পারো না।

বিমলবাবু লজ্জায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, ইঁহাদের কলহের মাঝখানে কথা বলাও চলে না, কিন্তু সবিতা স্থির হইয়া বহুক্ষণ পর্যন্ত নিঃশব্দে রমণীবাবুর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, তারপরে বলিল, সেজবাবু, তুমি জানো আমি মিছে কথা বলিনে। আমাদের সম্বন্ধ আজ থেকে শেষ হলো। আর তুমি আমার বাড়িতে এসো না।

কলহ-বিবাদ ইতিপূর্বেও হইয়াছে, কিন্তু সমস্তই এক-তরফা। হাঙ্গামা, চেঁচামেচির ভয়ে চিরদিনই সবিতা চুপ করিয়া গেছে, পাছে গোপন কথাটা কাহারো কানে যায়। সেই নতুন বৌয়ের মুখের এতবড় শক্ত কথায় রমণীবাবু ক্ষেপিয়া গেলেন বিশেষতঃ তৃতীয় ব্যক্তির সমক্ষে। মুখখানা বিকৃত করিয়া কহিলেন, কার বাড়ি এ? তোমার? বলতে একটু লজ্জা হলো না?

সবিতা তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া বহুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপরে আস্তে আস্তে বলিল, হাঁ, আমার লজ্জা হওয়া উচিত সেজবাবু, তুমি সত্যি কথাই বলেচো। না, এ-বাড়ি আমার নয়, তোমার—তুমিই দিয়েছিলে। কাল আমি আর কোথাও চলে যাবো, তখন সবই তোমার থাকবে। তেরো বৎসর পরে চলে যাবার দিনে তোমার একটা কপর্দকও আমি সঙ্গে নিয়ে যাবো না, সমস্ত তোমাকে ফিরিয়ে দিলুম।

এই কণ্ঠস্বরে রমণীবাবুর চমক ভাঙ্গিল, হতবুদ্ধি হইয়া বলিলেন, কাল চলে যাবে কি রকম?

হাঁ, আমি কালই চলে যাবো!

চলে যাবো বললেই যেতে দেবো তোমাকে?

আমাকে বাধা দেবার মিথ্যে চেষ্টা করো না সেজবাবু, আমাদের সমস্ত শেষ হয়ে গেছে। এ আর ফিরবে না।

এতক্ষণে রমণীবাবুর হুঁশ হইল যে ব্যাপারটা সত্যই ভয়ানক হইয়া উঠিল; ভয় পাইয়া কহিলেন, আমি কি সত্যিই বলেচি নতুন-বৌ এ-বাড়ি তোমার নয়, আমার? রাগের মাথায় কি একটা কথা বার হয়ে যায় না?

সবিতা কহিল, রাগের জন্য নয়। রাগ যখন পড়ে যাবে—হয়তো দেরি হবে—তখন বুঝবে এতবড় বাড়ি দান করার ক্ষতি তোমার সইবে না, চিরকাল কাঁটার মতো তোমার মনে এই কথাটাই ফুটবে যে, আমাদের দুজনের দেনা-পাওনায় একলা তুমিই ঠকেচো। দাঁড়িপাল্লায় একটা দিক যখন শূন্য দেখবে তখন অন্যদিকে বাটখারার ভার তোমার বুকে যাঁতার মতো চেপে বসবে—সে সহ্য করার শিক্ষা তোমার হয়নি। কিন্তু আর তর্ক করার জোর আমার নেই—আমি বড় ক্লান্ত। বিমলবাবু, আর বোধ করি দেখা হবার আমাদের অবকাশ হবে না আমি কালকেই চলে যাবো।

কোথায় যাবেন?

সে এখনো জানিনে।

কিন্তু যাবার আগে দেখা হবেই। আমি আবার আসবো।

সময় পান আসবেন। আজ কিন্তু আমি চললুম। এই বলিয়া সবিতা আজ উভয়কেই নমস্কার করিয়া উঠিয়া গেল।

বিমলবাবু বলিলেন, রমণীবাবু আমারও নমস্কার নিন—চললুম।

নয়

এতবড় কথাটা জানাজানি হইতে বাকী রহিল না, প্রভাত না হইতেই ভাড়াটেরা সবাই শুনিল কাল রাত্রে কর্তা ও গৃহিণীতে তুমুল কলহ হইয়া গেছে ও নতুন-মা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন কালই এ-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন। অন্য কেহ হইলে তাহারা শুধু মৃদু হাসিয়া স্বকার্যে মন দিত, কিন্তু ইঁহার সম্বন্ধে তাহা পারিল না। ঠিক যে বিশ্বাস করিতে পারিল তাহাও নয়, কিন্তু বিষয়টা এতই গুরুতর যে, সত্য হইলে ভাবনার সীমা নাই। শহরে এত অল্পমূল্যে এমন বাসস্থান যে কোথাও মিলিবে না, ভয় এই শুধু নয় তাহাদের কতদিনের ভাড়া বাকী পড়িয়া আছে এবং কতভাবেই না এই গৃহস্বামিনীর কাছে তাহারা ঋণী। অনেকে প্রায় ভুলিয়াই গেছে এ-গৃহ তাহাদের নিজের নয়। তাহারা সারদাকে ধরিয়া পড়িল এবং সে আসিয়া ম্লান-মুখে কহিল, এ কি কথা সবাই আজ বলা-বলি করচে মা?

কি কথা সারদা?

ওরা বলচে আজই এ-বাড়ি থেকে আপনি চলে যাবেন।

ওরা সত্যি কথাই বলেচে সারদা।

সত্যি কথা! সত্যিই চলে যাবেন আপনি?

সত্যিই চলে যাবো সারদা।

শুনিয়া সারদা স্তব্ধ হইয়া রহিল, তারপরে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কোথায় যাবেন?

নতুন-মা বলিলেন, সে এখনো স্থির করিনি, শুধু যেতে যে হবে এইটুকুই স্থির করেচি মা।

সারদার দুচক্ষু জলে ভরিয়া গেল, কহিল, ওরা কেউ বিশ্বাস করতে পারচে না মা, ভাবচে এ কেবল আপনার রাগের কথা—রাগ পড়লেই মিটে যাবে। আমিও ভাবতে পারিনে মা, বিনা-মেঘে আমাদের মাথায় এতবড় বজ্রাঘাত হবে—নিরাশ্রয়ে আমরা কে কোথায় ভেসে যাবো। তবু, ওরা যা জানে না আমি তা জানি। আমি বুঝতে পেরেচি মা, সম্প্রতি এ-বাড়ি আপনার কাছে এত তেতো হয়ে উঠেছে যে, সে আর সইছে না, কিন্তু যাবো বললেই ত যাওয়া হতে পারে না!

নতুন-মা বলিলেন, কেন পারে না সারদা? এ-বাড়ি আমার তেতো হয়ে উঠেছে সম্প্রতি নয়, বারো বছর আগে যেদিন প্রথম এখানে পা দিয়েছি। কিন্তু বারো বৎসর ভুল করেছি বলে আরো বারো বৎসর ভুল করতে হবে, এ আমি আর মানবো না—এ দুর্গতি থেকে মুক্ত হবোই।

সারদা কহিল, মা, আমার ত কেউ নেই, আমাকে কার কাছে ফেলে দিয়ে যাবেন?

নতুন-মা বলিলেন, যার স্বামী আছে তার সব আছে সারদা। তুমি কোন অন্যায়, কোন অপরাধ করোনি। অনুতপ্ত হয়ে জীবনকে একদিন ফিরতেই হবে। দুঃখের জ্বালায় হত-বুদ্ধি হয়ে সে যেখানেই পালিয়ে থাক আবার তোমার কাছে তাকে আসতে হবে; কিন্তু আমার সঙ্গে গেলে সে ত তোমাকে সহজে খুঁজে পাবে না মা।

সারদা নতমুখে কহিল, না মা, তিনি আর আসবেন না।

এমন কখনো হয় না সারদা,—সে আসবেই।

না মা, আসবেন না। কিন্তু আজকে নয়, আর একদিন আপনাকে তার কারণ জানাবো।

জানিবার জন্য সবিতা পীড়াপীড়ি করিলেন না, কিন্তু অতি-বিস্ময়ে চুপ করিয়া রহিলেন।

সারদা বলিতে লাগিল, যেখানেই যান আমি সঙ্গে যাবো। আপনি বড়ঘরের মেয়ে, বড়ঘরের বৌ—কোথাও একলা যাওয়া চলে না, সঙ্গে দাসী একজন চাই আমি আপনার সেই দাসী মা।

কি করে জানলে সারদা আমি বড়ঘরের মেয়ে, বড়ঘরের বৌ? কে তোমাকে বললে এ কথা?

সারদা কহিল, কেউ বলেনি; কিন্তু শুধু কি এ কথা আমিই জানি মা, জানে সবাই। এ কথা লেখা আছে আপনার চোখের তারায়, লেখা আছে আপনার সর্বাঙ্গে আপনি হেঁটে গেলে লোকে টের পায়। বাবু কি-একটু সন্দেহের আভাস দিয়েছিলেন, কি-একটু অপমানের কথা বলেছিলেন—এমন কত ঘরেই ত হয়—কিন্তু সে আপনার সহ্য হলো না, সমস্ত ত্যাগ করে চলে যেতে চাচ্চেন। বড়ঘরের মেয়ে ছাড়া কি এত অভিমান কারো থাকে মা?

ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া সে পুনশ্চ বলিতে লাগিল, ভেতরের কথা সবাই জানে। তবু যে কেউ কখনো মুখে আনতে পারে না, সে ভয়েও নয়, আপনার অনুগ্রহের লোভেও নয়। সে হলে এ ছলনা কোনদিন-না-কোনদিন প্রকাশ পেতো। আপনাকে আভাসেও যে কেউ অসম্মান করতে পারে না সে শুধু এইজন্যেই মা।

সবিতা সকৃতজ্ঞ-কণ্ঠে স্বীকার করিয়া বলিলেন, তোমরা সবাই যে আমাকে ভালোবাসো, সে আমি জানি।

সারদা কহিল কেবল ভালবাসাই নয়, আমরা আপনাকে বহু সম্মান করি। শুধু আপনি ভালো বলেই করিনে, আপনি বড় বলে করি। তাই জল্পনা করা দূরে থাক, ও-কথা মনে ভাবলেও আমরা লজ্জা পাই। সেই আমাদের বিসর্জন দিয়ে কেমন করে চলে যাবেন?

কিন্তু না গিয়েও যে উপায় নেই।

উপায় যদি না থাকে, আমাদেরও সঙ্গে না গিয়ে উপায় নেই। আর, আমি না থাকলে কাজ করবে কে মা?

সবিতা বলিলেন, কে করবে জানিনে, কিন্তু বড়-ঘর থেকেই যদি এসে থাকি সারদা তুমিও তেমন ঘর থেকে আসো নি যারা পরের কাজ করে বেড়ায়। তোমাকে দাসীর কাজ করতে আমিই বা দেবো কেন?

সারদা জবাব দিল, তা হলে দাসীর কাজ করবো না আমি করবো মায়ের সেবা। অপমানের লজ্জায় একলা গিয়ে পথে দাঁড়াবেন, তার দুঃখ যে কত সে আমি জানি। সে আমার সইবে না মা, সঙ্গে আমি যাবোই। বলিয়া আঁচলে চোখ মুছিয়া ফেলিল।

সে স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাহে না, কেবল ইঙ্গিতে বুঝাইতে চায় নিরাশ্রয়ের দুঃখ কত! সবিতার নিজেরও মনে পড়িল সেদিনের কথা যেদিন গভীর রাত্রে স্বামিগৃহ ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়াছিলেন। আজও সে দুঃখের তুলনা করিতে জগতের কোন দুঃখই খুঁজিয়া পান না। তাহার পরে সুদীর্ঘ বারো বৎসর কাটিল এই গৃহে। এই নরক-কুণ্ডেও বাঁচার প্রয়োজনে আবার তাঁহাকে ধীরে ধীরে অনেক-কিছুই সঞ্চয় করিতে হইয়াছে, সে-সকল সত্যই কি আজ ভার-বোঝা? সত্যই কি প্রয়োজন একেবারে ঘুচিয়াছে? আবার কি নিজেকে তিনি ফিরিয়া পাইয়াছেন? সারদার সতর্ক বাণী তাঁহাকে সচেতন করিল, সন্দেহ জাগিল নির্বিঘ্ন আশ্রয়-ত্যাগের নিদারুণ দুঃসাহস হয়তো আজ আর তাঁহার নাই। পুণ্যময় স্বামি-গৃহবাসের বহু স্মৃতি মানস-পটে ফুটিয়া উঠিল, ভয় হইল, সেদিনের সেই দেহ, সেই মন, সেই শান্ত পল্লী-ভবনের সরল সামান্য প্রয়োজন এই বিক্ষুব্ধ নগরীর অশুচি জীবনযাত্রার ঘূর্ণাবর্তে পাক খাইয়া কোথায় ডুবিয়াছে, কোন মতেই আর তাহাদের সন্ধান মিলিবে না। মনে মনে মানিতেই হইল সে নতুন-বৌ আর তিনি নাই, তাঁহার বয়স হইয়াছে, অভ্যাসের বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছে, এ-আশ্রয় যে দিয়াছে তাহার দেওয়া লাঞ্ছনা ও অপমান যত বড় হউক, সে আশ্রয় বিসর্জন দিয়া শূন্যহাতে পথে বাহির হওয়া আজ তাহার চেয়েও কঠিন; কিন্তু হঠাৎ মনে পড়িল, থাকাই বা যায় কিরূপে। এই লোকটার বিরুদ্ধে তাঁহার বিদ্বেষ

ও ঘৃণা অহরহ পুঞ্জিত হইয়া যে এতবড় পর্বতাকার হইয়াছে তাহা এতদিন নিজেও এমন করিয়া হিসাব করিয়া দেখেন নাই। মনে হইল সে আসিয়াছে, খাটে বসিয়া পান ও দোক্তায় একটা গাল আবের মত ফুলাইয়া বারংবার উচ্চারিত সেই সকল অত্যন্ত অরুচিকর সম্ভাষণ ও রসিকতায় তাহার মনোরঞ্জনের প্রযত্ন করিতেছে,—তাহার লালসালিপ্ত সেই ঘোলাটে চাহনি, তাহার একান্ত লজ্জাহীন অত্যুগ্র অধীরতা—এই কামার্ত অতি-প্রৌঢ় ব্যক্তির শয্যা পার্শ্বে গিয়া আবার তাঁহাকে রাত্রি যাপন করিতে হইবে মনে করিয়া ক্ষণকালের জন্য সবিতা যেন হতচেতন হইয়া রহিলেন।

মা?

সবিতা চকিত হইয়া সাড়া দিলেন, কেন সারদা?

সত্যি-সত্যিই আজ চলে যাবেন না ত?

আজ না হলেও একদিন তো যেতে হবে।

কেন যেতে হবে? এ-বাড়ি তো আপনার।

না, আমার নয়, রমণীবাবুর।

এতদিন এই নামটা তিনি মুখে আনিতেন না যেন সত্যই তাঁহার নিষিদ্ধ, আজ ছলনার মুখোশ খুলিয়া ফেলিলেন। সারদা লক্ষ্য করিল, কারণ হিন্দু-নারীর কানে ইহা বাজিবেই, এবং হেতুও বুঝিল। বলিল, আমরা তো সবাই জানি এ-বাড়ি তিনি আপনাকে দিয়েছিলেন, আর ত এতে তাঁর অধিকার নেই মা।

সবিতা বলিলেন, সে আমি জানিনে সারদা, সে আইন-আদালতের কথা। মৌখিক দানের কতটুকু স্বত্ব আমি জানিনে।

সারদা ভীত হইয়া বলিল, শুধু মৌখিক? লেখাপড়া হয়নি? এমন কাঁচা-কাজ কেন করেছিলেন মা?

সবিতা চুপ করিয়া রহিলেন, তাঁহার তৎক্ষণাৎ মনে পড়িল স্বামীর কাছে যে টাকা গচ্ছিত ছিল, সর্বস্বান্ত হইয়াও সুদে-আসলে সেদিন তাহা তিনি প্রত্যর্পণ করিয়াছেন।

সারদা কহিল, রমণীবাবুকে আসতে মানা করেছেন, এখন রাগের উপর যদি তিনি অস্বীকার করেন?

সবিতা অবিচলিত-কণ্ঠে বলিলেন, তিনি তাই করুন সারদা, আমি তাঁকে এতটুকু দোষ দেবো না। কেবল তাঁর কাছে আমার প্রার্থনা, রাগারাগি হাঁকাহাঁকি করতে আর যেন না তিনি আমার সুমুখে আসেন।

শুনিয়া সারদা নির্বাক হইয়া রহিল। অবশেষে শুষ্ক-মুখে কহিল, একটা কথা বলি মা আপনাকে। রমণীবাবুকে বিদায় দিলেন, থাকবার বাড়িটাও যেতে বসেছে, সত্যিই কি আপনার কোন ভাবনা হয় না? সেদিন যখন আমাকে ফেলে রেখে তিনি চলে গেলেন, একলা ঘরের মধ্যে আমি যেন ভয়ে পাগল হয়ে গেলুম। জ্ঞান ছিল না বলেই তো বিষ খেয়ে মরতে চেয়েছিলুম মা, নইলে এতবড় পাপের কাজে ত আমার সাহস হতো না, কিন্তু আপনাকে দেখি সম্পূর্ণ নির্ভয়,—কিছুই গ্রাহ্য করেন না—এমনি কি ক'রে সম্ভব হয় মা! বোধ হয় সম্ভব হয় শুধু আমাদের চেয়ে আপনি অনেক বড় বলেই।

সবিতা বলিলেন, বড় নই মা। কিন্তু তোমার আমার অবস্থা এক নয়। তুমি ছিলে সম্পূর্ণ নিঃস্ব, সম্পূর্ণ নিরুপায়, কিন্তু আমি তা নয়। সেদিন যে আমার অনেক টাকার সম্পত্তি কেনা হলো সে আমার আছে সারদা।

সারদা আশ্বস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তাতে তো কোন গোলযোগ ঘটবে না মা?

সবিতা সগর্বে বলিয়া উঠিলেন, সে যে আমার স্বামীর দান সারদা,—সে যে আমার নিজের টাকা। তাতে গোলযোগ ঘটায় সাধ্য কার?

বারো বৎসর সবিতা একাকী, আত্মীয়-স্বজনহীন বারোটা বৎসর কাটিয়াছে তাঁহার পরগৃহে। মনের কথা বলিবার একটি লোকও এতদিন ছিল না। টাকার বিবরণ দিতে গিয়া অকস্মাৎ এই মেয়েটির সম্মুখে তাঁহার এতকালের নিরুদ্ধ উৎস-মুখ খুলিয়া গেল। হঠাৎ কি করিয়া স্বামীর সাক্ষাৎ মিলিল, প্রায়ান্ধকার গৃহকোণে কেবলমাত্র ছায়া দেখিয়া কেমন করিয়া তাহাকে তিনি চিনিয়া ফেলিলেন, তখন কি করিয়া নিজেকে সে সংবরণ

করিল, তখন, কি তিনি বলিলেন, কি তিনি করিলেন এইসকল অনর্গল বকিতে বকিতে কিছুক্ষণের জন্য সবিতা যেন আপনাকে হারাইয়া ফেলিলেন।

সারদার বিস্ময়ের সীমা নাই—নতুন-মার এতখানি আত্ম-বিস্মরণ তাহার কল্পনার অগোচর।

নীচে হইতে ডাক আসিল—মাইজী!

সবিতা সচেতন হইয়া সাড়া দিলেন—কে মহাদেব?

দরোয়ান উপরে আসিয়া জানাইল তাঁহার আদেশ মত শোফার গাড়ি আনিয়াছে।

আধঘণ্টা পরে প্রস্তুত হইয়া নীচে নামিয়া দেখিলেন দ্বারের কাছে সারদা দাঁড়াইয়া, সে বলিল, মা, আমি আপনার সঙ্গে যাবো। সেখানে রাখাল-রাজবাবু আছেন, তিনি কখনো রাগ করবেন না।

কেহ সঙ্গে যায়, এ ইচ্ছা সবিতার ছিল না, বলিলেন, রাগ হয়তো কেউ করবে না, কিন্তু সেখানে গিয়ে তোমার কি হবে সারদা?

সারদা কহিল, আমি সব জানি মা। রেণু অসুস্থ, আমি তাকে একবার দেখে আসবো। তার চেয়েও বেশী সাধ হয়েছে আমার রেণুর বাপকে দেখার,—প্রণাম করে তাঁর পায়ের ধূলো নেবো। এই বলিয়া সে সম্মতির অপেক্ষা না করিয়াই গাড়িতে উঠিয়া বসিল।

পথে চলিতে সে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, রেণুর বাপ কি-রকম দেখতে মা?

সবিতা কৌতুক করিয়া বলিলেন, তোমার কি-রকম মনে হয় সারদা? জমকালো ধরনের মস্ত মানুষ—না?

সারদা বলিল, না মা, তা মনে হয় না। কিন্তু তখন থেকেই ত ভাবচি, কোন চেহারাই যেন পছন্দ হচ্ছে না।

কেন হচ্চে না সারদা?

হচ্চে না বোধ হয় এইজন্যে মা, তিনি ত কেবল রেণুর বাপ নয়, তিনি আপনারও স্বামী যে! মনে মনে কিছুতেই যেন দুজনকে একসঙ্গে মেলাতে পারচি নে।

সবিতা হাসিয়া বলিলেন, ধরো যদি এমন হয়—একজন বৃদ্ধ বৈষ্ণব—আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়—মাথায় শিখা, চুলগুলি প্রায় পেকে এসেছে, গৌর বর্ণ, দীর্ঘ দেহ, পূজায়, উপবাসে, আচারে, নিয়মে শীর্ণ এমন মানুষকে তোমার পছন্দ হয় সারদা?

না মা, হয় না। আপনার হয়?

না হয়ে উপায় কি সারদা? স্বামী পছন্দ-অপছন্দর জিনিস নয়, তাঁকে নির্বিচারে মেনে নিতে হয়। তুমি বলবে এ হোলো শাস্ত্রের বিধি, মানুষের মনের বিধি নয়। কিন্তু এ তর্ক কারা করে জানো মা, তারাই করে যারা সত্যি ক'রে আজও মানুষের মনের খবর পায়নি, যাদের দুর্গতির আগুন জেলে জীবনের পথ হাতড়ে বেড়াতে হয়নি। সংসার-যাত্রায় স্বামীর রূপ-যৌবনের প্রশ্নটা মেয়েদের তুচ্ছ কথা মা, দুদিনেই হিসেবের বাইরে পড়ে যায়।

সারদা অশিক্ষিত হইলেও এমন কথাটাকে ঠিক সত্য কথা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিল না, বুঝিল, এ তাঁর পরিতাপের গ্লানি, প্রতিক্রিয়ার অতল আলোড়িত হৃদয়ের ঐকান্তিক মার্জনা-ভিক্ষা। ইচ্ছা হইল না প্রতিবাদ করিয়া তাঁহার বেদনা বাড়ায়, কিন্তু চুপ করিয়াও থাকিতে পারিল না, বলিল, একটা কথা ভারী জানতে ইচ্ছে করে মা, কিন্তু—

সবিতা কহিলেন, কিন্তু কি মা? প্রশ্ন করে লজ্জা দিতে আর আমাকে চাও না—এই ত? আর লজ্জা বাড়বে না সারদা, তুমি স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞেসা কর।

তথাপি সারদার কুণ্ঠা ঘুচে না। সে চুপ করিয়া আছে দেখিয়া তিনি নিজেই বলিলেন হয়তো জানতে চাও এই যদি সত্যি তবে আমারই বা এতবড় দুর্গতি ঘটলো কেন? এর উত্তর অনেকদিন অনেকরকমে ভেবে দেখেচি, কিন্তু আমার গত-জীবনের কর্মফল ছাড়া এ প্রশ্নের আজও জবাব পাইনি মা।

যদিচ সারদা নিজেও কর্মফল মানে, তথাপি নতুন-মার এ উত্তরে তাহার মন সায় দিতে পারিল না, সে চুপ করিয়াই রহিল। সবিতা তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া ইহা বুঝিলেন বলিলেন, আর এক-জন্মের অজানা কর্মফলের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে এ-জন্মের ভাঙ্গা বেড়ার ফাঁক খুঁজে বেড়াচ্চি এতবড় অবুঝ আমি নই মা, কিন্তু এ গোলকধাঁধার বাইরের পথও

বা কে বার করেচে বলো ত? যে লোকটাকে কাল আমি বিদায় দিলুম, আমার স্বামীর চেয়ে তাকে কখনো বড় মনে করিনি, কখনো শ্রদ্ধা করিনি, কোনদিন ভালোবাসিনি, তবু তারই ঘরে আমার একটা যুগ কেটে গেল কি করে?

এবার সারদা কথা কহিল, সলজ্জে বলিল, আজ না হোক, কিন্তু সেদিনও কি রমণীবাবুকে আপনি ভালোবাসেন নি মা?

না মা, সেদিনও না—কোনদিনই না।

তবু পদস্খলন হোলো কেন?

সবিতা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া ম্লান হাসিয়া বলিলেন, পদস্খলনের কি কেন থাকে সারদা? ও ঘটে আচমকা সম্পূর্ণ অকারণ নিরর্থকতায়। এই বারো-তেরো বছরে কত মেয়েকেই তো দেখলুম, আজ হয়তো সর্বনাশের পাঁকের তলায় কোথায় তারা তলিয়ে গেছে, সেদিন কিন্তু আমার একটা কথারও তারা জবাব দিতে পারেনি, আমার পানে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে চেয়ে দু'চোখ জলে ভেসে গেছে—ভেবেই পাইনি আপন অদৃষ্ট ছাড়া আর কাকে তারা অভিশাপ দেবে। দেখে তিরস্কার করবো কি, নিজেরই মাথা চাপড়ে কেঁদে বলেচি, নিষ্ঠুর দেবতা! তোমার রহস্যময় সংসারে বিনা-দোষে দুঃখের পালা গাইবার ভার দিলে কি শেষে এই সব হতভাগীদের 'পরে! কেন হয় জানিনে সারদা, কিন্তু এমনিই হয়।

সারদা এবারেও সায় দিল না, মাথা নাড়িয়া বাঁধা-রাস্তার পাকা-সিদ্ধান্তের অনুসরণে বলিল, তাদের দোষ ছিল না এমন কথা আপনি কি করে বলচেন মা?

সবিতা উত্তর দিলেন না, আর তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন না, শুধু নিঃশ্বাস ফেলিয়া জানালার বাইরে শূন্য-চোখে পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

গাড়ি আসিয়া যথাস্থানে থামিল, মহাদেব দরজা খুলিয়া দিতে উভয়ে নামিয়া পড়িলেন, গাড়ি কালকের মত অপেক্ষা করিতে অন্যত্র চলিয়া গেল।

সতেরো নম্বর বাড়ির সদর দরজা খোলা ছিল, উভয়ে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন নীচে কেহ নাই, সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেই চোখে পড়িল একটি ষোলো-সতেরো বছরের মেয়ে বারান্দায় বসিয়া তরকারি কুটিতেছে, সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, আসুন। রেলিঙের উপরে আসন ছিল, পাতিয়া দিল এবং সবিতার পায়ের ধুলো লইয়া প্রণাম করিল।

সেই মেয়ে আজ এতবড় হইয়াছে। আসনে বসিয়া সবিতা কিছুতেই নিজেকে সামলাইতে পারিলেন না, উচ্ছ্বসিত অশ্রু-বাষ্পে সমস্ত দেহ বারংবার কাঁপিয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই দুই চক্ষু প্লাবিত করিয়া অনর্গল জল পড়িতে লাগিল। সবিতা বুঝিলেন ইহা লজ্জাকর, হয়তো এ-অশ্রুর কোন মর্যাদা এই মেয়েটির কাছে নাই, কিন্তু সংযমের বাঁধ ভাঙিয়া গেছে, কিছুতেই কিছু হইল না, শুধু জোর করিয়া দুই চোখের উপর আঁচল চাপিয়া মুখ লুকাইয়া বসিয়া রহিলেন।

দশ

সবিতা যতই চাহিলেন কান্না চাপিতে ততই গেল সে শাসনের বাহিরে। ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ আপ্রান্ত আলোড়িত সাগরজল কিছুতেই যেন শেষ হইতে চাহে না। মেয়েটি কিন্তু সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিল না, দুর্বল ক্লান্ত হাতে যেমন ধীরে ধীরে তরকারি কুটিতেছিল তেমনি নীরবে কাজ করিতে লাগিল। অবশেষে ক্রন্দনের উদ্দামতা যদিচ শান্ত হইয়া আসিল, কিন্তু মুখের আবরণ সবিতা কিছুতেই ঘুচাইতে পারেন না, সে যেন আঁটিয়া চাপিয়া রহিল। কিন্তু এমন করিয়া কতক্ষণ চলে, সকলের অস্বস্তিই ভিতরে ভিতরে দুঃসহ হইয়া উঠিতে থাকে তাই বোধ হয় সারদাই প্রথমে কথা কহিয়া উঠিল—বোধ হয় যা' মনে আসিল তাই—বলিল, আজ তুমি কেমন আছো দিদি?

ভাল আছি।

জ্বর আর হয়নি?

না, আমি তো টের পাইনি।

ডাক্তার এখনো আসেন নি?

না তিনি হয়ত ও-বেলা আসবেন।

সারদা একটু ভাবিয়া কহিল, কৈ, রাখালবাবুকে ত দেখচি নে? তিনি কি বাড়ি নেই?

না, তিনি পড়াতে গেছেন।

তোমার বাবা?

তিনি সকালে বেরিয়েচেন, বলে গেছেন ফিরতে দেরি হবে।

সারদার কথা শেষ হইয়া আসিল, এবার সে যে কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। শেষে অনেক সঙ্কোচের পরে জিজ্ঞাসা করিল, ইনি কে, তুমি চিনতে পেরেছো রেণু?

চিনবো কি করে, আমার তো মুখ মনে নেই।

বুঝতেও পারোনি?

রেণু মাথা নাড়িয়া বলিল, তা পেরেচি। রাজুদা বলে গেছেন। কিন্তু আপনি কে বুঝতে পারচি নে।

সারদা নিজের পরিচয় দিয়া কহিল, নাম আমার সারদা, তোমার মার কাছে থাকি। রাখালবাবু আমাকে জানেন—আমার কথা কি তিনি তোমার কাছে কখনও বলেন নি?

না। এ-সব কথা আমাকে তিনি বলবেন কেন, বলা ত উচিত নয়।

এইবার সারদার মুখ একেবারে বন্ধ হইল। তাহার বুদ্ধি-বিবেচনায় যতটা সম্ভব সে কথা চালাইয়াছে, আর অগ্রসর হইবার মতো সে খুঁজিয়া পাইল না। মিনিট-খানেক নীরবে কাটিলে রেণু উঠিয়া গেল, কিন্তু একটু পরেই একটি ঘটি হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল, মা, পা ধোয়ার জল এনেচি—উঠুন।

এই আহ্বানে সবিতা পাগলের মতো অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া মেয়েকে বুকে টানিয়া লইলেন, কিন্তু কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তার পরেই স্খলিত হইয়া তিনি সংজ্ঞা হারাইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন। মিনিট-কয়েক পরে জ্ঞান ফিরিলে দেখিলেন তাঁহার মাথা সারদার ক্রোড়ে এবং সুমুখে বসিয়া মেয়ে পাখা দিয়া বাতাস করিতেছে।

রেণু বলিল, মা, আহ্নিকের জায়গা করে রেখেচি, একবার উঠতে হবে যে।

শুনিয়া তাঁহার দুই চোখের কোণ দিয়া শুধু জল গড়াইয়া পড়িল।

রেণু পুনশ্চ কহিল, সারদাদিদি বলছিলেন আপনি চার-পাঁচদিন কিছু খাননি। একটু মিছরি ভিজিয়ে দিয়েচি মা, এইবার উঠে খেতে হবে। কিন্তু চুলগুলি সব ধুলোয়-জলে লুটোপটি করে একাকার হয়েছে, সে কিন্তু আমার দোষ নয় মা, সারদাদিদির। হ্যাঁ মা, আপনার চুলগুলি যেন কালো রেশম, কিন্তু, আমার এ রকম শক্ত হোলো কেন মা? ছেলে-বেলায় খুব কসে বুঝি মুড়িয়ে দিয়েছিলেন? পাড়াগাঁয়ের ঐ বড়ো দোষ।

সবিতা হাত বাড়াইয়া মেয়ের মাথায় হাত দিলেন, কয়দিনের জ্বরে তাহার এলোমেলো চুলগুলি রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া আঙুল দিয়া নাড়াচাড়া করিলেন, অনেকবার কথা বলিতে গিয়া গলায় বাধিল, শেষে মাথাটি বুকের উপর টানিয়া লইয়া তিনি অবিশ্রান্ত অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন, যে-কথা কণ্ঠে বাধিয়াছিল তাহা কণ্ঠেই চাপা রহিল। কথা বাহির না হউক, কিন্তু এই অনুচ্চারিত ভাষা বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না; মেয়ে বুঝিল, সারদা বুঝিল, আর বুঝিলেন তিনি সংসারে কিছুই যাঁহার অজানা নয়।

এইভাবে কিছুক্ষণ থাকিয়া সবিতা উঠিয়া বসিলেন। মেয়ে তাঁহাকে নীচে স্নানের ঘরে লইয়া গিয়া পুনরায় স্নান করাইয়া আনিল, জোর করিয়া আহ্নিকে বসাইয়া দিল এবং তাহা সমাপ্ত হইলে তেমনি জোর করিয়াই তাঁহাকে মিছরির সরবৎ পান করাইল।

রেণু কহিল, মা, এইবার যাই রাঁধি গে? আপনাকে কিন্তু খেতে হবে।

যদি না খাই?

রেণু মৃদু হাসিয়া বলিল, তা হলে আপনার পায়ে মাথা খুঁড়বো, না খেয়ে আপনি নিস্তার পাবেন না।

নিস্তার পেতে চাইনে মা, কিন্তু তুমি নিজে যে বড় দুর্বল, এখনো যে পথ্যিই করোনি।

রেণু বলিল, সকালে একটু মিছরি খেয়ে জল খেয়েচি, আজ আর কিছু খাবো না। একটু দুর্বল সত্যি, কিন্তু না রাঁধলেই বা চলবে কেন মা? রাজুদার আসতে দেরি হবে,

বাবাও ফিরবেন অনেক বেলায়, না রাঁধলে এতগুলি লোকে খেতে পাবে না যে। তা ছাড়া আমাকে ঠাকুরের ভোগ রাঁধতেও হবে। এই বলিয়া সে রেলিঙের উপর হইতে গামছাখানা কাঁধে ফেলিতেই সবিতা চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি নাইতে যাচ্চো রেণু?

রেণু হাসিয়া বলিল, মা, ভুলে গেছেন। আপনি কি কখনো না নেয়ে ভোগ রেঁধেছিলেন নাকি?

সবিতার মুখে এ কথার উত্তর আসিল না। সারদা বলিল, কিন্তু আবার জ্বর হতে পারে ত রেণু!

রেণু মাথা নাড়িয়া বলিল, না, বোধ হয় হবে না—আমি ভালো হয়ে গেছি। আর হলেই বা কি করবো সারদাদিদি, যতক্ষণ ভালো আছি করতে হবে ত? আমাদের করবার ত আর কেউ নেই।

উত্তর শুনিয়া উভয়েই নীরব হইয়া রহিলেন।

রান্না সামান্যই, কিন্তু সেটুকু সারিতেও যে রেণুর কতখানি ক্লেশ বোধ হইতেছিল তাহা অতিশয় স্পষ্ট। জ্বরে অবসন্ন, সাত-আটদিনের উপবাসে একান্ত দুর্বল। মেয়েটা মরিয়া মরিয়া চোখের সম্মুখে কাজ করিতে লাগিল, মা চুপ করিয়া বসিয়া দেখিলেন, কিন্তু কিছুই করিবার নাই। এ-জীবনে পারিবারিক বন্ধন যে এমন করিয়া ছিঁড়িয়াছে, ব্যবধান যে এত বৃহৎ, এমন প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করার অবকাশ বোধ করি সবিতার আর কিছুতে মিলিত না যেমন আজ মিলিল।

রান্না শেষ হইল, সারদাকে উদ্দেশ করিয়া রেণু কহিল, বাবার ফিরতে, পুজো আহ্নিক শেষ হতে আজ বেলা পড়ে যাবে, আপনি কেন মিথ্যে কষ্ট পাবেন সারদাদিদি, খেয়ে নিন। বাবা বলেন, এমনতরো অবস্থায় সংসারে একজন উপবাস করে থাকলেই আর দোষ হয় না। সত্যিই নয় মা? এই বলিয়া সে মায়ের দিকে চাহিয়া উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিল।

সবিতা জানেন তাঁহাদের বৃহৎ পরিবারে বাধ্য হইয়াই একদিন এ-নিয়ম প্রচলিত হইয়াছিল। ঠাকুরের পূজারী ব্রাহ্মণ নিযুক্ত থাকিলেও ব্রজবাবু সহজে এ-কাজ কাহারও প্রতি ছাড়িয়া দিতে চাহিতেন না; অথচ চিরদিন ঢিলা স্বভাবের লোক বলিয়া পূজায় তাঁহার প্রায়ই অযথা বিলম্ব ঘটিয়া যাইত। কিন্তু মেয়ের প্রশ্নের উত্তরে কি যে তাঁহার বলা উচিত তাহা ভাবিয়া পাইলেন না।

জবাব না পাইয়া রেণু বলিতে লাগিল, কিন্তু আমার নতুন-মার বেলা সইতো না, খেতে একটু দেরি হলেও তিনি ভয়ানক রেগে যেতেন। বাবা তাই আমাকে একদিন দুঃখ করে বলেছিলেন যে, দেশের বাড়িতে কতদিন যে আপনার এ-বেলা খাওয়া হতো না, উপোস করে কাটাতে হতো তার সংখ্যা নাই, কিন্তু কোনদিন রাগ করে বলেন নি ঠাকুর বিলিয়ে দিতে।

সারদা আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কি ঠাকুর বিলিয়ে দিতে বলেন নাকি?

হাঁ, কতদিন। বলেন গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আসতে।

তোমার বাবা কি বলেন?

সারদার প্রশ্নের উত্তর সে মাকেই দিল, বলিল, আমার বয়স তখন ন'বচ্ছর। বাবা ডেকে পাঠালেন, তাঁর ঘরে গিয়ে দেখি তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়চে। আমাকে কাছে বসিয়ে আদর করে বললেন, আমার গোবিন্দর সব ভার ছিল একদিন তোমার মায়ের উপর। আজ থেকে তুমিই তাঁর কাজ করবে—পারবে ত মা? বললুম, পারবো বাবা। তখন থেকে আমিই ঠাকুরের কাজ করি। পুজো না হওয়া পর্যন্ত আমিই বাড়িতে না খেয়ে থাকি; কিন্তু আজ থাকতুম না মা। জ্বরের ভয় না থাকলে আপনাকে বসিয়ে রেখে আমরা সবাই মিলে আজ খেয়ে নিতুম। এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল, ভাবিয়াও দেখিল না ইহা কতদূর অসম্ভব এবং কি মর্মান্তিক আঘাতই তাহার মাকে করিল।

সবিতা আর একদিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন, একটা কথারও উত্তর দিলেন না। মেয়ে যাহাই বলুক, মা জানেন এ গৃহের আর তিনি কেহ নহেন, পারিবারিক নিয়ম-পালনে আজ তাঁহার খাওয়া-না-খাওয়া সম্পূর্ণ অর্থহীন।

রেণু সারদাকে ঠাকুর দেখাইতে লইয়া গেল। সবিতা সেইখানেই চুপ করিয়া বসিয়া

রহিলেন। মেয়েটা কতটুকু যা বলিয়াছে! তাহার বিমাতার উত্ত্যক্ত-চিত্তের সামান্য একটু-খানি বিবরণ, ঠাকুর-দেবতায় হতশ্রদ্ধার তুচ্ছ একটা উদাহরণ। এই ত! এমন কত ঘরেই ত আছে। অভাবিতও নয়, হয়তো বিশেষ দোষেরও নয়, তথাপি এই সামান্য বস্তুটাই তাঁহার কল্পনায় বারো বছরের অজানা ইতিহাস চক্ষের পলকে দাগিয়া দিয়া গেল। এই স্ত্রীলোকটিই হয়তো তাহার স্বামীকে একটা মুহূর্তের জন্যও বুঝে নাই, তাহার কতদিনের কত মুখ-ভার, কত চাপা-কলহ, কত ছোট ছোট সংঘর্ষের কাঁটায় অনুবিদ্ধ শান্তিহীন দিন, কত বেদনা-বিক্ষত দুঃখময় স্মৃতি—এমনি করিয়াই এই স্নেহ-শ্রদ্ধা-হীনা, কোপনস্বভাবা নারীর একান্ত সান্নিধ্য ও শাসনে এই দুটি প্রাণীর—তাহার স্বামী ও কন্যার—দিনের পর দিন কাটিয়া আজ দুর্দশার শেষ সীমায় আসিয়া ঠেকিয়াছে।

অথচ, কিসের জন্য? এই প্রশ্নটাই এখন সবচেয়ে বড় করিয়া বিঁধিল সবিতাকে। যে-ভার ছিল স্বভাবতঃ তাহারি আপনার, সে-বোঝা যদি অপরে বহিতে না পারে, সে দোষ কি তাহাকে দিবার? তাহার নিজের ছাড়া অপরাধ কার? অধর্মের মার যে এমন নির্দয়, একাকী এত দুঃখও যে সংসারে সৃষ্টি করা যায়, তাহার মূর্তি যে এত কদাকার, ইতিপূর্বে এমন করিয়া আর সে উপলব্ধি করে নাই। গ্লানি ও ব্যথার গুরুভারে তাহার নিশ্বাস পর্যন্ত যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল, তথাপি, প্রাণপণ বলে কেবলি মনে মনে বলিতে লাগিল, ইহার প্রতিকার কি নাই? সংসারে চিরস্থায়ী ত কিছুই নয়, শুধু কি তাহার দুষ্কৃতিই জগতে অবিনশ্বর? কল্যাণের সকল পথ চিররুদ্ধ করিয়া কি শুধু সে-ই বিদ্যমান রহিবে, কোনদিনই তাহার ক্ষয় হইবে না?

মা, বাবা এসেছেন।

সবিতা মুখ তুলিয়া দেখিলেন সম্মুখে দাঁড়াইয়া ব্রজবাবু। মুহূর্তের জন্য সে সমস্ত বাধা-ব্যবধান ভুলিয়া গেল, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, এত দেরি করলে যে? বাইরে বেরুলে কি তুমি ঘর-সংসারের কথা চিরকালই ভুলে যাবে? দেখো ত বেলার দিকে চেয়ে?

ব্রজবাবু মহা অপ্রতিভভাবে বিলম্বের কৈফিয়ত দিতে লাগিলেন; সবিতা বলিলেন. কিন্তু আর বেলা করতে পাবে না। ঠাকুর-পুজোটি আজ কিন্তু তোমাকে সংক্ষেপে সারতে হবে তা বলে দিচ্চি।

তাই হবে নতুন-বৌ, তাই হবে। রেণু, দে ত মা আমার গামছাটা, জামাটা ছেড়ে চট্ করে নেয়ে আসি।

না বাবা, তুমি একটু জিরোও। দেরি যা হবার হয়েছে, আমি তামাক সেজে দিই।

মা ও পিতা উভয়েই কন্যার মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন; ব্রজবাবু কহিলেন, মেয়ে নইলে বাপের উপর এত দরদ আর কারও হয় না নতুন-বৌ। ওর কাছে তুমি ঠকলে। এই বলিয়া তিনি হাসিলেন।

সবিতা কহিলেন, ঠকতে আপত্তি নেই মেজকর্তা, কিন্তু এ-ই একমাত্র সত্যি নয়। সংসারে আর একজন আছে তার কাছে মেয়েও লাগে না, মা-ও না। এই বলিয়া তিনিও হাসিলেন। এই হাসি দেখিয়া ব্রজবাবু হঠাৎ যেন চমকিয়া গেলেন। কিন্তু আর কোন কথা না বলিয়া জামা-কাপড় ছাড়িতে ঘরে চলিয়া গেলেন।

সেদিন খাওয়া-দাওয়া চুকিল প্রায় দিনান্ত-বেলায়। ব্রজবাবু বিছানায় বসিয়া তামাক টানিতেছিলেন, সবিতা ঘরে ঢুকিয়া মেঝের উপর একধারে দেয়াল ঠেস দিয়া বসিলেন।

ব্রজবাবু বলিলেন, খেলে?

হাঁ।

মেয়ে অযত্ন অবহেলা করেনি ত?

না।

ব্রজবাবু ক্ষণেক স্থির থাকিয়া বলিলেন, গরীবের ঘর, কিছুই নেই। হয়তো তোমার কষ্ট হলো নতুন-বৌ।

সবিতা তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া কহিল, সে হবে না মেজকর্তা, তুমি আমাকে কটু কথা বলতে পাবে না। এইটুকুই আমার শেষ সম্বল। মরণকালে যদি জ্ঞান থাকে ত শুধু এই কথাই তখন ভাববো আমার মতো স্বামী সংসারে কেউ কখনো পায়নি।

ব্রজবাবুর মুখ দিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল, বলিলেন, তোমার নিজের খাবার কষ্টের কথা বলিনি নতুন-বৌ। বলছিলুম, আজ এ-ও তোমাকে চোখে দেখতে হলো। কেনই বা এলে!

সবিতা কহিলেন, দেখা দরকার মেজকর্তা, নইলে শাস্তি অসম্পূর্ণ থাকতো। তোমার গোবিন্দর একদিন সেবা করেছিলুম, বোধ হয় তিনিই টেনে এনেছেন। একেবারে পরিত্যাগ করতে পারেন নি। বলিতে বলিতে দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল, আঁচলে মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, একমনে যদি তাঁকে চাই, মনের কোথাও যদি ছলনা না রাখি, তিনি কি আমাকে মার্জনা করেন না মেজকর্তা?

ব্রজবাবু কষ্টে অশ্রুসংবরণ করিয়া বলিলেন, নিশ্চয়ই করেন।

কিন্তু কি করে জানতে পারবো?

তা জানিনে নতুন-বৌ, সে দৃষ্টি বোধ করি তিনিই দেন।

সবিতা বহুক্ষণ অধোমুখে বসিয়া থাকিয়া মুখ তুলিল, জিজ্ঞাসা করিল, আজ তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

ব্রজবাবু বলিলেন, নন্দ সাহার কাছে কিছু টাকা পেতুম—

দিলেন?

কি জানো—

সে শুনতে চাইনে, দিলে কিনা বলো?

ব্রজবাবু না দিবার কারণটা ব্যক্ত করিতে কতই যেন কুণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, আনন্দপুরের সাহাদের ত জানোই, তারা অতি সজ্জন ধর্মভীরু লোক কিন্তু দিনকাল এমন পড়েচে যে, মানুষে ইচ্ছে করলেও পেরে ওঠে না। তাছাড়া নন্দ সা এখন অন্ধ, কারবার গিয়ে পড়েচে ভাইপোদের হাতে—কিন্তু দেবে একদিন নিশ্চয়ই।

সে আমি জানি। কেননা ফাঁকি দিতে তাদের আমি দেবো না। নন্দ সাকে আমি ভুলিনি।

কি করবে,—নালিশ?

হাঁ, আর কোন উপায় যদি না পাই।

ব্রজবাবু হাসিয়া বলিলেন, মেজাজটি দেখছি এক তিলও বদলায় নি।

কেন বদলাবে? মেজাজ তোমারই বদলেছে নাকি? দুঃসময় কার বেশী তোমার চেয়ে? কিন্তু কাকে ফাঁকি দিতে পারলে? আমার মতো কৃতঘ্নের ঋণও শেষ কপর্দকও দিয়ে শোধ করে দিলে। তাদেরও তাই করতে হবে, শেষ কড়িটা পর্যন্ত আদায় দিয়ে, তবে তারা অব্যাহতি পাবে।

তাদের ওপর তোমার এত রাগ কিসের?

রাগ তো নয়, আমার জ্বালা। তোমাকে ভাই ঠকালে, বন্ধু ঠকালে, আত্মীয়-স্বজন—কর্মচারী, স্ত্রী পর্যন্ত তোমাকে ঠকাতে ছাড়লে না। এবার আমার সঙ্গে তাদের বোঝা-পড়া। তোমার নতুন কুটুম্বরা আমাকে চেনে না, কিন্তু তারা চেনে।

ব্রজবাবুর বহুদিন পূর্বের কথা মনে পড়িল, তখনও একবার ডুবিতে বসিয়াছিলেন। তখন এই রমণীই হাত ধরিয়া তাঁহাকে ডাঙগায় তুলিয়াছিল। বলিলেন, হাঁ, তারা বেশ চেনে। নতুন-বৌ মরেছে জেনে যারা স্বস্তিতে আছে তারা একটু ভয় পাবে। ভাববে ভূতের উপদ্রব ঘটলো। হয়তো গয়ায় পিণ্ডি দিতে ছুটবে।

সবিতা কহিল, তারা যা ইচ্ছে করুক ভয় করিনে। শুধু, তুমি পিণ্ডি দিতে না ছুটলেই হলো—ঐখানেই আমার ভাবনা। নিজে করবে না ত সে কাজ?

ব্রজবাবু চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

উত্তর দিলে না যে?

ব্রজবাবু আরও কিছুক্ষণ তাঁহার মুখের প্রতি নীরবে চাহিয়া রহিলেন। অপরাহ্ন-সূর্যের কতকটা আলো জানালা দিয়া মেঝের উপর রাঙগা হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাহার প্রতি সবিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, এর মতোই আমার বেলা পড়ে এলো নতুন-বৌ, পাওনা বুঝে নেবার আর সময় নেই। কিন্তু তুমি ছাড়া

সংসারে বোধ হয় আর কেউ নেই যে বোঝে আমি কত ক্লান্ত। ছুটির দরখাস্ত পেশ করে বসে আছি, মঞ্জুরি এলো বলে। যা নিয়েচি, যা দিয়েছি, তার হিসেব-নিকেশ হয়ে গেছে। হিসেব ভালো হয়নি জানি, গোঁজামিল অনেক রয়ে গেছে, কিন্তু তবু তার জের টানতে আর আমি পারবো না। তোমার এ অনুরোধ ফিরিয়ে নাও।

সবিতা একদৃষ্টে চাহিয়া শুনিতেছিলেন স্বামীর কথাগুলি, শেষ হইলে শুধু জিজ্ঞাসা করিল, সত্যিই কি আর পারবে না মেজকর্তা? সত্যিই কি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েচো?

সত্যিই বড় ক্লান্ত নতুন-বৌ, সত্যিই আর পারবো না। কত যে ক্লান্ত সে তুমি ছাড়া আর কেউ বুঝবে না; তারা বলবে আলস্য, বলবে জড়তা, ভাববে আমার নিরাশার হা-হুতাশ। তারা তর্ক করবে, যুক্তি দেবে, মেরে মেরে এখনো ছোটাতে চাইবে—তারা এই কথাটাই কেবল জেনে রেখেছে যে, কলে দম দিলেই চলে। কিন্তু তারও যে শেষ আছে এ তারা বিশ্বাস করতে পারে না।

আমি বিশ্বাস করলে তুমি খুশী হবে?

খুশী হবো কিনা জানিনে, কিন্তু শান্তি পাবো।

কি এখন করবে?

রেণুকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি যাবো। সেখানে সব গিয়েও যা বাকী থাকবে তাতে কোন-মতে আমাদের দিনপাত হবে। আর যারা আমাদের ত্যাগ করে কলকাতায় রইলো তাদের ভাবনা নেই, সে তো তুমি আগেই শুনেচো।

রেণুর ভার কাকে দিয়ে যাবে মেজকর্তা?

দিয়ে যাবো ভগবানকে। তাঁর চেয়ে বড় আশ্রয় আর নেই, সে আমি জেনেচি।

সবিতা স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। ভগবানে তাঁহার অবিশ্বাস নাই, কিন্তু নিজের মেয়ের সম্বন্ধে অতবড় নির্ভরতায় নিশ্চিন্ত হইতেও পারে না। শঙ্কায় বুকের ভিতরটায় তোলপাড় করিয়া উঠিল, কিন্তু ইহার উত্তর যে কি তাহাও ভাবিয়া পাইল না। শুধু যে কথাটা তাহার মনের মধ্যে অহরহ কাঁটার মত বিঁধিতেছিল তাহাই মুখে আসিয়া পড়িল, বলিল, মেজকর্তা, আমাকে টাকাটা ফিরিয়ে দিলে কি আমার অপরাধের দণ্ড দিতে? প্রতি-শোধের আর কি কোন পথ খুঁজে পেলে না?

ব্রজবাবু বলিলেন, না হয় তুমিই নিজে পথ বলে দাও! আমাদের রতন খুড়ো ও রতন খুড়ীর কথা তোমার মনে আছে? সে অবস্থায় রাজী আছ? এত দুঃখেও সবিতা হাসিয়া ফেলিল, সলজ্জে কহিল, ছি ছি, কি কথা তুমি বলো!

ব্রজবাবু কহিলেন, তবে কি করতে বলো? নতুন-বৌ গয়না চুরি করে পালিয়েছে বলে পুলিশে ধরিয়ে দেবো?

প্রস্তাবটা এত হাস্যকর যে বলামাত্রই দুজনে হাসিয়া ফেলিলেন। সবিতা বলিল, তোমার যত সব উদ্ভট কল্পনা।

বহুদিন পরে উভয়ের রহস্যোজ্জ্বল একটুমাত্র হাসির কিরণে ঘরের গুমট অন্ধকার যেন অনেকখানি কাটিয়া গেল। ব্রজবাবু বলিলেন, শাস্তির বিধান সকলের এক নয় নতুন-বৌ। দণ্ড দিতেই যদি হয় তোমাকে আর কি দণ্ড দিতে পারি? যেদিন রাত্রে তোমার নিজের সংসার পায়ে ঠেলে চলে গেলে, সেদিনই আমি স্থির করেছিলাম, আবার যদি কখনো দেখা হয়, তোমার যা-কিছু পড়ে রইলো ফিরিয়ে দিয়ে আমি অঋণী হবো।

সবিতার বিদ্যুদ্বেগে মনে পড়িল স্বামীর একটা কথা যাহা তিনি তখন প্রায়ই বলিতেন। বলিতেন, ঋণ রেখে মরতে নেই নতুন-বৌ, সে পরজন্মে এসেও দাবী করে। এই তাঁর ভয়। কোন সূত্রেই আর যেন না উভয়ের দেখা হয়,—সকল সম্বন্ধ যেন এইখানেই চিরদিনের মত বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। কহিল, আমি বুঝেচি মেজকর্তা। ইহ-পরকালে আর যেন না তোমার ওপর আমার কোন দাবী থাকে। সমস্তই যেন নিঃশেষ হয়—এই ত?

ব্রজবাবু মৌন হইয়া রহিলেন এবং যে আঁধার এইমাত্র ঈষৎ অপসৃত হইয়াছিল, সে আবার এই মৌনতার মধ্যে দিয়া সহস্রগুণ হইয়া ফিরিয়া আসিল। স্বামীর মুখের প্রতি আর সে চাহিয়া দেখিতেও পারিল না, নতনেত্রে মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, তোমরা কবে বাড়ি যাবে মেজকর্তা?

যত শীঘ্র পারি।

এখন যাই তবে?

এসো।

সবিতা উঠিয়া দাঁড়াইল, বুঝিল সব শেষ হইয়াছে। সেই ভূমিকম্পের রাতে রসাতলের গর্ভ চিরিয়া যে পাষাণ-স্তূপ ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত হইয়া উভয়ের মাঝখানে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছিল, আজও সে তেমনি অক্ষয় হইয়াই আছে, তাহার তিলার্ধও নষ্ট হয় নাই। এই নিরীহ শান্ত মানুষটি যে এত কঠিন হইতে পারে, আজিকার পূর্বে এ কথা সে কবে ভাবিয়াছিল!

ঘরের বাহিরে পা বাড়াইয়াও সে সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল, বলিল, মুক্তি পাবে না মেজকর্তা। তুমি বৈষ্ণব, কত মানুষের কত অপরাধই তুমি জীবনে ক্ষমা করেছো, কিন্তু আমাকে পারলে না। এ ঋণ তোমার রইলো। একদিন হয়তো তা জানতে পাবে।

ব্রজবাবু তেমনি স্তব্ধ হইয়াই রহিলেন। সন্ধ্যা হয়। যাইবার সময় রেণু তাঁহাকে প্রণাম করিল, কিন্তু কিছু বলিল না। এই নীরবতার মন্ত্র সে-ও হয়তো তাহার পিতার কাছেই শিখিয়াছে।

সারদাকে সঙ্গে লইয়া সবিতা বাহিরে আসিলেন। গাড়িতে উঠিয়াই চোখে পড়িল রাখাল তারককে লইয়া দ্রুতপদে এইদিকেই আসিতেছে। তারক বলিল, নতুন-মা, একবার নেমে দাঁড়াতে হবে যে, আমি প্রণাম করবো।

কথা কহা কঠিন, সবিতা ইঙ্গিতে উভয়কে গাড়িতে উঠিতে বলিয়া কোনমতে শুধু বলিলেন, এসো বাবা, আমার সঙ্গে তোমরা বাড়ি চলো।

এগারো

এক সপ্তাহ পূর্বে রাখাল আসিয়া বলিয়াছিল, নতুন-মা, সতেরো নম্বর বাড়িতে আপনি ত যাবেন না—আজ সন্ধ্যাবেলায় যদি আমার বাসায় একবার পায়ের ধুলো দেন।

কেন রাজু?

কাকাবাবুর জন্যে কিছু ফল-মূল কিনে এনেচি—ইচ্ছে তাঁকে একটু জল খাওয়াই—তিনি রাজী হয়েছেন আসতে।

কিন্তু আমাকে কি তিনি ডেকেছেন?

তিনি না ডাকুন আমি ত ডাকচি মা। কাল তাঁরা চলে যাবেন দেশে, বলেছেন গুছিয়ে-গাছিয়ে তাঁদের ট্রেনে তুলে দিতে।

সবিতা জানিতেন, ব্রজবাবু কোথাও কিছু খান না, তাঁহাকে সম্মত করাইতে রাখালকে অনেক চেষ্টা করিতে হইয়াছে,—বোধ হয় ভাবিয়াছে এ-কৌশলেও যদি আবার দুজনের দেখা হয়। রাখালের আবেদনের উত্তরে সবিতাকে সেদিন অনেক চিন্তা করিতে হইয়াছিল, স্নেহার্দ্র-চক্ষে তাহার প্রতি বহুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে বলিয়াছিলেন, না বাবা, আমি যাবো না। আমাকে দেখে তিনি শুধু দুঃখই পান, আর দুঃখ দিতে আমি চাইনে।

আবার এক সপ্তাহ গত হইয়াছে। রাখালের মুখে খবর মিলিয়াছে, ব্রজবাবু মেয়ে লইয়া দেশে চলিয়া গেছেন। তাঁহার এ পক্ষের স্ত্রী-কন্যা রহিল কলিকাতায় ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে। রাখাল বলিয়াছে তাঁহাদের কোন শোক নাই, কারণ অর্থ-কষ্ট নাই। বাড়ি-ভাড়ার আয়ে দিন ভালোই কাটিবে। অলঙ্কারের পুঁজি ত রহিলই।

সন্ধ্যার পরে একাকী বসিয়া সবিতা এই কথাগুলাই ভাবিতেছিল। ভাবিতেছিল, বারো বৎসরব্যাপী প্রতিদিনের সম্বন্ধ, অথচ কত শীঘ্র কত সহজেই না ঘুচিয়া যায়। তাহার নিজের কপাল যেদিন ভাঙ্গে সেদিন সকালেও সে জানিত না, রাত্রিটাও কাটিবে না, সমস্ত ছাড়িয়া তাহাকে পথে বাহির হইতে হইবে। একান্ত দুঃস্বপ্নেও সে কি কল্পনা করিতে পারিত এতবড় ক্ষতি কাহারও সহে? তবু সহিল ত! আবার সহিল তাহারই। বারো বছর

কাটিয়া গেল আজও সে তেমনি বাঁচিয়া আছে—তেমনিই দিনের পর দিন অবাধে বহিয়া গেল, কোথাও আটক খাইয়া বাধিয়া রহিল না।

এ বিড়ম্বনা কেন যে ঘটিল সে আজও তাহার কারণ জানে না। যতই ভাবিয়াছে, আত্মধিক্কারে জ্বলিয়া পুড়িয়া যতবার নিজের বিচার নিজে করিতে গেছে ততবারই মনে হইয়াছে ইহার অর্থ নাই—হেতু নাই—ইহার মূল অনুসন্ধান করিতে যাওয়া বৃথা। কিংবা, হয়তো এমনিই জগৎ—অঘটন এমনি অকারণে ঘটিয়াই জীবন-স্রোত আর একদিকে প্রবাহিত হইয়া যায়। মানুষের মতি, মানুষের বুদ্ধি কোথায় অন্ধ হইয়া মরে, নালিশ করিতে গিয়া আসামীর তল্লাশ মিলে না।

এদিকে রমণীবাবুও আর আসেন না। তিনি আসুন এ ইচ্ছা সবিতা করে না, কিন্তু বিস্মিত হইয়া ভাবে, নিষেধ করামাত্রই কি সকল সম্বন্ধ সত্যই শেষ হইয়া গেল। নিরবচ্ছিন্ন একত্র-বাসের বারোটা বৎসর কোন চিহ্নই কোথাও অবশিষ্ট রাখিল না—নিঃশেষে মুছিয়া দিল!

হয়তো, এমনিই জগৎ!

জগৎ এমনিই—কিন্তু এখানে আছে শুধুই কি অপচয়? উপচয় কোথাও নাই? কেবলই ক্ষতি? তবে, কেন কাছে আসিয়া পড়িল সারদা? তাহার মেয়ের মতো, মায়ের মতো। বাড়িতে অনেকগুলি ভাড়াটের মাঝে সেও ছিল একজন। শুধু নাম ছিল জানা, মুখ ছিল চেনা। কখনো দেখা হইয়াছে সিঁড়িতে, কখনো উঠানে, কখনো বা চলন-পথে। সসঙ্কোচে সরিয়া গেছে, চোখে চোখে চাহিতে সাহস করে নাই। অকস্মাৎ কি ব্যাপার ঘটিল, কে দিল তাহার বাসা বাঁধিয়া সবিতার হৃদয়ের অন্তস্তলে! কিন্তু এ-ই কি চিরস্থায়ী? কে জানে কবে সে আবার ঘর ভাঙিয়া এমনি সহসা অদৃশ্য হইবে।

আরও একজন আসিয়াছেন তিনি বিমলবাবু। মৃদুভাষী ধীর-প্রকৃতির লোক, স্বল্প-ক্ষণের জন্য আসিয়া প্রত্যহ খবর নিয়া যান কোথায় কি প্রয়োজন। হিতাকাঙ্ক্ষার আতিশয্যে উপদেশ দেওয়ার ঘটা নাই, বন্ধুতার আড়ম্বরে বসিয়া গল্প করার আগ্রহ নাই, কৌতূহলের কটুতায় পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রশ্ন করার প্রবৃত্তি নাই—দুই-চারিটা সাধারণ কথাবার্তার পরেই প্রস্থান করেন। সময় যেন তাঁহার বাঁধা-ধরা। নিয়ম ও সংযমের শাসন যেন এই মানুষটির সকল কাজে সকল ব্যবহারে বড় মর্যাদা দিয়া রাখিয়াছে। তবু তাঁহার চোখের দৃষ্টিকে সবিতা ভয় করে। ক্ষুধার্ত শ্বাপদের দৃষ্টি সে নয়, সে দৃষ্টি ভদ্র মানুষের—তাই ভয়। সে চোখে আছে আর্তের মিনতি, নাই উন্মাদ ব্যভিচার—শঙ্কা শুধু তার এই কারণে। পাছে অতর্কিতে পরাভব আসে কখন এই পথে।

তিনি আসিলে আলাপ হয় দুজনের এইমতো—

পূবের ঢাকা বারান্দায় একখানা বেতের চৌকি টানিয়া লইয়া বিমলবাবু বসিয়া বলেন, কেমন আছেন আজ?

সবিতা বলে, ভালই ত আছি।

কিন্তু ভালো ত দেখাচ্চে না? যেন শুকনো-শুকনো।

কৈ না।

না বললে শুনবো কেন? খাওয়া-দাওয়ায় কখনো যত্ন নিচ্চেন না। অবহেলা করলে শরীর থাকবে কেন—দুদিনেই ভেঙে পড়বে যে।

না ভাঙবে না, শরীর আমার খুব মজবুত।

বিমলবাবু উত্তরে অল্প হাসিয়া বলেন, শরীরটা মজবুত হয়েই যেন বালাই হয়ে উঠেচে। এটাকে ভেঙে ফেলাই এখন দরকার—না? সত্যি কিনা বলুন ত?

সবিতা কষ্টে অশ্রু-সংবরণ করিয়া চুপ করিয়া থাকে।

বিমলবাবু বলেন, গাড়িটা পড়ে রয়েছে, মিছিমিছি ড্রাইভারের মাইনে দিচ্চেন, বিকেলের দিকে একটু বেড়াতে যান না কেন?

বেড়াতে আমি ত কোনকালেই যাইনে বিমলবাবু।

শুনিয়া বিমলবাবু পুনরায় একটু হাসিয়া বলেন, তা বটে। বিনা কাজে ঘুরে বেড়ানোর অভ্যেস আমারও নেই। আজ রাখালবাবু এসেছিলেন?

না।

কালও আসেন নি ত?

না, চার-পাঁচদিন তাকে দেখিনি। হয়তো কোন বাজে কাজে ব্যস্ত আছে।

বাজে কাজে? ঐ তাঁর স্বভাব, না?

হাঁ, ঐ ওর স্বভাব। বিনা স্বার্থে পরের বেগার খাটতে ওর জোড়া নেই।

বিমলবাবু অন্যমনে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকেন। দূরে সারদাকে দেখা যায়, তিনি হাত নাড়িয়া কাছে ডাকেন, বলেন, কৈ, আজ আমাকে জল দিলে না মা? তোমার হাতের জল আর পান না খেলে আমার তৃপ্তি হয় না।

সারদা জল ও পান আনিয়া দেয়। নিঃশেষ করিয়া এক গ্লাস জল খাইয়া পান মুখে দিয়া বিমলবাবু উঠিয়া দাঁড়ান, বলেন, আজ তা হলে আসি।

সবিতা নিজেও উঠিয়া দাঁড়ায়, নমস্কার করিয়া বলে, আসুন।

দিন-তিনেক পরে এমনিধারা আলাপের পরে বিমলবাবু উঠিবার উপক্রম করিতেই সবিতা কহিল, আজ আপনার কাজের একটু আমি ক্ষতি করবো। এখুনি যেতে পাবেন না, বসতে হবে।

বিমলবাবু বসিয়া বলিলেন, একটু বসলে আমার কাজের ক্ষতি হয়, এ আপনাকে কে বললে?

সবিতা কহিল, কেউ বলেনি, এ আমার অনুমান। আপনার কত কাজ—মিছে সময় নষ্ট হয় ত?

বিমলবাবু ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, তা জানিনে; কিন্তু এইজন্যেই কি কখনো বসতে বলেন না? সত্যি বলুন ত?

এ কথা সত্য নয়, কিন্তু এই লইয়া সবিতা বাদানুবাদ করিল না, বলিল, রমণীবাবুর সঙ্গে আপনার দেখা হয়?

হাঁ, প্রায়ই হয়।

তিনি আর এখানে আসেন না—আপনি জানেন?

জানি বৈ কি।

আর কি তিনি এ-বাড়িতে আসবেন না?

সে-কথা জানিনে। বোধ হয় আপনি ডেকে পাঠালেই আসতে পারেন।

সবিতা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, আজ সকালের ডাকে একটা দলিল এসে পেঁাছেচে। এই বাড়ি রমণীবাবু আমাকে বিক্রি-কবালায় রেজেস্ট্রি করে দিয়েছেন। আপনি জানেন?

জানি।

কিন্তু দেবার ইচ্ছেই যদি ছিল, সোজা দানপত্র না করে বিক্রি করার ছলনা কেন? দাম ত আমি দিইনি।

কিন্তু দানপত্র জিনিসটা ভালো না।

সবিতা বলিল, সে আমি জানি বিমলবাবু! আমার স্বামী ছিলেন বিষয়ী লোক, তাঁর সকল কাজেই সেদিনে আমার ডাক পড়তো। এ আমার অজানা নয় যে, আমাকে দান করার কারণ দেখাতে দলিলে এমন সব কথা লিখতে হতো, যা কোন নারীর পক্ষেই গৌরবের নয়। তবু বলি, এ মিথ্যের চেয়ে সেই ছিল ভালো।

ইতিপূর্বে এরূপ হেতুও ঘটে নাই, এমন করিয়া সবিতা কথাও বলে নাই। বিমলবাবু মনে মনে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, ব্যাপারটা একেবারেই যে মিথ্যে তা-ও নয় নতুন-বৌ।

নতুন-বৌ সম্বোধনটা নূতন। সবিতার মুখ দেখিয়া মনে হইল না সে খুশী হইল, কিন্তু কণ্ঠস্বরের সহজতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই বলিল, ঠিক এই জিনিসটিই আমি সন্দেহ করেছিলুম বিমলবাবু। দাম আপনি দিয়েছেন, কিন্তু কেন দিলেন? তাঁর দান নেওয়ায় তবু একটা সান্ত্বনা ছিল, কিন্তু আপনার দেওয়া ত নিছক ভিক্ষে। এ আমি কিসের জন্যে নিতে যাবো বলুন?

বিমলবাবু নীরবে নতমুখে বসিয়া রহিলেন।

সবিতা কহিল, উত্তর না দিলে দলিল ফিরিয়ে দিয়ে আমি চলে যাবো বিমলবাবু।

এবার বিমলবাবু মুখ তুলিয়া চাহিলেন, বলিলেন, এই ভয়েই দাম দিয়েছি, পাছে আপনি কোথাও চলে যান। না দিয়ে থাকতে পারিনি বলেই বাড়িটা আপনার কিনে রেখেচি।

টাকা তিনি নিলেন?

হাঁ, ভেতরে ভেতরে রমণীবাবুর বড় অভাব হয়েছিল। আর যেন পেরে উঠছিলেন না।

সবিতা কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, আমারও সন্দেহ হতো, কিন্তু এতটা ভাবিনি। আবার একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, শুনেচি আপনার অনেক টাকা। এ ক'টা টাকা হয়তো কিছুই নয়, তবু আসল কথাই যে বাকী রয়ে গেল বিমলবাবু। দিতে আপনি পারেন, কিন্তু আমি নেবো কি বলে?—না, সে হবে না—বার বার চুপ করে জবাব এড়িয়ে গেলে আমি শুনবো না। বলুন।

বিমলবাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, একজন অকৃত্রিম বন্ধুর উপহার বলেও ত নিতে পারেন।

সবিতা তাঁহার মুখের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, নিলে কৈফিয়তের অভাব হয় না সে আমি জানি। আপনি যে আমার বন্ধু নয় তাও বলিনে, কিন্তু সে কথা যাক। এখানে আর কেউ নেই, শুধু আপনি আর আমি। আমাকে বলতে সঙ্কোচ হয়, এ অধিকার পুরুষের কাছে আমার আর নেই—বলুন ত এই কি সত্যি? এই কি আপনার মনের কথা?

বিমলবাবু মুখ তুলিয়া ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন, তার পরে বলিলেন, মনের কথা আপনাকে জানাবো কেন? জানিয়ে ত লাভ নেই।

লাভ নেই তা-ও জানেন?

হাঁ, তা-ও জানি।

সবিতা নিঃশ্বাস চাপিয়া ফেলিল। এই স্বল্পভাষী শান্ত মানুষটির প্রতিদিনের আচরণ মনে করিয়া তাহার চোখে জল আসিতে চাহিল, তাহাও সংবরণ করিয়া কহিল, আমার জীবনের ইতিহাস জানেন বিমলবাবু?

না, জানিনে। শুধু যা ঘটেছে—যা অনেকে জানে—আমিও কেবল সেইটুকুই জানি নতুন-বৌ, তার বেশী নয়।

কথাটা শুনিয়া সবিতা যেন চমকিয়া উঠিল—যা ঘটেছে সে কি তবে আমার জীবনের ইতিহাস নয় বিমলবাবু? ও দুটো কি একেবারে আলাদা? বলুন ত সত্যি করে?

তাঁহার প্রশ্নের আকুলতায় বিমলবাবু দ্বিধায় পড়িলেন, কিন্তু তখনি নিঃসঙ্কোচে বলিলেন, হাঁ, ও দুটো এক নয় নতুন-বৌ। অন্ততঃ নিজের জীবনের মধ্যে দিয়ে এই কথাই আজ অসংশয়ে জানতে পেরেছি ও-দুটো এক নয়।

ইহার অর্থটা যদিচ স্পষ্ট হইল না, তথাপি কথাটা সবিতাকে অন্তরে গভীর আঘাত করিল। নীরবে মনে মনে বহুক্ষণ আন্দোলন করিয়া শেষে বলিল, শুনেছেন ত আমি স্বামী ত্যাগ করে রমণীবাবুর কাছে এসেছিলুম,—আবার সেদিন তাঁকেও পরিত্যাগ করেছি। আমি ত ভালো মেয়ে নই—আবার একদিন অন্য পুরুষ গ্রহণ করতে পারি, এ কথা কি আপনার মনে আসে না?

বিমলবাবু বলিলেন, না। যদি-বা আসতে চেয়েছে তখনি সরিয়ে দিয়েছি।

কেন?

শুনিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন, এ হলো ছেলেদের প্রশ্ন। ও এই করেছে, এই করেছে অতএব ওর এ-ই করা চাই, এ জবাব পাবেন আপনি তাদেরি পড়ার বইয়ে। আমি তার চেয়ে বেশী পড়েছি নতুন-বৌ।

পড়ালে কে?

সে ত একজন নয়। ক্লাসে প্রহরে প্রহরে মাস্টার বদল হয়েছে, তাঁদের কাউকে বা মনে আছে, কাউকে নেই, কিন্তু হেডমাস্টার যিনি, আড়ালে থেকে এঁদের যিনি নিযুক্ত করে-ছিলেন তাঁকে ত দেখিনি, কি করে আপনার কাছে তাঁর নাম করবো বলুন?

সবিতা ক্ষণকাল ভাবিয়া বলিল, আপনি বোধ হয় খুব ধার্মিক লোক, না বিমলবাবু?

বিমলবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, ধার্মিক লোক আপনি কাকে বলেন? আপনার স্বামীর মতো?

সবিতা চকিত হইয়া প্রশ্ন করিল, তাঁকে কি চেনেন? তাঁর সঙ্গে জানাশুনো আছে নাকি?

বিমলবাবু তাহার উদ্বেগ লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু পূর্বের মতোই শান্তস্বরে বলিলেন, হাঁ চিনি। একদিন কোনমতে কৌতূহল দমন করতে পারলুম না, গেলুম তাঁর কাছে। অনেক চেষ্টায় দেখা মিললো, কথাবার্তাও অনেক হলো—না নতুন-বৌ, ধর্মকে যে-ভাবে তিনি নিয়েছেন আমি তা নিইনি, যে-ভাবে বুঝেছেন আমি তা বুঝিনি, ওখানে আমাদের মিল নেই। ধার্মিক লোক আমি নয়।

আবেগ ও উত্তেজনায় সবিতার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। এ কথা বুঝিতে তাহার বাকী নাই, সমস্ত কৌতূহলেব মূল কারণ সে নিজে। থামিতে পারিল না, জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, ওখানে মিল না থাক, কোথাও কি আপনাদের মিল নেই? দুজনের স্বভাব কি সম্পূর্ণ আলাদা?

বিমলবাবু বলিলেন, এ উত্তর আপনাকে দেবো না, অন্ততঃ দেবার এখনো সময় আসেনি।

অন্ততঃ বলুন এ কথাও কি তখন মনে আসেনি এ-মানুষটিকে কেউ ছেড়ে চলে গেল কি করে?

বিমলবাবু হাসিয়া বলিলেন, কেউ মানে আপনি ত? কিন্তু ছেড়ে চলে ত আপনি যাননি। সবাই মিলে বাধ্য করেছিল আপনাকে চলে যেতে।

এ-ও শুনেছেন?

শুনেছি বৈ কি।

সমস্তই?

সমস্তই শুনেচি।

সবিতার দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল, কহিল, তাদের দোষ আমি দিইনে, তারা ভালোই করেছিল। স্বামীর সংসার অপবিত্র না করে আমার আপনিই চলে যাওয়া উচিত ছিল। এই বলিয়া সে আঁচলে চোখ মুছিয়া ফেলিল। একটু পরে বলিল, কিন্তু এত জেনেও আমাকে ভালোবাসলেন কি ক'রে বলুন তো?

ভালোবাসি এ কথা ত আজো বলিনি নতুন-বৌ।

না, বলেন নি বলেই ত এ কথা এমন সত্যি করে জানতে পেরেচি বিমলবাবু। কিন্তু মনে ভাবি সংসারে যে-লোক এত দেখেচে, আমার সব কথাই যে শুনেচে, সে আমাকে ভালোবাসলে কি বলে? বয়স হয়েছে, রূপ আর নেই—বাকী যেটুকু আছে তাও দুদিনে শেষ হবে—তাকে ভালোবাসতে পারলে মানুষে কি ভেবে?

বিমলবাবু তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, ভালোবেসেই যদি থাকি নতুন-বৌ, সে হয়তো সংসারে অনেক দেখেচি বলেই সম্ভব হয়েছে। বইয়ে পড়া পরের উপদেশ মেনে চললে হয়তো পারতুম না। কিন্তু সে যে রূপ-যৌবনের লোভে নয়, এ কথা যদি সত্যিই বুঝে থাকেন আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

সবিতা মাথা নাড়িয়া কহিল, হাঁ, এ কথা আমি সত্যিই বুঝেচি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আমাকে পেয়ে আপনার লাভ কি হবে? কি করবেন আমাকে নিয়ে?

বিমলবাবু উত্তর দিলেন না, শুধু নীরবে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমশঃ সে-দৃষ্টি যেন ব্যথায় ভরিয়া আসিল।

সবিতা অধীর হইয়া বলিয়া উঠিল, এমনি করে কি শুধু চেয়েই থাকবেন বিমলবাবু, জবাব দেবেন না আমার?

জবাব নেই নতুন-বৌ। শুধু জানি আপনাকে আমি পাবো না—পাবার পথ নেই আমার।

কেন নেই? কি করে বুঝলেন সে কথা?

বুঝেচি অনেক দুঃখ পেয়ে। আমিও নিষ্কলঙ্ক নই নতুন-বৌ। একদিন অনেক মেয়েকেই আমি জেনেছিলুম। সেদিন ঐশ্বর্যের জোরে এনেছিলুম তাদের ছোট করে—তারা নিজেরাও হয়ে গেল ছোট, আমাকেও করে দিলে তাই। তারা আর নেই—কোথায় কে-যে ভেসে গেলো আজ খবরও জানিনে।

একটু থামিয়া বলিলেন, তখন এ-খেলায় নামতে আমার বাধেনি, কিন্তু আজ বাধে পদে পদে।

সবিতা শিহরিয়া প্রশ্ন করিল, শুধুই ঐশ্বর্য দিয়ে ভুলিয়েছিলেন তাদের? কাউকে ভালোবাসেন নি?

বিমলবাবু বলিলেন, বেসেছিলুম বৈ কি। একজন আপনার মতোই গৃহ ছেড়ে কাছে এসেছিল, কিন্তু খেলা ভাঙলো—তাকে রাখতে পারলুম না। দোষ তাকে দিইনে, কিন্তু আজ আর আমার বুঝতে বাকী নেই, ভালোবাসার ধনকে ছোট করে ধরে রাখা যায় না—তাকে হারাতেই হয়। সেদিন রমণীবাবুকেও ত এমনি হারাতে দেখলুম।

সবিতা প্রশ্ন করিল,—এই কি আপনার ভয়?

বিমলবাবু বলিলেন, ভয় নয় নতুন-বৌ—এখন এই আমার ব্রত, এর থেকে বিচ্যুত না হই এই আমার সাধনা। আপনার মেয়েকে দেখেচি, আপনার স্বামীকে দেখে এসেচি। কি করে সমস্ত দিয়ে ঋণ শুধে তিনি চলে গেছেন তাও জেনেছি। শুনতে আমার বাকী কিছু নেই, এর পরে আপনাকে পাবো আমি কি দিয়ে? দোর যে বন্ধ। জানি, ছোট করে আপনাকে আমি কোনদিন নিতে পারবো না, আবার তার চেয়েও বেশী জানি যে, ছোট না করেও আপনাকে পাবার আমার এতটুকু পথ খোলা নেই। তাই ত বলেছিলুম নতুন-বৌ, নিন আমাকে আপনার অকৃত্রিম বন্ধু বলে। এই বাড়িটা সেই বন্ধুর দেওয়া উপহার। এ আপনাকে ছোট করার কৌশল নয়।

সবিতা নতমুখে নীরবে বসিয়া রহিল, কত কথাই যে তাহার মনের মধ্যে ভাসিয়া গেল তাহার নির্দেশ নাই, শেষে মুখ তুলিয়া কহিল, এ বন্ধুত্ব কতদিন স্থির থাকবে বিমল-বাবু? এ মিথ্যের আবরণ টিকবে কেন? নর-নারীর মূল সম্বন্ধে একদিন যে আমাদের টেনে নামাবেই। সে থামাবে কে?

বিমলবাবু বলিলেন, আমি থামাবো নতুন-বৌ। আপনার অপেক্ষা করে থাকবো, কিন্তু মন ভোলাবার আয়োজন করবো না। যদি কখনো নিজের পরিচয় পান, আমার মতো দু'চোখ চেয়ে দৃষ্টি যদি কখনো বদলায়, কাছে আমাকে ডাকবেন—বেঁচে যদি থাকি ছুটে আসবো। ছোট করে নেবার জন্যে নয়—আসবো মাথায় তুলে নিতে।

সবিতার চোখ ছলছল করিতে লাগিল, কহিল, আপন পরিচয় পেতে আর বাকী নেই বিমলবাবু, চোখের এ-দৃষ্টি আর ইহজীবনে বদলাবে না। শুধু আশীর্বাদ করুন, যে-দুঃখ নিজে ডেকে এনেচি তা যেন সইতে পারি।

বিমলবাবুর চোখও সজল হইয়া উঠিল, বলিলেন, দুঃখ কে দেয়, কোথা দিয়ে সে আসে আমি আজও জানিনে। তাই তোমার অপরাধের বিচার করতে আমি বসবো না, শুধু প্রার্থনা করবো, যেমন করেই এসে থাক এ দুঃখ যেন তোমার চিরস্থায়ী না হয়।

কিন্তু চিরস্থায়ীই ত হয়ে রইলো।

তাও জানিনে নতুন-বৌ। আমার আশা, সংসারে আজো তোমার জানতে কিছু বাকী আছে, আজো তোমার সকল দেখাই এখানে শেষ হয়ে যায়নি। আশীর্বাদ তোমাকে যদি করতেই হয়, এই আশীর্বাদ করি সেদিন যেন তুমি সহজেই এর একটা কূল দেখতে পাও।

সবিতা উত্তর দিল না, আবার দুজনের বহুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিল। মুখ যখন সে তুলিল তখন উজ্জ্বল দীপালোকে স্পষ্ট দেখা গেল তাহার চোখের পাতা দুটি ভিজিয়া ভারী হইয়া উঠিয়াছে; মৃদুকণ্ঠে কহিল, তারক বর্ধমানের কোন একটা গ্রামে মাস্টারি করে, সে আমাকে ডেকেছে। যাবো দিনকতক তার কাছে?

যাও।

তুমি কি এখন কিছুদিন কলকাতাতেই থাকবে?

থাকতেই হবে। এখানে একটা নতুন আপিস খুলেচি, তার অনেক কাজ বাকী।

সবিতা একটুখানি হাসিয়া বলিল, টাকা ত অনেক জমালে—আর কি করবে?

প্রশ্ন শুনিয়া বিমলবাবুও হাসিলেন, বলিলেন, জমাই নি, ওগুলো আপনি জমে উঠেছে নতুন-বৌ, ঠেকাতে পারিনি বলে। কি করবো জানিনে, ভেবেচি, সময় হলে একজনের কাছে শিখে নেবো তার প্রয়োজন।

সবিতা উঠিয়া গিয়া পাশের জানালাটা খুলিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিয়া বসিল, বলিল, —এ বাড়িটায় আর আমার দরকার ছিল না—ভেবেছিলুম ভালোই হলো যে গেলো, একটা ঝঞ্ঝাট মিটলো; কিন্তু তুমি তা হতে দিলে না। ভাড়াটেরা রইলো এদের দেখো।

দেখবো।

আর একটি অনুরোধ করবো, রাখবে?

কি অনুরোধ নতুন-বৌ?

আমার মেয়ে, আমার স্বামী রইলেন বনবাসে। যদি সময় পাও তাঁদের একটু খোঁজ নিও।

বিমলবাবু হাসিমুখে একটুখানি ঘাড় নাড়িলেন, কিছুই বলিলেন না। ইহার কি যে অর্থ সবিতা ঠিক বুঝিল না, কিন্তু বুকের মধ্যে যেন আনন্দের ঝড় বহিয়া গেল। হাত দুটি এক করিয়া নীরবে কপালে ঠেকাইল, সে স্বামীর উদ্দেশে, না বিমলবাবুকে, বোধ করি নিজেও জানিল না। একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া, তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, আমার স্বামীর কথা একদিন তোমাকে নিজের মুখে শোনাবো—সে শুধু আমিই জানি, আর কেউ না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তোমাকে, আমি বাপের বাড়িতে যখন ছোট ছিলুম তখন কেন আসোনি বলো ত?

বিমলবাবু হাসিয়া বলিলেন, তার কারণ আমাকে আজকে যিনি পাঠিয়েছেন সেদিন তাঁর খেয়াল ছিল না। সেই ভুলের মাশুল যোগাতে আমাদের প্রাণান্ত হয়, কিন্তু এমনি করেই বোধ করি সে-বুড়োর বিচিত্র খেলার রস জমে ওঠে। কখনো দেখা পেলে দুজনে নালিশ্ রুজু করে দেবো। কি বলো?

দূরে সারদাকে বার-কয়েক যাতায়াত করিতে দেখিয়া কাছে ডাকিয়া বলিলেন, তোমার মায়ের খাবার দেরি হয়ে গেছে—না মা? উঠতে হবে?

সারদা ভারী অপ্রতিভ হইয়া বার বার প্রতিবাদ করিয়া বলিতে লাগিল, না কখ্খনো না! দেরি হয়ে গেছে আপনার--আপনাকে আজ খেয়ে যেতে হবে।

বিমলবাবু হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন,—তোমার এই কথাটিই কেবল রাখতে পারবো না মা, আমাকে না খেয়েই যেতে হবে।

চললুম।

সবিতা উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিল, কিন্তু সারদার অনুরোধে যোগ দিল না।

বিমলবাবু প্রত্যহের মতো আজও প্রতি-নমস্কার করিযা ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেলেন।

বারো

রমণীবাবু আর আসেন না, হয়তো ছাড়াছাড়ি হইল। দুজনের মাঝখানে অকস্মাৎ কি যে ঘটিল ভাড়াটেরা ভাবিয়া পায় না। আড়াল হইতে চাহিয়া দেখে সবিতার শান্ত বিষণ্ণ মুখ—পূর্বের তুলনায় কত-না প্রভেদ। জ্যৈষ্ঠের শূন্যময় আকাশ আষাঢ়ের সজল মেঘভারে যেন নত হইয়া তাহাদের কাছে আসিয়াছে। তেমনি লতা-পাতায়, তৃণ-শস্পে, গাছে গাছে লাগিয়াছে অশ্রু-বাষ্পের সকরুণ স্নিগ্ধতা, তেমনি জলে-স্থলে, গগনে-পবনে সর্বত্র দেখা দিয়াছে তাঁহার গোপন বেদনার স্তব্ধ ইঙ্গিত। কথায়, আচরণে উগ্রতা ছিল না তাঁর কোনদিনই, তথাপি কিসের একটা অজানিত ব্যবধানে এতদিন কেবলি রাখিত তাঁকে দূরে দূরে। এখন সেই দূরত্ব মুছিয়া গিয়া তাঁহাকে টানিয়া আনিয়াছে সকলের বুকের কাছে। বাড়ির মেয়েরা এই কথাটাই বলিতেছিল সেদিন সারদাকে। ভাবিয়াছে, বুঝি বিচ্ছেদের দুঃখই তাঁহাকে এমন করিয়া বদলাইয়াছে।

রমণীবাবু মোটের উপর ছিলেন ভালোমানুষ লোক, থাকিতেন পরের মতো, কাহারো

ভালোতেও না, মন্দতেও না। মাঝে মাঝে ভাড়া বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করা ভিন্ন অন্য অসদাচরণ করেন নাই। তাঁহার চলিয়া যাওয়াটা লাগিয়াছে অনেককেই, তবু ভাবে সেই যাওয়ার কলঙ্কিত-পথে নতুন-মার সকল কালি যদি এতদিনে ধুইয়া যায় ত শোকের পরিবর্তে তাহারা উল্লাসবোধই করিবে। এ-যেন তাহাদের গ্লানি ঘুচিয়া নিজেরাই নির্মল হইয়া বাঁচিল। কেবল একটা ভয় ছিল তিনি নিজে না থাকিলে তাহারাই বা দাঁড়াইবে কোথায়? আজ সারদা এই বিষয়েই তাহাদের নিশ্চিন্ত করিল। বলিল, পিসীমা, বাড়িটার একটা ব্যবস্থা হলো। তোমরা যেমন আছো তেমনি থাকো—তোমাদের কোথাও বাসা খুঁজতে হবে না, মা বলে দিলেন।

তবে বুঝি মা আর কোথাও যাবেন না সারদা?

যাবেন, কিন্তু আবার ফিরে আসবেন। বাড়ি ছেড়ে কোথাও বেশীদিন থাকবেন না বললেন।

আনন্দে পিসীমার চোখে জল আসিয়া পড়িল, সারদাকে আশীর্বাদ করিয়া তিনি এই সুসংবাদ অন্য সকলকে দিতে গেলেন।

প্রতিদিন বিমলবাবু বিদায় লইবার পরে সবিতা আসিয়া তাঁহার পূজার ঘরে প্রবেশ করে। পূর্বে তাহার আহ্নিক সারিতে বেশী সময় লাগিত না, কিন্তু এখন লাগে দু-তিন ঘণ্টা। কোনদিন বা রাত্রি দশটা বাজে, কোনদিন বা এগারোটা। এই সময়টায় সারদার ছুটি, সে নীচে নামিয়া নিজের গৃহকর্ম সারে। আজ ঘরে ঢুকিয়া দেখিল রাখাল বিছানায় বসিয়া প্রদীপের আলোকে তাহার খাতাখানা পড়িতেছে। জিজ্ঞাসা করিল, কখন এলেন? তার পরে কুণ্ঠিত-স্বরে কহিল, না-জানি কত ভুলচুকই হয়েছে! না?

রাখাল মুখ তুলিয়া বলিল, হলেও ভুলচুক শুধরে নিতে পারবো, কিন্তু লেখাটা ত কিছুই এগোয় নি দেখচি।

না। সময় পাইনে যে।

পাও না কেন?

কি করে পাবো বলুন? মায়ের সব কাজ আমাকেই করতে হয় যে।

নতুন-মার দাসী-চাকরের অভাব নেই। তাঁকে বলো না কেন তোমারো সময়ের দরকার—তোমারো কাজ আছে। এ কিন্তু ভারী অন্যায় সারদা।

রাখালের কণ্ঠস্বরে তিরস্কারের আভাস ছিল, কিন্তু সারদার মুখ দেখিয়া মনে হইল না সে কিছুমাত্র লজ্জা পাইয়াছে। বলিল, আপনারই কি কম অন্যায় দেব্‌তা? ভিক্ষের দান ঢাকতে অকাজের বোঝা চাপিয়েছেন আমার ঘাড়ে। পরকে অকারণ পীড়ন করলে নিজের হয় জ্বর, ঘরের মধ্যে একলা পড়ে ভুগতে হয়, সেবা করার লোক জোটে না। এত রোগা দেখচি কেন বলুন ত?

রাখাল বলিল, রোগা নই, বেশ আছি। কিন্তু লেখাটা হঠাৎ অকাজ হয়ে উঠলো কিসে?

সারদা বলিল, অকাজ নয় ত কি! হলো জ্বর, তাও ঢাকতে হলো হয়নি বলে। এমনি দশা। ভালো, ওটা লিখেই না হয় দিলুম, কিন্তু কি কাজে আপনার লাগবে শুনি?

কাজে লাগবে না? তুমি বলো কি সারদা?

সারদা কহিল, এই বলচি যে, এ-সব কিছু কাজে লাগবে না। আর যদিই বা লাগে আমার কি? মরতে আমাকে আপনি দেননি, এখন বাঁচিয়ে রাখার গরজ আপনার। একছত্রও আর আমি লিখবো না।

রাখাল হাসিয়া বলিল, লিখবে না ত আমার ধার শোধ দেবে কি করে?

ধার শোধ দেবো না—ঋণী হয়েই থাকবো।

রাখালের ইচ্ছা করিল, তাহার হাতটা নিজের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলে, তাই থেকো, কিন্তু সাহস করিল না। বরঞ্চ, একটুখানি গম্ভীর হইয়াই বলিল, যেটুকু লিখেচো তার থেকে কি বুঝতে পারো না ও-গুলোর সত্যিই দরকার আছে?

সারদা বলিল, দরকার আছে শুধু আমাকে হয়রান করার—আর কিছু না। কেবল কতকগুলো রামায়ণ-মহাভারতের কথা—এখান-সেখান থেকে নেওয়া—ঠিক যেন যাত্রা-দলের বক্তৃতা। ও-সব কিসের জন্যে লিখতে যাবো?

তাহার কথা শুনিয়া রাখাল যতটা হইল বিস্ময়াপন্ন তার ঢের বেশী হইল বিপদাপন্ন। বস্তুতঃ লেখাগুলা তাই বটে। সে যাত্রার পালা রচনা করে, নকল করাইয়া অধিকারীদের দেয়, ইহাই তাহার আসল জীবিকা। কিন্তু উপহাসের ভয়ে বন্ধু-মহলে প্রকাশ করে না, বলে ছেলে পড়ায়। ছেলে পড়ায় না যে তাহা নয়, কিন্তু এ আয়ে তাহার ট্রামের মাশুলের সংকুলান হয় না। তাহার ইচ্ছা নয় যে, উপার্জনের এই পন্থাটা কোথাও ধরা পড়ে—যেন এ বড় অগৌরবের, ভারী লজ্জার। তাহার এমন সন্দেহও জন্মিল, নিজেকে সারদা যতটা অশিক্ষিতা বলিয়া প্রচার করিয়াছিল হয়তো তাহা সত্য নয়, হয়তো বা সম্পূর্ণ মিথ্যা, কি জানি হয়তো বা তাহার চেয়েও - রাগে মনের ভিতরটা কেমন জ্বলিয়া উঠিল, কারণ, সে জানে তাহার পল্লবগ্রাহী বিদ্যা -যতটা জানে আইনস্টিনের রিলেটিভিটি ততটাই জানে সে সফোক্লিসের অ্যানটিগন অ্যাজাক্স। অন্ধকারে চলার মতো প্রতি পদক্ষেপেই তাহার ভয় পাছে গর্তে পা পড়ে। যাত্রার পালা লেখার লজ্জাটাও তাহার এই-জাতীয়। সারদার প্রশ্নের উত্তরে কথা খুঁজিয়া না পাইয়া বলিয়া উঠিল,—আগে ত তুমি ঢের ভালোমানুষ ছিলে সারদা, হঠাৎ এমন দুষ্টু হয়ে উঠলে কি ক'রে?

সারদা হাসিয়া কহিল, দুষ্টু হয়ে উঠেচি?

ওঠোনি? ভালো, তোমার মতে দরকারী কাজটা কি শুনি?

বলচি। আগে আপনি বলুন ছ-সাতদিন আসেন নি কেন?

শরীরটা একটু খাবাপ হয়েছিল।

মিছে কথা। এই বলিয়া সারদা তাহার মুখের প্রতি কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, হয়েছিল জ্বর এবং তা-ও খুব বেশী। এ-কে শরীর খারাপ বলে উড়িয়ে দিলে সে হয় মিথ্যে কথা। আপনার বুড়ো-ঝি, যাকে নানী বলে ডাকেন, সে-ও ছিল শয্যাগত। স্টোভ জ্বালিয়ে নিজেকে করতে হয়েচে সাগু-বার্লি তৈরি। শুনি আপনার বন্ধুবান্ধব আছে অনেক, তাদের কাউকে খবর দেননি কেন?

প্রশ্নটা রাখালের নতুন নয়—গত বছরেও প্রায় এমনি অবস্থাই ঘটিয়াছিল; কিন্তু সে চুপ করিয়া রহিল—এ কথা স্বীকার করিতে পারিল না যে, সংসারে বন্ধু-সংখ্যা যাহার অপরিমিত, দুঃখের দিনে ডাক দিবার মতো বন্ধুর তাহারি সবচেয়ে অভাব?

সারদা বলিল, তারা যাক, কিন্তু নতুন-মাকে খবর দিলেন না কেন?

প্রত্যুত্তরে রাখাল সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, নতুন-মা! নতুন-মা যাবেন আমার সেই পচা এঁদো-পড়া বাসায় সেবা করতে? তুমি কি যে বলো সারদা তার ঠিকানা নেই। কিন্তু আমার অসুখের সংবাদ তোমাকেই বা দিলে কে?

সারদা কহিল, যে-ই দিক, কিন্তু দুঃখ এই যে সময়ে দিলে না। শুনে নতুন-মা বললেন, রাজু আমার রেণুকে বাঁচালে দিনের বেলায় রেঁধে সকলের মুখে অন্ন যুগিয়ে, রাত্তিরে সারারাত জেগে সেবা করে, নিজের সমস্ত পুঁজি খুইয়ে ডাক্তার-বদ্যির ঋণ শুধে। আর ও যখন পড়লো অসুখে তখন আপনি গেল জ্বরের তেষ্টার জল কল থেকে আনতে, উনুন জেলে আপনি করলে ক্ষিধের পথ্যি তৈরি, ও ওষুধ পেলে না আনবার লোক নেই বলে। কিন্তু আমাকে খবর দেবে কেন মা—আমাকে তার বিশ্বাস ত নেই। মেয়ের অসুখে পরের নাম করে এসেছিল যখন সাহায্য চাইতে--তাকে দিইনি ত। বলিতে বলিতে সারদার নিজের চোখেই জল উপচিয়া উঠিল, কহিল, কিন্তু সে না হয় নতুন-মা, আমি কি দোষ করেছিলাম দেব্‌তা? কেরানীগিরি করে আজও টাকা শোধ দিইনি, সেই রাগে নাকি?

রাখাল হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, এ চায়ের পেয়ালায় তুফান তুললে সারদা। তুচ্ছ ব্যাপারটাকে কি ঘোরালো করেই তুলচো। জ্বর কি কারো হয় না? দুদিনেই ত সেরে গেল।

সারদা বলিল, সেরে যে গেলো ভগবানের সে দয়া আমাদের ওপর,—আপনাকে না। আসলে আপনি ভারী খারাপ লোক। বিষ খেয়ে মরতে গেলুম, দিলেন না,—হাসপাতালে দিন-রাত লেগে রইলেন। ফিরে এসে যে না খেয়ে মরবো তাতেও বাদ সাধলেন। একদিকে ত এই, আবার অন্যদিকে অসুখের মধ্যে যে একটুখানি সেবা করবো তাও আপনার সইলো না। চিরকাল কি এমনি শত্রুতাই করবেন, নিষ্কৃতি দেবেন না? কি করেছিলুম আপনার? এ জন্মের ত দোষ দেখিনে, একি গতজন্মের দণ্ড নাকি?

রাখাল জবাব দিতে পারিল না, অবাক হইয়া ভাবিল এই মুখচোরা ঠান্ডা মেয়েটাকে হঠাৎ এমন প্রগল্ভ করিয়া দিল কিসে!

সারদা থামিল না। দিনের বেলায় কড়া আলোতে এত কথা এমন অজস্র নিঃসঙ্কোচে সে কিছুতে বলিতে পারিত না, কিন্তু এ ছিল রাত্রিকাল—নিরালা গৃহের ছায়াচ্ছন্ন অভ্যন্তরে শুধু সে আর অন্য জন -আজ বুদ্ধি ছিল শিথিল তন্দ্রাতুর, তাই অন্তর্গূঢ় ভাবনা তাহার বাক্যের স্রোতঃপথে অবারিত হইয়া আসিল, হিতাহিতের তর্জনী শাসন ভ্রূক্ষেপ করিল না। বলিতে লাগিল, জানেন দেব্‌তা, জানি আমি, কেন আপনি আজো বিয়ে করেন নি। আসলে মেয়েদের ওপর আপনার ভারী ঘৃণা। কিন্তু এ-ও জানবেন যাদের আপনি এতকাল দেখেছেন, ফরমাস খেটেছেন, পিছু পিছু ঘুরেছেন, তারাই সমস্ত মেয়ে-জাতির নিরিখ নয়। জগতে অন্য মেয়েও আছে।

এবার রাখাল হাসিয়া ফেলিল, জিজ্ঞাসা করিল আজ তোমার হলো কি বলো ত?

সত্যি আজ আমার ভারী রাগ হয়েচে।

কেন?

কেন! কিসের জন্য আমাকে অসুখের খবর দেননি বলুন?

দিলেই বা কি হতো? সেখানে অন্য কোন মেয়ে নেই, একলা যেতে কি আমার সেবা করতে?

সারদা দৃপ্তচোখে কহিল, যেতুম না ত কি শুনে চুপ করে ঘরে বসে থাকতুম?

তোমার স্বামী বলতেন কি যখন ফিরে এসে শুনতেন এ কথা?

ফিরে আসবেন না তা আপনাকে অনেকবার বলেচি আপনি বলবেন তুমি জানলে কি করে? তার জবাব এই যে, আমি জানবো না ত সংসারে জানবে কে? এই বলিয়া সারদা ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া কহিল, এ ছাড়া আরো একটা কথা আছে। একাকী আপনার সেবা করতে যাওয়াটাই হতো আমার দোষের, কিন্তু এ বাড়িতেই বা কার ভরসায় আমাকে তিনি একলা ফেলে গেছেন? এই যে আপনি আমার ঘরে এসে বসেন যদি যেতে না দিই, ধরে রাখি, কে ঠেকাবে বলুন ত?

এ কি তামাশা! এমন কথা কোন মেয়ের মুখেই রাখাল কখনো শোনে নাই। বিশেষতঃ সারদা। গভীর লজ্জায় মুখ তাহার রাঙ্গা হইয়া উঠিল, কিন্তু প্রকাশ পাইলে সে লজ্জা বাড়িবে বৈ কমিবে না, তাই জোর করিয়া কোনমতে হাসির প্রয়াস করিয়া বলিল, একলা পেয়ে আমাকে ত অনেক কথাই বললে, কিন্তু সে থাকলে কি পারতে বলতে?

সারদা কহিল, বলার তখন ত দরকার হতো না। কিন্তু আজ এলে তাকে অন্য কথা বলতুম। বলতুম, যে সারদা তোমাকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসতো,—সে কত যে সয়েচে তার সাক্ষী আছেন শুধু ভগবান—যাকে বিয়ের নাম করে এনে ফাঁকি দিলে, এঁটো-পাতের মতো যাকে স্বচ্ছন্দে ফেলে গেলে, ফেরবার পথ যার কোথাও খোলা রাখোনি, সে সারদা আর নেই, সে বিষ খেয়ে মরেছে। নিজের নয়,—তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে। এ সারদা অন্য জন। তার পুনর্জন্মে তার 'পরে আর কারো দাবী নেই।

শুনিয়া রাখাল স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

সারদা বলিতে লাগিল, আপনার কি মনে নেই দেব্‌তা হাসপাতালে বিরক্ত হয়ে আপনি বার বার জিজ্ঞেসা করেচেন, তুমি কোথায় যেতে চাও; উত্তরে আমি বার বার কেঁদে বলেচি, আমার যাবার জায়গা কোথাও নেই। শুধু একটা স্থান ছিল—সেইখানেই চলেছিলুম—কিন্তু মাঝপথে সেই পথটাই দিলেন আপনি বন্ধ করে।

কিছুক্ষণ উভয়ের নিঃশব্দে কাটিল। রাখাল বলিল, জীবনবাবুকে চোখে দেখিনি, শুধু বাড়ির লোকের মুখে তাঁর নাম শুনেচি। তিনি কি তোমার স্বামী নন? সবই মিথ্যে?

হাঁ, সবই মিথ্যে। তিনি আমার স্বামী নন।

তবে কি তুমি বিধবা?

হাঁ, আমি বিধবা।

আবার কিছুকাল নীরবে কাটিল। সারদা জিজ্ঞাসা করিল, আমার কাহিনী শুনে কি আমার ওপর আপনার ঘৃণা জন্মালো?

রাখাল কহিল, না সারদা, আমি অতো অবুঝ নই। তোমার চেয়ে ঢের বেশী অপরাধ করিছিলেন নতুন-মা, আমি তাঁকেও ঘৃণা করিনি। কিন্তু বলিয়া ফেলিয়াই সে অত্যন্ত লজ্জার সঙ্গে চুপ করিল। তখনই বুঝিল, এ উল্লেখ অনধিকার-চর্চা, এ তাহার আপন অপমান। এ কি বিশ্রী কটু কথা মুখ দিয়া তাহার হঠাৎ বাহির হইয়া গেল!

সারদা বলিল, নতুন-মা আপনাকে মায়ের মতো মানুষ করেছিলেন—

রাখাল কহিল, হাঁ, তিনি আমার মা-ই ত। এই বলিয়া প্রসঙ্গটা সে তাড়াতাড়ি চাপা দিয়া কহিল, তোমার মা-বাপ আত্মীয়-স্বজন আছেন কিনা বলতে চাও না, অন্ততঃ তাঁদের কাছে যে যাবে না এ আমি নিশ্চয় বুঝেচি, কিন্তু কি এখন করবে?

সারদা বলিল, যা করচি তাই। নতুন-মার কাজ করবো।

কিন্তু এ কি তোমার চিরকাল ভালো লাগবে সারদা?

সারদা বলিল, দাসীবৃত্তি ত নয়—মায়ের সেবা। অন্ততঃ, বহুকাল ভালো লাগবে এ আমি জানি।

রাখাল বলিল, কিন্তু বহুকালের পরেও একটা কাল থাকে বাকী, তখন নিজের পায়ে দাঁড়াতে হয়, তাতে টাকার দরকার। নিছক সেবা করেই সে সমস্যার মীমাংসা হয় না।

সারদা বলিল, যত টাকারই দরকার হোক, আপনার কেরানীগিরি করতে আমি পারবো না। বরঞ্চ ছোট্ট একখানি চিঠি লিখে ফেলে রাখবো বিছানায়, কেউ একজন তা পড়ে টাকা লুকিয়ে রেখে যাবে আমার বালিশের নীচে। তাতেই আমার অভাব মিটবে।

রাখাল হাসিয়া বলিল, সে ত ভিক্ষে নেওয়া।

সারদাও হাসিল, বলিল, ভিক্ষেই নেবো। কেউ তা জানবে না—ঘুষ দিয়ে লোকে বলে না আমার লজ্জা কিসের?

রাখালের আবার ইচ্ছা হইল হাত ধরিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া আনে এবং এই ধৃষ্টতার জন্য শাস্তি দেয়। কিন্তু আবার সাহসে বাধিল,—সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল।

ঝি বাহির হইতে সাড়া দিয়া বলিল, দিদিমণি, মা ডাকচেন তোমাকে।

মার আহ্নিক কি শেষ হয়েচে?

হাঁ, হয়েছে; বলিয়া সে চলিয়া গেল।

সারদা কহিল, আপনি যাবেন না মার সঙ্গে দেখা করতে?

রাখাল কহিল, তুমি যাও, আমি পরে যাবো।

পরে কেন? চলুন না দুজনে একসঙ্গে যাই। বলিয়া সে চাপা-হাসির একটা তরঙ্গ তুলিয়া দ্বার খুলিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

রাখাল চোখ বুজিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। মনে হইল ঘরখানি যে রসে, মাধুর্যে নিবিড় হইয়া উঠিল সজীব মানুষের হাতের মতো সে তাহাকে সকল অঙ্গে স্পর্শ করিয়াছে, কতদিনের পরিচিত এই সামান্য গৃহখানির আজ যেন আর রহস্যের অন্ত নাই।

তাহার দেহ-মনে আজ এ কিসের আকুলতা, কিসের স্পন্দন? বক্ষের নিগূঢ় অন্তস্তলে এ কে কথা কয়? কি বলে? স্বর অস্ফুটে কানে আসে, ভাষা বুঝা যায় না কেন? কত শত মেয়েকে সে চেনে, কতদিনের কত আনন্দোৎসব তাহাদের সাহচর্যে গল্পে-গানে হাসিতে-কৌতুকে অবসিত হইয়াছে, তাহার স্মৃতি আজো অবলুপ্ত হয় নাই,—মনের কোণে খুঁজিলে আজো দেখা মিলে, কিন্তু সারদার—এই একটিমাত্র মেয়ের মুখের কথায় যে-বিস্ময় আজ মূর্তিতে উদ্ভাসিয়া উঠিল, এ-জীবনের অভিজ্ঞতায় কোথায় তাহার তুলনা? এই কি নারীর প্রণয়ের রূপ? তাহার ত্রিশ বর্ষ বয়সে সে অজানার আজই কি প্রথম দেখা মিলিল? এরই কি জয়গানের অন্ত নাই? এরই কলঙ্ক গাহিয়া আজও কি শেষ করা গেল না?

কিন্তু ভুল নাই, ভুল নাই,—সারদার মুখের কথায় ভুল বুঝিবার অবকাশ নাই। এমন সুনিশ্চিত নিঃসংশয়ে যে আপনি আসিয়া কাছে দাঁড়াইল, তাহাকে না বলিয়া ফিরাইবে সে কিসের সঙ্কোচে, কোন্ বৃহত্তরের আশায়? কিন্তু তবু দ্বিধা জাগে, মন পিছু হটিতে চায়। সংস্কার কুণ্ঠা জানাইয়া বলে, সারদা বিধবা, সারদা নিন্দিতা, স্বৈরাচারের কলঙ্ক-প্রলেপে সে মলিন। বন্ধু-সমাজে স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিবে সে কোন্ দুঃসাহসে? আবার তখনি মনে

পড়ে প্রথম দিনের কথা—সেই হাসপাতালে যাওয়া। মৃতকল্প নারীর পাংশু পাণ্ডুর মুখ, মরণের নীল ছায়া তাহার ওষ্ঠে, কপোলে, নিমীলিত চোখের পাতায় পাতায়—গাড়ির বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়া আসে পথের আলো—তার পরে যমে-মানুষে সে কি লড়াই! কি দুঃখে সেই প্রাণ ফিরিয়া পাওয়া! এ-সব কথা ভুলিবে রাখাল কি করিয়া? কি করিয়া ভুলিবে সে তাহারি হাতে সারদার সমস্ত সমর্পণ। সেই দু'চোখের জল মুছিয়া বলা—আর আমি মরবো না দেব্‌তা আপনার হুকুম না নিয়ে। সেদিন জবাবে রাখাল বলিয়াছিল—অংগীকার মনে থাকে যেন চিরদিন।

সেই দাসী আসিয়া বলিল, রাজুবাবু, মা ডাকচেন আপনাকে।

আমাকে? চকিত হইয়া রাখাল উঠিয়া বসিল। হাত দিয়া দেখিল চোখের জল গড়াইয়া বালিশের অনেকখানি ভিজিয়া উঠিয়াছে তাড়াতাড়ি সেটা উলটাইয়া রাখিয়া সে উপরে গিয়া নতুন-মার পায়ের ধুলো লইয়া অদূরে উপবেশন করিল। এতদিন না আসার কথা তাহার অসুখের কথা, কিছুই নতুন-মা উল্লেখ করিলেন না শুধু স্নেহার্দ্র স্নিগ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, ভালো আছো বাবা?

রাখাল মাথা নাড়িয়া সায় দিয়া বলিল, একটা মস্ত বড় অপরাধ হয়ে গেছে মা, আমাকে মার্জনা করতে হবে। কয়েকদিন জ্বরে ভুগলুম, আপনাকে খবর দিতে পারিনি।

নতুন-মা কোন উত্তর না দিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। রাখাল বলিতে লাগিল, ওটা ইচ্ছে করেও না, আপনাদের আঘাত দিতেও না। মনে পড়ে মা, একদিন যত জ্বালাতন আমি করেছি তত আপনার রেণুও না। তার পরে হঠাৎ একদিন পৃথিবী গেল বদলে—সংসারে এত ঝড়-বাদল যে তোলা ছিল সে তখনি শুধু টের পেলুম। ঠাকুরঘরে গিয়ে কেঁদে বলতুম, গোবিন্দ, আর ত সইতে পারিনে, আমাদের মাকে ফিরিয়ে এনে দাও। আমার প্রার্থনা এতদিনে ঠাকুর মঞ্জুর করেছেন। আমার সেই মাকেই করবো অসম্মান এমন কথা আপনি কি করে ভাবতে পারলেন মা?

এবার নতুন-মা আস্তে আস্তে বলিলেন, তবে কিসের অভিমানে খবর দাওনি বাবা? দরোয়ানকে পাঠিয়ে যখন খোঁজ নিতে গেলুম তখন কিছু করবারই আর পথ রাখোনি।

রাখাল সহাস্যে কহিল, সেটা শুধু ভুলের জন্যে। অভ্যাস ত নেই, দুঃখের দিনে মনেই পড়ে না মা, ত্রিসংসারে আমার কোথায় কেউ আছে।

নতুন-মা উত্তর দিলেন না—কেবল তাহার একটা হাত ধরিয়া আরো কাছে টানিয়া আনিয়া গভীর স্নেহে তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া দিলেন।

সারদা আড়াল হইতে বোধ হয় শুনিতেছিল, সুমুখে আসিয়া বলিল, দেব্‌তাকে খেয়ে যেতে বলুন না মা, সেই ত বাসায় গিয়ে ওঁকে নিজেই রাঁধতে হবে।

নতুন-মা বলিলেন, আমি কেন সারদা, তুমি নিজেই ত বলতে পারো মা। তার পরে স্মিতহাস্যে কহিলেন, এই কথাটি ও প্রায় বলে রাজু। তোমাকে যে আপনি রাঁধতে হয় এ যেন ও সইতে পারে না—ওর বুকে বাজে। ওকে বাঁচিয়েছিলে একদিন এ কথা সারদা একটি দিন ভোলে না।

পলকের জন্য রাখাল লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল, তিনি বলিতে লাগিলেন এমন স্ত্রীকে যে কি করে তার স্বামী ফেলে দিয়ে গেলো আমি তাই শুধু ভাবি। যত অঘটন কি বিধাতা মেয়েদের ভাগ্যেই লিখে দেন! এবং বলার সংগে সংগেই তাঁহার মুখ দিয়া দীর্ঘশ্বাস পড়িল।

সারদা কহিল, এইবার ওঁকে একটি বিয়ে করতে বলুন মা। আপনার আদেশকে উনি কখনো না বলতে পারবেন্ না।

সবিতা কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু রাখাল তাড়াতাড়ি বাধা দিল। বলিল, তুমি আমাকে মোটে দু-চারদিন দেখচো, কিন্তু উনি করেচেন আমাকে মানুষ—আমার ধাত চেনেন। বেশ জানেন, ওর না আছে বাড়িঘর, না আছে আত্মীয়-স্বজন, না আছে উপার্জন করার শক্তি-সামর্থ্য। ও বড় অক্ষম, কোনমতে ছেলে পড়িয়ে দু'বেলা দুটো অন্নের উপায় করে। ওকে মেয়ে দেওয়া শুধু মেয়েটাকে জবাই করা। এমন অন্যায় আদেশ মা কখনো দেবেন না।

সারদা বলিল, কিন্তু, দিলে?

রাখাল বলিল, দিলে বুঝবো এ আমার নির্যাতি।

ঠাকুর আসিয়া খবর দিল খাবার তৈরী হইয়াছে। রাখাল বুঝিল, এ আয়োজন সারদা উপরে আসিয়াই করিয়াছে।

বহুকালের পরে সবিতা তাহাকে খাওয়াইতে বসিলেন। বলিলেন, রাজু, তারক যেখানে চাকরি করে সে গ্রামটি নাকি একেবারে দামোদরের তীরে। আমাকে ধরেছে দিন-কয়েক গিয়ে তার ওখানে থাকি। স্থির করেচি যাবো।

প্রস্তাব করে সে চিঠি লিখেচে নাকি?

চিঠিতে নয়, দিন-দুয়ের ছুটি নিয়ে সে নিজে এসেছিল বলতে। বড় ভালো ছেলে। যেমন বিনয়ী তেমনি বিদ্বান। সংসারে ও উন্নতি করবেই।

রাখাল সবিস্ময়ে মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, তারক এসেছিলো কলকাতায়? কৈ আমি ত জানিনে!

সবিতা বলিলেন, জানো না? তবে বোধ করি দেখা করার সময় করতে পারেনি। শুধু দুটো দিনের ছুটি কিনা!

রাখাল আর কিছু বলিল না, মাথা হেঁট করিয়া অন্নের গ্রাস মাখিতে লাগিল। তাহার মনে পড়িল অসুখের পূর্বের দিনই সে তারককে একখানা পত্র লিখিয়াছে; তাহাতে বলিয়াছে, ইদানীং শরীরটা কিছু মন্দ চলিতেছে, তাহার সাধ হয় দিন-কয়েকের ছুটি লইয়া পল্লীগ্রামে গিয়া বন্ধুর বাড়িতে কাটাইয়া আসে। সে চিঠির জবাব এখনো আসে নাই।

তেরো

সেদিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পরে বাসায় ফিরিবার সময়ে সারদা সঙ্গে সঙ্গে নীচে নামিয়া আসিয়াছিল, ভারী অনুরোধ করিয়া বলিয়াছিল, আমার বড় ইচ্ছে আপনাকে এক-দিন নিজে রেঁধে খাওয়াই। খাবেন একদিন দেব্‌তা?

খাবো বৈ কি। যেদিন বলবে।

তবে পরশু। এমনি সময়ে। চুপি চুপি আমার ঘরে আসবেন, চুপি চুপি খেয়ে চলে যাবেন। কেউ জানবে না, কেউ শুনবে না।

রাখাল সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, চুপি চুপি কেন? তুমি আমাকে খাওয়াবে এতে দোষ কি?

সারদাও হাসিয়া জবাব দিয়াছিল, দোষ ত খাওয়ার মধ্যে নেই দেব্‌তা, দোষ আছে চুপি-চুপি খাওয়ানোর মধ্যে। অথচ নিজে ছাড়া আর কাউকে না জানতে দেবার লোভ যে ছাড়তে পারিনি।

সত্যি পারো না, না বলতে হয় তাই বলচো?

অত জেরার জবাব আমি দিতে পারবো না, বলিয়া সারদা হাসিয়া মুখ ফিরাইল।

রাখালের বুকের কাছটা শিহরিয়া উঠিল, বলিল, বেশ, তাই হবে—পরশুই আসবো। বলিয়াই দ্রুতপদে বাহির হইয়া পড়িল।

সেই পরশু আজ আসিয়াছে। রাত্রি বেশী নয়, বোধ হয় আটটা বাজিয়াছে। সকলেই কাজে ব্যস্ত, রাখালকে বোধ হয় কেহ লক্ষ্য করিল না। রান্নার কাজ শেষ করিয়া সারদা চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, রাখালকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বিছানায় বসিতে দিল, বলিল, আমি ভেবেছিলুম হয়তো আপনার রাত হবে, কিংবা হয়তো ভুলেই যাবেন, আসবেন না।

ভুলে যাবো এ তুমি কখনো ভাবোনি সারদা, এ তোমার মিছে কথা।

সারদা হাসিমুখে মাথা নাড়িয়া কহিল, হাঁ, আমার মিছে কথা। একবারও ভাবিনি আপনি ভুলে যাবেন। খেতে দিই?

দাও।

হাতের কাছে সমস্ত প্রস্তুত ছিল, আসন পাতিয়া সে খাইতে দিল। পরিমিত আয়োজন,

রাখাল স্বীকার করিল, না, আমি পারতাম না সারদা—আমার গায়ে জোর নেই—আমি বড় দুর্বল।

কিন্তু এ-ও কি কপালের লেখা? তার মানে আপনি কখনো চেষ্টা করেন নি। তারকবাবু বলছিলেন, চেষ্টায় সমস্ত হয়, সব-কিছু সংসারে মেলে।

এ কথায় রাখাল হাসিয়া বলিল, কিন্তু সেই চেষ্টাটাই যে কোন্ চেষ্টায় মেলে তাকে জিজ্ঞেসা করলে না কেন? তার জবাবটা হয়তো আমার কাজে লাগতো।

শুনিয়া সারদাও হাসিল, বলিল, বেশ জিজ্ঞেসা করবো; কিন্তু এ কেবল আপনার কথার ঘোর-ফের,—আসলে সত্যিও নয়, তাঁর জবাবও আপনার কোন কাজে লাগবে না। কিন্তু আমার মনে হয় তাঁর ওপর আপনি রাগ করে আছেন—না?

রাখাল সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, আমি রাগ করে আছি তারকের ওপর? এ সন্দেহ তোমার হলো কি করে?

কি জানি কি করে হলো, কিন্তু হয়েচে তাই বললুম।

রাখাল চুপ করিয়া রহিল, আর প্রতিবাদ করিল না।

সারদা বলিতে লাগিল, তাঁর ইচ্ছে নয় আর গ্রামে থাকা। একটা ছোট্ট জায়গার ছোট্ট ইস্কুলে ছেলে পড়িয়ে জীবন ক্ষয় করতে তিনি নারাজ। সেখানে বড় হবার সুযোগ নেই, সেখানে শক্তি হয়েচে সংকুচিত, বুদ্ধি রয়েচে মাথা হেঁট করে, তাই শহরে ফিরে আসতে চান। এখানে উঁচু হয়ে দাঁড়ানো তাঁর কাছে কিছুই শক্ত নয়।

রাখাল আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কথাগুলো কি তোমার, না তার সারদা?

না আমার নয়, তাঁরই মুখের কথা। মাকে বলছিলেন আমি শুনেচি।

শুনে নতুন-মা কি বললেন?

শুনে মা খুশীই হলেন। বললেন, তার মতো ছেলের গ্রামে পড়ে থাকা অন্যায়। থাকতে যেন না হয় এ তিনি করবেন।

করবেন কি করে?

সারদা বলিল, শক্ত নয় ত দেবতা। মা বিমলবাবুকে বললে না হতে পারে এমন ত কিছু নেই।

শুনিয়া রাখাল তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল। অর্থাৎ, জিজ্ঞাসা করিতে চাহিল ইহার তাৎপর্য কি?

সারদা বুঝিল আজও রাখাল কিছুই জানে না। বলিল, খাওয়া হয়ে গেছে, হাত ধুয়ে এসে বসুন আমি বলচি।

মিনিট-কয়েক পরে হাতমুখ ধুইয়া সে বিছানায় আসিয়া বসিল। সারদা তাহাকে জল দিল, পান দিল, তার পরে অদূরে মেঝের উপরে বসিয়া বলিল, রমণীবাবু চলে গেছেন আপনি জানেন?

চলে গেছেন? কৈ না! কোথায় গেছেন?

কোথায় গেছেন সে তিনিই জানেন, কিন্তু এখানে আর আসেন না। যেতে তাঁকে হতোই—এ ভার বইবার আর তাঁর জোর ছিল না—কিন্তু গেলেন মিথ্যে ছল করে। এতখানি ছোট হয়ে বোধ করি আমার কাছে থেকে জীবনবাবুও যায়নি। এই বলিয়া সে সেদিন হইতে আজ পর্যন্ত আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া কহিল, এ ঘটতোই, কিন্তু উপলক্ষ্য হলেন আপনি। সেই যে রেণুর অসুখে পরের নামে টাকা ভিক্ষে চাইতে এলেন, আর না পেয়ে অভুক্ত চলে গেলেন, এ অন্যায় মাকে ভেঙ্গে গুঁড়লো, এ ব্যথা তিনি আজও ভুলতে পারলেন না। আমাকে ডেকে বললেন, সারদা, রাজুকে আজ আমার চাই-ই, নইলে বাঁচবো না। এসো তুমি আমার সঙ্গে। যা-কিছু মায়ের ছিল পুঁটুলিতে বেঁধে নিয়ে আমরা লুকিয়ে গেলুম আপনার বাসায়, তার পরে গেলুম ব্রজবাবুর বাড়ি, কিন্তু সব খালি, সব শূন্য! নোটিশ ঝুলছে বাড়ি ভাড়া দেবার। জানা গেল না কিছুই, বুঝা গেল শুধু কোথায় কোন্ অজানা গৃহে মেয়ে তাঁর পীড়িত, অর্থ নেই ওষুধ দেবার, লোক নেই সেবা করার। হয়তো বেঁচে আছে, হয়তো বা নেই। অথচ উপায় নেই সেখানে যাবার—পথের চিহ্ন গেছে নিঃশেষে মুছে।

মাকে নিয়ে ফিরে এলুম। তখন বাইরের ঘরে চলেছে খাওয়া-দাওয়া নাচ-গান আনন্দ-কলরব। করবার কিছু নেই, কেবল বিছানায় শুয়ে দু'চোখ বেয়ে তাঁর অবিরল জল পড়তে লাগলো। শিয়রে বসে নিঃশব্দে শুধু মাথায় হাত বুলোতে লাগলুম—এ-ছাড়া সান্ত্বনা দেবার তাঁকে ছিলই বা আমার কি!

সেদিন বিমলবাবু ছিলেন সামান্য-পরিচিত আমন্ত্রিত অতিথি, তাঁরই সম্মাননার উদ্দেশ্যে ছিল আনন্দ-অনুষ্ঠান। রমণীবাবু এলেন ঘরের মধ্যে তেড়ে, বললেন, চলো সভায়। মা বললেন, না, আমি অসুস্থ। তিনি বললেন, বিমলবাবু কোটীপতি ধনী, তিনি আমার মনিব, নিজে আসবেন এই ঘরে দেখা করতে। মা বললেন, না, সে হবে না। এতে অতিথির কত যে অসম্মান সে কথা মা না জানতেন তা নয়, কিন্তু অনুশোচনায়, ব্যথায়, অন্তরের গোপন ধিক্কারে তখন মুখ-দেখানো ছিল বোধ করি অসম্ভব। কিন্তু দেখাতে হলো। বিমলবাবু নিজে এসে ঢুকলেন ঘরে। প্রশান্ত সৌম্য মূর্তি, কথাগুলি মৃদু, বললেন, অনধিকার প্রবেশের অন্যায় হলো বুঝি, কিন্তু যাবার আগে না এসেও পারলাম না। কেমন আছেন বলুন? মা বললেন, ভালো আছি। তিনি বললেন, ওটা রাগের কথা, ভালো আপনি নেই। কিছুকাল আগে ছবি আপনার দেখেচি আর আজ দেখচি সশরীরে। কত যে প্রভেদ সে আমিই বুঝি। এ চলতে পারে না, শরীর ভালো আপনাকে করতেই হবে। যাবেন একবার সিংগাপুরে? সেখানে আমি থাকি—সমুদ্রের কাছাকাছি একটা বাড়ি আছে আমার। হাওয়ারও শেষ নেই, আলোরও সীমা নেই। পূর্বের দেহ আবার ফিরে আসবে,- চলুন।

মা শুধু জবাব দিলেন, না।

না কেন? প্রার্থনা আমার রাখবেন না?

মা চুপ করে রইলেন। যাবার উপায় ত নেই, মেয়ে যে পীড়িত, স্বামী যে গৃহহীন।

সেদিন রমণীবাবু ছিলেন মদ খেয়ে অপ্রকৃতিস্থ, জ্বলে উঠে বললেন, যেতেই হবে। আমি হুকুম করচি যেতে হবে তোমাকে।

না, আমি যেতে পারবো না।

তার পরে শুরু হলো অপমান আর কটু কথার ঝড়। সে যে কত কটু আমি বলতে পারবো না দেব্‌তা। ঘূর্ণি হাওয়ায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জড়ো করে তুললে যেখানে যত ছিল নোংরামির আবর্জনা—প্রকাশ পেতে দেরি হলো না যে, মা ও-লোকটার স্ত্রী নয়—রক্ষিতা। সতীর মুখোশ পরে ছদ্মবেশে রয়েচে শুধু একটা গণিকা। তখন আমি একপাশে দাঁড়িয়ে, নিজের কথা মনে করে ভাবলুম, পৃথিবী দ্বিধা হও। মেয়েদের এ-যে এতবড় দুর্গতি তার আগে কে জানতো দেব্‌তা?

রাখাল নিষ্পলক-চক্ষে এতক্ষণ তাহার প্রতি চাহিয়াছিল, এবার ক্ষণিকের জন্য একবার চোখ ফিরাইল।

সারদা বলিতে লাগিল, মা স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন যেন পাথরের মূর্তি! রমণীবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, যাবে কিনা বলো? ভাবচো কি বসে?

মার কণ্ঠস্বর পূর্বের চেয়েও মৃদু হয়ে এলো, বললেন, ভাবচি কি জানো সেজবাবু, ভাবচি শুধু বারো বছর তোমার কাছে আমার কাটলো কি করে? ঘুমিয়ে কি স্বপ্ন দেখছিলুম? কিন্তু আর না, ঘুম আমার ভেঙ্গেচে। আর তুমি এসো না এ-বাড়িতে, আর যেন না আমরা কেউ কারো মুখ দেখতে পাই। বলতে বলতে তাঁর সর্বাঙ্গ যেন ঘৃণায় বার বার শিউরে উঠলো।

রমণীবাবু এবার পাগল হয়ে গেলেন, বললেন, এ-বাড়ি কার? আমার। তোমাকে দিইনি।

মা বললেন, সেই ভালো যে তুমি দাওনি। এ-বাড়ি আমার নয় তোমারই। কালই ছেড়ে দিয়ে আমি চলে যাবো। কিন্তু এ জবাব রমণীবাবু আশা করেন নি, হঠাৎ মার মুখের পানে চেয়ে তাঁর চৈতন্য হলো—ভয় পেয়ে নানাভাবে তখন বোঝাতে চাইলেন এ শুধু রাগের কথা, এর কোন মানে নেই।

মা বললেন, মানে আছে সেজবাবু। সম্বন্ধ আমাদের শেষ হয়েচে, কিছুতেই সে আর ফিরবে না।

রাত্রি হয়ে এলো, রমণীবাবু চলে গেলেন। যে উৎসব সকালে এত সমারোহে আরম্ভ হয়েছিল সে যে এমনি করে শেষ হবে তা কে ভেবেছিল।

রাখাল কহিল, তারপরে?

সারদা বলিল, এগুলো ছোট, কিন্তু তার পরেরটাই বড় কথা দেব্‌তা। বিমলবাবুর অভ্যর্থনা বাইরের দিক দিয়ে সেদিন পণ্ড হয়ে গেল বটে, কিন্তু অন্তরের দিক দিয়ে আর এক রূপে সে ফিরে এলো। মার অপমান তাঁর কি-যে লাগলো—তিনি ছিলেন পর—হলেন একান্ত আত্মীয়। আজ তাঁর চেয়ে বন্ধু আমাদের নেই। রমণীবাবুকে টাকা দিয়ে তিনি বাড়ি কিনে নিয়ে মাকে ফিরিয়ে দিলেন, নইলে আজ আমাদের কোথায় যেতে হতো কে জানে।

কিন্তু এই খবরটা রাখালকে খুশী করিতে পারিল না, তাহার মন যেন দমিয়া গেল। বলিল, বিমলবাবুর অনেক টাকা, তিনি দিতে পারেন। এ হয়তো তাঁর কাছে কিছুই নয় কিন্তু নতুন-মা নিলেন কি করে? পরের কাছে দান নেওয়া ত তাঁর প্রকৃতি নয়'

সারদা বলিল, হয়তো তিনি আর পর নয়, হয়তো নেওয়ার চেয়ে না নেওয়ার অন্যায় হতো ঢের বেশী।

রাখাল বলিল, এ ভাবে বুঝতে শিখলে সুবিধে হয় বটে, কিন্তু বোঝা আমার পক্ষে কঠিন। এই বলিয়া এবার সে জোর করিয়া হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, রাত হলো, আমি চললুম। তোমরা ফিরে এলে আবার হয়তো দেখা হবে।

সারদা তড়িৎবেগে উঠিয়া পথ আগুলিয়া দাঁড়াইল, বলিল, না, এমন করে হঠাৎ চলে যেতে আমি কখনো দেবো না।

তুমি হঠাৎ বলো কাকে? রাত হলো যে—যাবো না?

যাবেন জানি, কিন্তু মার সঙ্গে দেখা করেও যাবেন না?

আমাকে তাঁর কিসের প্রয়োজন? দেখা করার শর্তও ত ছিল না। চুপি চুপি এসে তেমনি চুপি চুপি চলে যাবো এই ত ছিল কথা।

সারদা বলিল, না, সে শর্ত আর আমি মানবো না। দেখার প্রয়োজন নেই বলচেন? মার নিজের না থাক আপনারও কি নেই?

রাখাল বলিল, যে প্রয়োজন আমার সে রইলো অন্তরে--সে কখনো ঘুচবে না, -কিন্তু বাইরের প্রয়োজন আর দেখতে পাইনে সারদা।

চাপিবার চেষ্টা করিয়াও গূঢ় বেদনা সে চাপা দিতে পারিল না, কণ্ঠস্বরে ধরা পড়িল। তাহার মুখের প্রতি চোখ পাতিয়া সারদা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তার পরে ধীরে ধীরে বলিল, আজ একটা প্রার্থনা করি দেব্‌তা, ক্ষুদ্রতা ঈর্ষা আর যেখানেই থাক আপনার মনে যেন না থাকে। দেব্‌তা বলে ডাকি, দেব্‌তা বলেই যেন চিরদিন ভাবতে পারি। চলুন মার কাছে, আপনি না বললে যে তাঁর যাওয়া হবে না।

আমি না বললে যাওয়া হবে না? তার মানে?

মানে আমিও জিজ্ঞাসা করেছিলুম। মা বললেন, ছেলে বড় হলে তার মত নিতে হয় মা। জানি, রাজু বারণ করবে না, কিন্তু সে হুকুম না দিলেও যেতে পারবো না সারদা।

এ কথা শুনিয়া রাখাল নিরুত্তরে স্তব্ধ হইয়া রহিল। বুকের মধ্যে যে জ্বালা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তাহা নিভিতে চাহিল না, তথাপি দু'চোখ অশ্রু-সজল হইয়া আসিল, বলিল, তাঁর কাছে সহজে যেতে পারি এ সাহস আজ মনের মধ্যে খুঁজে পাইনে সারদা, কিন্তু বলো তাঁকে, কাল আসবো পায়ের ধুলো নিতে। বলিয়াই সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল, উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিল না।

চোদ্দ

তারক আসিয়াছে লইতে। আজ শনিবারের রাত্রিটা সে এখানে থাকিয়া কাল দুপুরের ট্রেনে নতুন-মাকে লইয়া যাত্রা করিবে। সঙ্গে যাইবে জন-দুই দাসী-চাকর এবং সারদা। তাহার হরিণপুরের বাসাটা তারক সাধ্যমতো সুব্যবস্থিত করিয়া আসিয়াছে। পল্লীগ্রামে নগরের সকল সুবিধা পাইবার নয়, তথাপি আমন্ত্রিত অতিথিদের ক্লেশ না হয়, তাঁহাদের

অভ্যস্ত জীবন-যাত্রায় এখানে আসিয়া বিপর্যয় না ঘটে, এদিকে তাহার খর দৃষ্টি ছিল। আসিয়া পর্যন্ত বারে বারে সেই আলোচনাই হইতেছিল। নতুন-মা যতই বলেন, আমি গৃহস্থ-ঘরের মেয়ে বাবা, পাড়াগাঁয়েই জন্মেচি, আমার জন্যে তোমার ভাবনা নেই। তারক ততই সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলে, বিশ্বাস করতে মন চায় না মা, যে-কষ্ট সাধারণ দশজনের সহ্য হয় আপনারও তা সইবে। ভয় হয়, মুখে কিছুই বলবেন না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে শরীর ভেঙ্গে যাবে।

ভাঙ্গবে না তারক, ভাঙ্গবে না। আমি ভালোই থাকবো।

তাই হোক মা। কিন্তু দেহ যদি ভাঙ্গে আপনাকে আমি ক্ষমা করবো না তা বলে রাখচি।

নতুন-মা হাসিয়া বলিলেন, তাই সই। তুমি দেখো, আমি মোটা হয়ে ফিরে আসবো।

তথাপি পল্লীগ্রামের কত ছোট ছোট অসুবিধার কথা তারকের মনে আসে। নানাবিধ খাদ্য-সামগ্রী সে যথাসাধ্য ভালোই সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু খাওয়াই ত সব নয়। গোটা-দুই জোর আলো চাই, রাত্রে চলাফেরায় উঠানের কোথাও না লেশমাত্র ছায়া পড়িতে পারে। একটা ভালো ফিলটারের প্রয়োজন, খাবার বাসনগুলোর কিছু কিছু অদল-বদল আবশ্যক। জানালার পর্দাগুলো কাচাইয়া রাখিয়াছে বটে, তবু নতুন গোটা-কয়েক কিনিয়া লওয়া দরকার। নতুন-মা চা খান না সত্য, কিন্তু কোনদিন ইচ্ছা হইতেও পারে। তখন ঐ কষ-লাগা কানা-ভাঙ্গা পাত্রগুলো কি কাজে আসিবে? এক-সেট নূতন চাই। আহ্নিকের সাজসজ্জা ত কিনিতেই হইবে। ভালো ধূপ পাড়াগাঁয়ে মিলে না—সে ভুলিলে চলিবে না। এমনি কত-কি প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় ছোট-খাটো জিনিসপত্র সংগ্রহ করিতে সে বাজারে চলিয়া গেছে, এখনো ফিরে নাই।

বাক্স-বিছানা বাঁধাছাঁদা চলিতেছে, কালকের জন্য ফেলিয়া রাখার পক্ষপাতী সারদা নয়। বিমলবাবু আসিলেন দেখা করিতে। প্রত্যহ যেমন আসেন তেমনি। জিজ্ঞাসা করিলেন, নতুন-বৌ, কতদিন থাকবে সেখানে?

সবিতা বলিল, যতদিন থাকতে বলবে তুমি ততদিন। তার একটি মিনিটও বেশী নয়।

কিন্তু এ কথা কেউ শুনলে যে তার অন্য মানে করবে নতুন-বৌ!

অর্থাৎ নতুন-বৌয়ের নতুন কলঙ্ক রটবে, এই তোমার ভয়,--না? এই বলিয়া সবিতা একটুখানি হাসিল।

শুনিয়া বিমলবাবুও হাসিলেন, ভয় ত আছেই। কিন্তু আমি সে হতে দেবো কেন?

দেবে না বলেই ত জানি, আর সেই ত আমার ভরসা। এতদিন নিজের খেয়াল আর বুদ্ধি দিয়েই চলে দেখলুম, এবার ভেবেচি তাদের ছুটি দেবো। দিয়ে দেখি কি মেলে, আর কোথায় গিয়ে দাঁড়াই।

বিমলবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। সবিতা বলিতে লাগিল, তুমি হয়ত ভাবচো হঠাৎ এ বুদ্ধি দিলে কে? কেউ দেয়নি। সেদিন তুমি চলে গেলে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলুম পথের বাঁকে তোমার গাড়ি হলো অদৃশ্য, চোখের কাজ শেষ হলো, কিন্তু মন নিলে তোমার পিছু। সঙ্গে সঙ্গে কতদূর যে গেলো তার ঠিকানা নেই। ফিরে এসে ঘরে বসলুম —একলা নিজের মনে ছেলেবেলা থেকে সেই সে-দিন পর্যন্ত কত ভাবনাই এলো গেলো, হঠাৎ একসময় আমার মন কি বলে উঠলো জানো? বললে, সবিতা, তোমার যৌবন গেছে, রূপ ত আর নেই! তবুও যদি উনি ভালোবেসে থাকেন সে তাঁর মোহ নয়, সে সত্যি। সত্য কখনো বঞ্চনা করে না—তাকে তোমার ভয় নেই। যা নিজে মিথ্যে নয়, সে কিছুতে তোমার মাথায় মিথ্যে অকল্যাণ এনে দেবে না,—তাকে বিশ্বাস করো।

বিমলবাবু বলিলেন, তোমাকে সত্যি ভালোবাসতে পারি, এ তুমি বিশ্বাস করো নতুন-বৌ?

হাঁ করি। নইলে ত তোমার কোন দরকার ছিল না। আমার ত আর রূপ নেই।

বিমলবাবু হাসিয়া বলিলেন, এমন ত হতে পারে আমার চোখে তোমার রূপের সীমা নেই। অথচ রূপ আমি সংসারে কম দেখিনি নতুন-বৌ।

শুনিয়া সবিতাও হাসিল, বলিল, আশ্চর্য মানুষ তুমি। এ-ছাড়া আর কি বলবো তোমাকে?

বিমলবাবু বলিলেন, তুমি নিজেও কম আশ্চর্য নয় নতুন-বৌ! এই ত সেদিন এমন ক'রে ঠকলে, এতবড় আঘাত পেলে, তবু যে কি করে এত শীঘ্র আমাকে বিশ্বাস করলে আমি তাই শুধু ভাবি।

সবিতা কহিল, আঘাত পেয়েচি সত্যি, কিন্তু ঠকিনি। কুয়াশার আড়ালে একটানা দিনগুলো অবাধে বয়ে যাচ্ছিল এই তোমরা দেখেচো। হয়তো এমনিই চিরদিন বয়ে যেতো—যাবজ্জীবন দণ্ডিত কয়েদীর জীবন যেমন করে কেটে যায় জেলের মধ্যে, কিন্তু হঠাৎ উঠলো ঝড়, কুয়াশা গেল কেটে, জেলের প্রাচীর পড়লো ভেঙেচুরে। বেরিয়ে এলুম অজানা পথের 'পরে, কিন্তু কোথায় ছিলে তুমি অপরিচিত বন্ধু, হাত বাড়িয়ে দিলে। এ-কে কি ঠকা বলে? কিন্তু কি বলে তোমাকে ডাকি বলো ত?

আমার নামটা বুঝি বলতে চাও না?

না, মুখে বাধে।

বিমলবাবু বলিলেন, ছেলেবেলায় আমার আর একটা নাম ছিল দিদিমার দেওয়া। তার ইতিহাস আছে। কিন্তু সে নামটা যে তোমার মুখে আরো বেশী বাধবে নতুন-বৌ!

কি বলো ত, দেখি যদি মনে ধরে।

বিমলবাবু হাসিয়া বলিলেন, পাড়ায় তারা ডাকতো আমাকে দয়াময় বলে।

সবিতা বলিল, নামের ইতিহাস জানতে চাইনে,—সে আমি বানিয়ে নেবো। ভারী পছন্দ হয়েচে নামটি—এখন থেকে আমিও ডাকবো দয়াময় বলে।

বিমলবাবু বলিলেন, তাই ডেকো। কিন্তু যা জিজ্ঞেসা করেছিলুম সে ত বললে না?

কি জিজ্ঞেসা করেছিলে দয়াময়?

এত শীঘ্র আমাকে ভালোবাসলে কি করে?

সবিতা ক্ষণকাল তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া কহিল, ভালোবাসি এ কথা তো বলিনি। বলেচি, তুমি বন্ধু, তোমাকে বিশ্বাস করি। বলেচি, যে ভালোবাসে তার হাত থেকে কখনো অকল্যাণ আসে না।

উভয়েই ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। সবিতা কুণ্ঠিতস্বরে কহিল, কিন্তু আমার কথা শুনে চুপ করে রইলে যে তুমি? কিছু বললে না ত?

বিমলবাবু প্রত্যুত্তরে একটুখানি শুষ্ক হাসিয়া বলিলেন, বলবার কিছুই নেই নতুন-বৌ,—তুমি ঠিক কথাই বলেচো। ভালোবাসার ধনকে সত্যিই কেউ আপন হাতে অমঙ্গল এনে দিতে পারে না। তার নিজের দুঃখ যতই হোক না, সইতে তাকে হ'বেই।

সবিতা কহিল, কেবল সইতে পারাই ত নয়। তুমি দুঃখ পেলে আমিও পাবো যে।

বিমলবাবু আবার একটু হাসিয়া বলিলেন, পাওয়া উচিত নয় নতুন-বৌ। তবু যদি পাও, তখন এই কথা ভেবো যে, অকল্যাণের দুঃখ এর চেয়েও বেশী।

এ কথা কি তোমার পক্ষেও খাটে দয়াময়?

না, খাটে না। তার কারণ, আমার মনের মধ্যে তুমি কল্যাণের প্রতিমূর্তি, কিন্তু তোমার কাছে আমি তা নয়। হতেও পারিনে। কিন্তু সেজন্যে তোমাকে দোষও দিইনে, অভিমানও করিনে, জানি নানা কারণে এমনিই জগৎ। তুমি এলে আমার বিগত দিনের ত্রুটি যেতো ঘুচে, ভবিষ্যৎ হতো উজ্জ্বল, মধুর শান্ত, তার কল্যাণ ব্যাপ্ত হতো নানাদিকে—আমাকে করে তুলতো অনেক বড়—

কিন্তু আমি নিজে দাঁড়াবো কোন্‌খানে?

তুমি নিজে দাঁড়াবে কোন্‌খানে? বিমলবাবু একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেলেন। কয়েক মুহূর্ত স্থির থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, সে-ও বুঝতে পারি নতুন-বৌ। তুমি হয়ে যাবে অপরের চোখে ছোট, তারা বলবে তোমাকে লোভী, বলবে—আরও যে-সব কথা তা ভাবতেও আমার লজ্জা করে। অথচ, একান্ত বিশ্বাসে জানি একটি কথাও তার সত্য নয় তার থেকে তুমি অনেক দূরে—অনেক উপরে।

সবিতার চোখ সজল হইয়া আসিল। এমন সময়েও যে লোক মিথ্যা বলিতে পারিল না,

তাহার প্রতি শ্রদ্ধায় ও কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, দয়াময়, আমি আনবো তোমার জীবনে পরিপূর্ণ কল্যাণ, আর তুমি এনে দেবে আমাকে তেমনি পরিপূর্ণ অকল্যাণ, —এমন বিপরীত ঘটনা কি ক'রে সত্যি হয়? কি এর উত্তর?

বিমলবাবু বলিলেন, এর উত্তর আমার দেবার নয় নতুন-বৌ। আমার কাছে এই আমার বিশ্বাস। তোমার কাছেও এমনি বিশ্বাস যদি কখনো সত্য হয়ে দেখা দেয়, তখনি কেবল মনের দ্বন্দ্ব ঘুচবে, এর উত্তর পাবে,—তার আগে নয়।

সবিতা কহিল, উত্তর যদি কখনো না পাই, সংশয় যদি না ঘোচে, তোমার বিশ্বাস এবং আমার বিশ্বাস যদি চিরদিন এমনি উলটো মুখেই বয়, তবু তুমি আমার ভার বয়ে বেড়াবে?

বিমলবাবু বলিলেন, যদি উলটো মুখেই বয়, তবু তোমাকে আমি দোষ দেবো না। তোমার ভার আজ আমার ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য, আমার আনন্দের সেবা। কিন্তু এ ঐশ্বর্য যদি কখনো ক্লান্তির বোঝা হয়ে দেখা দেয়, সেদিন তোমার কাছে আমি ছুটি চাইবো। আবেদন মঞ্জুর করো, বন্ধুর মতোই বিদায় নিয়ে যাবো,—কোথাও মালিন্যের চিহ্নমাত্র রেখে যাবো না তোমার কাছে এই শপথ করলাম নতুন-বৌ।

সবিতা তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। মিনিট দুই-তিন পরে বিমলবাবু ম্লান হাসিয়া বলিলেন, কি ভাবছো বলো ত?

ভাবচি সংসারে এমন ভয়ানক সমস্যার উদ্ভব হয় কেন? একের ভালবাসা যেখানে অপরিসীম অপরে তাকে গ্রহণ করবার পথ খুঁজে পায় না কেন?

বিমলবাবু হাসিয়া বলিলেন, খোঁজা সত্যি হলেই তবে পথ চোখে পড়ে, তার আগে নয়। নইলে অন্ধকারে কেবলি হাতড়ে মরতে হয়। সংসারে এ পরীক্ষা আমাকে বহুবার দিতে হয়েচে

পথের সন্ধান পেয়েছিলে?

হাঁ। প্রার্থনায় যেখানে কপটতা ছিল না, সেখানেই পেয়েছিলাম।

তার মানে?

মানে এই যে, যে কামনায় দ্বিধা নেই, দুর্বলতা নেই, তাকে না-মঞ্জুর করার শক্তি কোথাও নেই। এরই আর এক নাম বিশ্বাস। সত্য বিশ্বাস জগতে ব্যর্থ হয় না নতুন-বৌ।

সবিতা কহিল, আমি যাই কেন না করি দয়াময়, তোমার নিজের চাওয়ার মধ্যে ত ছলনা নেই, তবে সে কেন আমার কাছে ব্যর্থ হলো?

বিমলবাবু বলিলেন, ব্যর্থ হয়নি নতুন-বৌ। তোমাকে চেয়েছিলাম বড় করে পেতে—সে আমি পেয়েচি। তোমাকে সম্পূর্ণ করে পাইনি তা মানি, কিন্তু নিজের যে বিশ্বাসকে আমি আজো দৃঢ়ভাবে ধরে আছি, লুব্ধতা-বশে, দুর্বলতা-বশে তাকে যদি ছোট না করি, আমার কামনা পূর্ণ হবেই একদিন। সেদিন তোমাকে পরিপূর্ণ করেই পাবো। আমাকে বঞ্চিত করতে পারবে না কেউ—তুমিও না।

সবিতা নীরবে চাহিয়া রহিল। যা অসম্ভব, কি করিয়া আর একদিন যে তাহা সম্ভব হইবে সে ভাবিয়া পাইল না। দয়াময়ের কাছে নীচু হইয়া বুকে হাঁটিয়া যাওয়ার পথ আছে, কিন্তু স্বচ্ছন্দে সোজা হইয়া চলার পথ কৈ?

সারদা আসিয়া বলিল, রাখালবাবু এসেছেন মা।

রাজু? কৈ সে?

এইত মা আমি, বলিয়া রাখাল প্রবেশ করিল। তাঁহার পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিল, পরে বিমলবাবুকে নমস্কার করিয়া, মেঝেয় পাতা গালিচার উপরে গিয়া বসিল।

সবিতা বলিলেন, তারক এসেছে আমাকে নিতে, কাল যাবো আমরা তার হরিণপুরের বাড়িতে। শুনেচো রাজু?

রাখাল কহিল, সারদার মুখে হঠাৎ শুনতে পেয়েছি মা।

হঠাৎ তো নয় বাবা। ওকে যে তোমার মত নিতে বলেছিলুম।

আমার মত কি আপনাকে জানিয়েছে সারদা?

সবিতা বলিলেন, না। কিন্তু জানি সে তোমার বন্ধু, তার কাছে যেতে তোমার আপত্তি হবে না।

রাখাল প্রথমটা চুপ করিয়া রহিল, তার পরে বলিল, আমার মতামতের প্রয়োজন নেই মা। আমার চেয়েও' আপনাদের সে ঢের বড় বন্ধু।

এ কথায় সবিতা বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এর মানে রাজু?

রাখাল কহিল, সমস্ত কথার মানে খুলে বলতে নেই মা, মুখের ভাষায় তার অর্থ বিকৃত হয়ে ওঠে। সে আমি বলবো না, কিন্তু আমার মতামতের 'পরেই যদি আপনাদের যাওয়া না-যাওয়া নির্ভর করে তাহলে যাওয়া আপনাদের হবে না। আমার মত নেই।

সবিতা অবাক হইয়া বলিলেন, সমস্ত স্থির হয়ে গেছে যে রাজু! আমার কথা পেয়ে তারক জিনিসপত্র দোকানে কিনতে গেছে, আমাদের জন্যেই তার পল্লীগ্রামের বাসায় সকল প্রকারের ব্যবস্থা করে রেখে এসেছে—আমাদের যাতে কষ্ট না হয়—এখন না গিয়ে উপায় কি বাবা?

রাখাল শুষ্ক হাসিয়া বলিল, উপায় যে নেই সে আমি জানি। আমার মত নিয়ে আপনি কর্তব্য স্থির করবেন সে উচিতও নয়, প্রয়োজনও নয়। কাল সারদা বলছিলেন আপনি নাকি তাঁকে বলেছেন ছেলে বড় হলে তার মত নিয়ে তবে কাজ করতে হয়। আপনার মুখের এ কথা আমি চিরদিন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবো, কিন্তু যে ছেলের শুধু পরের বেগার খেটেই চিরকাল কাটলো, তার বয়েস কখনো বাড়ে না। পরের কাছেও না, মায়ের কাছেও না। আমি আপনার সেই ছেলে নতুন-মা।

সবিতা অধোমুখে নীরবে বসিয়া রহিলেন; রাখাল বলিল, মনে দুঃখ করবেন না নতুন-মা, মানুষের অবজ্ঞার নীচে মানুষের ভার বয়ে বেড়ানোই আমার অদৃষ্ট। আপনারা চলে যাবার পরে আমার যদি কিছু করবার থাকে আদেশ করে যান, মায়ের আজ্ঞা আমি কোন ছলেই অবজ্ঞা করবো না।

সারদা চুপ করিয়া শুনিতেছিল, সহসা সে যেন আর সহিতে পারিল না, বলিয়া উঠিল, আপনি অনেকের অনেক কিছুই করেন, কিন্তু এমন করে মাকে খোঁটা দেওয়াও আপনার উচিত নয়।

সবিতা তাহাকে চোখের ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, সারদা বলে বলুক রাজু, এমন কথা আমার মুখ দিয়ে কখনো বার হবে না।

রাখাল কহিল, তার মানে আপনি ত সারদা নয় মা। সারদাদের আমি অনেক দেখেচি, ওরা কড়া কথার সুযোগ পেলে ছাড়তে পারে না, তাতে কৃতজ্ঞতার ভারটা ওদের লঘু হয়। ভাবে দেনা-পাওনা শোধ হলো।

সবিতা মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না বাবা, ওকে তুমি বড্ড অবিচার করলে। সংসারে সারদা একটিই আছে, অনেক নেই রাজু।

সারদা মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া ছিল, নিঃশব্দে উঠিয়া চলিয়া গেল।

সবিতা মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেসা করিলেন, তারকের সঙ্গে কি তোমার ঝগড়া হয়েছে রাজু?

না মা, তার সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি।

আমাদের নিয়ে যাবার কথা তোমাকে জানায় নি সে?

কোনদিন না। সারদা বলে, আমার বাসাতে যাবার সে সময় পায় না। কিন্তু আর নয় মা, আমার যাবার সময় হলো, আমি উঠি। এই বলিয়া রাখাল উঠিয়া দাঁড়াইল।

বিমলবাবু এতক্ষণ পর্যন্ত একটি কথাও বলেন নাই, এইবার কথা কহিলেন। সবিতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, তোমার ছেলের সঙ্গে আমার পরিচয় করে দেবে না নতুন-বৌ? এমনি অপরিচিত হয়েই দুজনে থাকবো?

সবিতা বলিলেন, ও আমার ছেলে এই ওর পরিচয়। কিন্তু তোমার পরিচয় ওর কাছে কি দেবো দয়াময়, আমিই নিজেই ত এখনো জানিনে।

যখন জানতে পারবে দেবে?

দেবো। ওর কাছে আমার গোপন কিছুই নেই। আমার সব দোষ-গুণ নিয়েই আমি ওর নতুন-মা।

রাখাল কহিল, ছেলেবেলায় যখন কেউ আমার আপনার রইলো না, তখন আমাকে উনি আশ্রয় দিয়েছিলেন, মানুষ করেছিলেন, মা বলে ডাকতে শিখিয়েছিলেন, তখন থেকে মা

বলেই জানি। চিরদিনই মা বলেই জানবো। এই বলিয়া হেঁট হইয়া সে আর একবার নতুন-মার পায়ের ধুলো লইল।

বিমলবাবু বলিলেন, তারকের ওখানে তোমার নতুন-মা যেতে চান কিছুদিনের জন্যে, এখানে ভালো লাগচে না বলে। আমি বলি যাওয়াই ভালো, তোমার সম্মতি আছে?

রাখাল হাসিয়া কহিল, আছে।

সত্যি বলো রাজু। কারণ তোমার অসম্মতিতে ওঁর যাওয়া হবে না। আমি নিষেধ করবো।

আপনার নিষেধ উনি শুনবেন?

অন্ততঃ নিজের কাছে নতুন-বৌ এই প্রতিজ্ঞাই করেছেন। এই বলিয়া বিমলবাবু একটুখানি হাসিলেন।

সবিতা তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিয়া বলিলেন, হাঁ এই প্রতিজ্ঞাই করেছি। তোমার আদেশ আমি লঙ্ঘন করবো না।

শুনিয়া রাখালের চোখের দৃষ্টি মুহূর্তকালের জন্য রুক্ষ হইয়া উঠিল, কিন্তু তখনি নিজেকে শান্ত করিয়া সহজ গলায় বলিল, বেশ, আপনারা যা ভালো বুঝবেন করুন, আমার আপত্তি নেই নতুন-মা। এই বলিয়া সে আর কোন প্রশ্নের পূর্বেই নীচে নামিয়া গেল।

নীচে পথের একধারে দাঁড়াইয়াছিল সারদা। সে সম্মুখে আসিয়া কহিল, একবার আমার ঘরে যেতে হবে দেব্‌তা।

কেন?

সারদাদের অনেক দেখেচেন বললেন! আপনার কাছে তাদের পরিচয় নেবো।

কি হবে নিয়ে?

মেয়েদের প্রতি আপনার ভয়ানক ঘৃণা। কৃতজ্ঞতার ঋণ তারা কি দিয়ে শোধ করে আপনার কাছে বসে তার গল্প শুনবো।

রাখাল বলিল, গল্প করবার সময় নেই, আমার কাজ আছে।

সারদা বলিল, কাজ আমারও আছে। কিন্তু আমার ঘরে যদি আজ না যান, কাল শুনতে পাবেন সারদারা অনেক ছিল না, সংসারে কেবল একটিই ছিল।

তাহার কণ্ঠস্বরের আকস্মিক পরিবর্তনে রাখাল স্তব্ধ হইয়া গেল। তাহার মনে পড়িল সেই প্রথম দিনটির কথা—যেদিন সারদা মরিতে বসিয়াছিল।

সারদা জিজ্ঞাসা করিল বলুন কি করবেন?

রাখাল কহিল, থাক কাজ। চলো তোমার ঘরে যাই।

পনেরো

সারদার ঘরে আসিয়া রাখাল বিছানায় বসিল, জিজ্ঞাসা করিল, ডেকে আনলে কেন?

সারদা বলিল, যাবার আগে আর একবার আপনার পায়ের ধুলো আমার ঘরে পড়বে বলে।

ধুলো ত পড়লো, এবার উঠি?

এতই তাড়া? দুটো কথা বলবারও সময় দেবেন না?

সে-দুটো কথা ত অনেকবার বলেছো সারদা। তুমি বলবে দেব্‌তা, আপনি আমার প্রাণ রক্ষে করেচেন, কুড়ি-পঁচিশটে টাকা দিয়ে চাল-ডাল কিনে দিয়েছেন, নতুন-মাকে বলে বাকী বাড়িভাড়া মাফ করিয়ে দিয়েছেন, আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ, যতদিন বাঁচবো আপনার ঋণ পরিশোধ করতে পারবো না। এর মধ্যে নতুন কিছু নেই। তবু যদি যাবার পূর্বে আর একবার বলতে চাও বলে নাও। কিন্তু একটু চটপট করো, আমার বেশী সময় নেই।

সারদা কহিল, কথাগুলো নতুন না হোক ভারী মিষ্টি। যতবার শোনা যায় পুরোনো হয় না—ঠিক না দেব্‌তা?

হাঁ ঠিক। মিষ্টি কথা তোমার মুখে আরো মিষ্টি শুনোয়, আমি অস্বীকার করিনে। সময় থাকলে বসে বসে শুনতুম। কিন্তু সময় হাতে নেই। এখুনি যেতে হবে।

গিয়ে রাঁধতে হবে?

হাঁ।

তারপরে খেয়ে শুতে হবে?

হাঁ।

তারপরে চোখে ঘুম আসবে না, বিছানায় পড়ে সারা রাত ছটফট করতে হবে—না দেব্‌তা?

এ তোমাকে কে বললে?

কে বললে জানেন? যে সারদা সংসারে কেবল একটিই আছে অনেক নেই সে-ই।

রাখাল বলিল, তা হলে সে-সারদাও তোমাকে ভুল বলেছে। আমি এমন কোন অপরাধ করিনে যে, দুশ্চিন্তায় বিছানায় পড়ে ছটফট করতে হয়। আমি শুই আর ঘুমোই। আমার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।

সারদা কহিল, বেশ আর ভাববো না। আপনার কথাই শুনবো, কিন্তু আমিই বা কোন্‌ অপরাধ করেছি যার জন্যে ঘুমোতে পারিনে—সারারাত জেগে কাটাই?

সে তুমিই জানো।

আপনি জানেন না?

না। পৃথিবীতে কোথায় কার ঘুমের ব্যাঘাত হচ্চে এ জানা সম্ভবও নয়, সময়ও নেই।

সময় নেই—না? এই বলিয়া সারদা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া হঠাৎ হাসিয়া ফেলিল, বলিল, আচ্ছা দেব্‌তা, আপনি এত ভীতু মানুষ কেন? কেন বলচেন না, সারদা, হরিণপুরে তোমার যাওয়া হবে না। নতুন-মার ইচ্ছে হয় তিনি যান, কিন্তু তুমি যাবে না। তোমার নিষেধ রইলো। এইটুকু বলা কি এতই শক্ত?

ইহার উত্তরে কি বলা উচিত রাখাল ভাবিয়া পাইল না, তাই কতকটা হতবুদ্ধির মতোই কহিল, তোমরা স্থির করেচো যাবে, খামকা আমি বারণ করতে যাবো কিসের জন্যে?

সারদা কহিল, কেবল এই জন্যে যে, আপনার ইচ্ছে নয় আমি যাই। এই ত সবচেয়ে বড় কারণ দেব্‌তা।

না, কোন-একজনের খেয়ালটাকেই কারণ বলে না। তোমাকে নিষেধ করার আমার অধিকার নেই।

সারদা কহিল, হোক খেয়াল, সেই আপনার অধিকার। বলুন মুখ ফুটে, সারদা হরিণ-পুরে তুমি যেতে পাবে না।

রাখাল মাথা নাড়িয়া জবাব দিল, না, অন্যায় অধিকার আমি কারো 'পরেই খাটাই নে।

রাগ করে বলছেন না ত?

না, আমি সত্যিই বলচি।

সারদা তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তারপরে বলিল, না, এ সত্যি নয়,—কোন-মতেই সত্যি নয়। আমাকে বারণ করুন দেব্‌তা, আমি মাকে গিয়ে বলে আসি, আমার হরিণপুরে যাওয়া হবে না, দেব্‌তা নিষেধ করেছেন।

ইহারও প্রত্যুত্তরে রাখাল মূঢ়ের মতো জবাব দিল, না, তোমাকে নিষেধ করতে আমি পারবো না। সে অধিকার আমার নেই।

সারদা বলিল, ছিল অধিকার। কিন্তু এখন এই কথাই বলবো যে, চিরদিন কেবল পরের হুকুম মেনে মেনে আজ নিজে হুকুম করার শক্তি হারিয়েছেন। এখন বিশ্বাস গেছে ঘুচে, ভরসা গেছে নিজের 'পরে। যে লোক দাবী করতে ভয় পায়, পরের দাবী মেটাতেই তার জীবন কাটে। শুভাকাঙ্ক্ষণী সারদার এই কথাটা মনে রাখবেন।

এ তুমি কাকে বলচো? আমাকে?

হাঁ, আপনাকেই।

রাখাল কহিল, পারি মনে রাখবো; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তোমাকে বারণ করায় আমার লাভ কি? এ যদি বোঝাতে পারো হয়তো এখনও তোমাকে সত্যিই বারণ করতে পারি।

সারদা বলিল, স্বেচ্ছায় আপনার বশ্যতা স্বীকার করতে একজনও যে সংসারে আছে, এই সত্যিটা জানতেও কি ইচ্ছে করে না?

জেনে কি হবে?

সারদা তাহার মুখের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিল, হয়তো কিছুই হবে না। হয়তো আমারও সময় এসেছে বোঝবার। তবু একটা কথা বলি দেব্‌তা, অকারণে নির্মম হতে পারাটাই পুরুষের পৌরুষ নয়।

রাখাল জবাব দিল, সে আমিও জানি। কিন্তু অকারণে অতি-কোমলতাও আমার প্রকৃতি নয়। এই বলিয়া সে কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া অধিকতর রুক্ষকণ্ঠে কহিল, দেখো সারদা, হাসপাতালে যেদিন তোমার চৈতন্য ফিরে এলো, তুমি সুস্থ হয়ে উঠলে, সেদিনের কথা মনে পড়ে কিছু? তুমি ছলনা করে জানালে তুমি অস্পর্শিক্ষিত সহজ সরল পল্লীগ্রামের মেয়ে, নিঃস্ব ভদ্রঘরের বৌ। বললে, আমি না বাঁচালে তোমার বাঁচার উপায় নেই। তোমাকে অবিশ্বাস করিনি। সেদিন আমার সাধ্যে যেটুকু ছিল অস্বীকারও করিনি। কিন্তু আজ সে-সব তোমার হাসির জিনিস। তাদের অবহেলায় ফেলে দিলে। আজ এসেছেন বিমলবাবু ঐশ্বর্যের সীমা নেই যাঁর—এসেচে তারক, এসেচেন নতুন-মা। সেদিনের কিছুই বাকী নেই আর। এ ছলনার কি প্রয়োজন ছিল বল ত?

অভিযোগ শুনিয়া সারদা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল। তার পরে আস্তে আস্তে বলিল, আমার কথায় মিথ্যে ছিল, কিন্তু ছলনা ছিল না দেব্‌তা। সে মিথ্যেও শুধু মেয়ে-মানুষ বলে। তার লজ্জা ঢাকতে। একেই যখন আমার চরিত্র বলে আপনিও ভুল করলেন তখন আর আমি ভিক্ষে চাইবো না। কাল মা আমাকে কিছু টাকা দিয়েছেন জিনিসপত্র কিনতে। আমার কিন্তু দরকার নেই। যে টাকাগুলো আপনি দিয়েছিলেন সে কি ফিরিয়ে দেবো?

রাখাল কঠিন হইয়া বলিল, তোমার ইচ্ছে। কিন্তু পেলে আমার সুবিধে হয়। আমি বড়লোক নই সারদা, খুবই গরীব সে তুমি জানো।

সারদা বালিশের তলা হইতে রুমাল বাঁধা টাকা বাহির করিয়া গণিয়া রাখালের হাতে দিয়া বলিল, তা হলে এই নিন। কিন্তু টাকা দিয়ে আপনার ঋণ পরিশোধ হয় এত নির্বোধ আমি নই। তবু বিনা দোষে যে দণ্ড আমাকে দিলেন সে অন্যায় আর একদিন আপনাকে বিঁধবে। কিছুতে পরিত্রাণ পাবেন না বলে দিলুম।

রাখাল কহিল, আর কিছু বলবে?

না।

তা হলে যাই। রাত হয়েছে।

প্রণাম করিতে গিয়া সারদা হঠাৎ তাহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তার পরে নিজেই চোখ মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

চললুম।

সারদা বলিল, আসুন।

পথে বাহির হইয়া রাখাল ভাবিয়া পাইল না এইমাত্র সে পুরুষের অযোগ্য যে-সকল মান অভিমানের পালা সাঙ্গ করিয়া আসিল সে কিসের জন্য! কিসের জন্য এই-সব রাগারাগি? কি করিয়াছে সারদা? তাহার অপরাধ নির্দেশ করাও যেমন কঠিন, তাহার নিজের জ্বালা যে কোন্‌খানে, অঙ্গুলি সঙ্কেতও তেমনি শক্ত। রাখালের অন্তর আঘাত করিয়া তাহাকে বারে বারে বলিতে লাগিল, সারদা ভদ্র, সারদা বুদ্ধিমতী, সারদার মতো রূপ সহজে চোখে পড়ে না। সারদা তাহার কাছে কত যে কৃতজ্ঞ তাহা বহুবার বহুপ্রকারে জানাইতে বাকী রাখে নাই। পায়ের 'পরে মাথা পাতিয়া আজও জানাইতে সে ত্রুটি করে নাই। আরও একটা কি যেন সে বারংবার আভাসে জানায় হয়তো, তাহার অর্থ শুধু কৃতজ্ঞতাই নয়, হয়তো সে আরও গভীর আরও বড়। হয়তো সে ভালোবাসা। রাখালের মনের ভিতরটা সংশয়ে দুলিয়া উঠিল। বহুদিন বহু নারীর সংস্পর্শে সে বহুভাবে আসিয়াছে, কিন্তু কোন মেয়ে কোনদিন তাহাকে ভালোবাসিয়াছে, এ-বস্তু এমনি অভাবিত যে, সে আজ প্রায় অসম্ভবের কোঠায় গিয়া উঠিয়াছে। আজ সেই বস্তুই কি সারদা তাহাকে

দিতে চায়? কিন্তু গ্রহণ করিবে সে কোন্ লজ্জায়? সারদা বিধবা, সারদা নিন্দিত কুল-ত্যাগিনী, এ প্রেমে না আছে গৌরব, না আছে সম্মান। নিজেকে সে বুঝাইয়া বলিতে লাগিল, আমি গরীব বলেই তো কাঙালবৃত্তি নিতে পারিনে। অন্নাভাব হয়েছে বলে পথের উচ্ছিষ্ট তুলে মুখে পুরবো কেমন করে? এ হয় না—এ যে অসম্ভব।

তথাপি বুকের ভিতরটায় কেমন যেন করিতে থাকে। তথায় কে যেন বারবার বলে, বাহিরের ঘটনায় এমনিই বটে; কিন্তু যে অন্তরের পরিচয় সেই প্রথম দিন হইতে সে নিরন্তর পাইয়াছে সে-বিচারের ধারা কি ওই আইনের বই খুলিয়া মিলিবে? যে মেয়েদের সংসর্গে তাহার এতকাল কাটিল সেখানে কোথায় সারদার তুলনা? অকপট নারীত্বের এতবড় মহিমা কোথায় খুঁজিয়া মিলিবে? অথচ সেই সারদাকেই আজ সে কেমন করিয়াই না অপমান করিয়া আসিল।

বাসায় পৌঁছিয়া দেখিল ঝি তখনো আছে। একটু আশ্চর্য হইয়াই জিজ্ঞাসা করিল, তুমি যাওনি এখনো?

ঝি কহিল, না দাদা, ও-বেলায় তোমার মোটে খাওয়া হয়নি, এ-বেলায় সমস্ত যোগাড় করে রেখেচি, পোয়াটাক মাংস কিনেও এনেচি—সব গুছিয়ে দিয়ে তবে ঘরে যাবো।

সকালে সত্যই খাওয়া হয় নাই, মাছি পড়িয়া বিঘ্ন ঘটিয়াছিল, কিন্তু রাখালের মনে ছিল না। ইতিপূর্বেও এমন কতদিন হইয়াছে, তখন সকালের স্বল্পাহার রাত্রের ভূরি-ভোজনের আয়োজনে এই ঝি-ই পূর্ণ করিয়া দিয়াছে। নূতন নয়, অথচ তাহার কথা শুনিয়া রাখালের চোখ অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। বলিল, তুমি বুড়ো হয়েছো নানী, কিন্তু মরে গেলে আমার কি দুর্দশা হবে বল ত? জগতে আর কেউ নেই যে তোমার দাদা-বাবুকে দেখবে।

এই স্নেহের আবেদনে ঝির চোখেও জল আসিল। বলিল, সত্যি কথাই ত। কিন্তু বুড়ো হয়েচি, মরবো না? কতদিন বলেচি তোমাকে, কিন্তু কান দাও না—হেসে উড়িয়ে দাও। এবার আর শুনবো না, বিয়ে তোমাকে করতেই হবে। দু'দিন বেঁচে থেকে চোখে দেখে যাবো, নইলে মরেও সুখ পাবো না দাদা।

রাখাল হাসিয়া বলিল, তা হলে সে সুখের আশা নেই নানী। আমার ঘরবাড়ি নেই, বাপ-মা, আপনার লোক নেই, মোটা-মাইনের চাকরি নেই, আমাকে মেয়ে দেবে কে?

ইস্! মেয়ের ভাবনা? একবার মুখ ফুটে বললে যে কত গণ্ডা সম্বন্ধ এসে হাজির হবে।

তুমি একটা করে দাও না নানী।

পারিনে বুঝি? আমার হাতে লোক আছে, তাকে কালই লাগিয়ে দিতে পারি।

রাখাল হাসিতে লাগিল। বলিল, তা যেন দিলে; কিন্তু বৌ এসে খাবে কি ব'লো তো? খাবি খাবে নাকি!

ঝি রাগ করিয়া জবাব দিল, খাবি খেতে যাবে কিসের দুঃখে দাদা; গেরস্ত-ঘরে সবাই যা খায় সে-ও তাই খাবে। তোমাকে ভাবতে হবে না,—জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি।

সে ব্যবস্থা আগে ছিল নানী, এখন আর নেই। এই বলিয়া রাখাল পুনশ্চ হাসিয়া রান্নার ব্যাপারে মনোনিবেশ করিল। তাহার রান্না হয় কুকারে। শৌখিন মানুষ,—ছোট, বড়, মাঝারি নানা আকারের কুকার। আজ রান্না চাপিল বড়টায়। তিন-চারটা পাত্রে নানাবিধ তরকারি এবং মাংস। অনেকদিন ধরিয়া এ কাজ করিয়া ঝি পাকা হইয়া গেছে—বলিতে কিছুই হয় না।

ঠাঁই করিয়া, খাবার পাত্র সাজাইয়া দিয়া ঘরে ফিরিবার পূর্বে ঝি মাথার দিব্য দিয়া গেল পেট ভরিয়া খাইতে। বলিল, সকালে এসে যদি দেখি সব খাওনি, পড়ে আছে, তাহলে রাগ করবো বলে গেলুম।

রাখাল বলিল, তাই হবে নানী, পেট ভরেই খাবো। আর যা-ই করি তোমাকে দুঃখ দেবো না।

ঝি চলিয়া গেলে রাখাল ইজি-চেয়ারটায় শুইয়া পড়িল। খাবার তৈরির প্রায় ঘণ্টা-দুই

দেরি. এই সময়টা কাটাইবার জন্য সে একখানা বই টানিয়া লইল. কিন্তু কিছুতেই মন দিতে পারে না, মনে পড়ে সারদাকে। মনে পড়ে নিজের অকারণ অধীরতা। আপনাকে সংবরণ করিতে পারে নাই, অন্তরের ক্রোধ ও ক্ষোভের জ্বালা কদর্য রূঢ়তায় বারে বারে ফাটিয়া বাহির হইয়াছে,—ছেলেমানুষের মতো। বুদ্ধিমতী সারদার কিছুই বুঝিতে বাকী নাই। এমন করিয়া নিজেকে ধরা দিবার কি আবশ্যক ছিল? কি আবশ্যক ছিল নিজেকে ছোট করার। মনে মনে লজ্জার অবধি রহিল না, ইচ্ছা করিল, আজিকার সমস্ত ঘটনা কোনমতে যদি মুছিয়া ফেলিতে পারে।

নিজের জীবনের যে কাহিনী সারদা আজও কাহাকে বলিতে পারে নাই, বলিয়াছে শুধু তাহাকে। সেই অকপট বিশ্বাসের প্রতিদান কি পাইল সে? পাইল শুধু অশ্রদ্ধা ও অকারণ লাঞ্ছনা। অথচ, ক্ষতি তাহার কি করিয়াছিল সে? একটা কথারও প্রতিবাদ করে নাই সারদা, শুধু নিরুত্তরে সহ্য করিয়াছে। নিরুপায় রমণীর এই নিঃশব্দ অপমান এতক্ষণে ফিরিয়া আসিয়া যেন তাহাকেই অপমান করিল। উত্তেজনায় চঞ্চল হইয়া রাখাল চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, থাক আমার রান্না—এই রাত্রেই ফিরে গিয়ে আমি তার ক্ষমা চেয়ে আসবো। তাকে স্পষ্ট করে বলবো কোথায় আমার জ্বালা, কোথায় আমার ব্যথা ঠিক জানিনে সারদা, কিন্তু যে-সব কথা তোমাকে বলে গেছি সে-সব সত্যি নয়, সে একেবারে মিথ্যে।

কুকারের খাবার ফুটিতে লাগিল, ঘরের আলো জ্বলিতে লাগিল, গায়ের চাদরটা টানিয়া লইয়া সে দ্বারে তালা বন্ধ করিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল।

এ বাটীতে পৌঁছিতে বেশী বিলম্ব হইল না। সোজা সারদার ঘরের সম্মুখে আসিয়া দেখিল তালা ঝুলিতেছে, সে নাই। উপরে উঠিয়া সম্মুখেই চোখে পড়িল দুখানা চেয়ারে মুখোমুখি বসিয়া বিমলবাবু ও সবিতা। গল্প চলিতেছে। তাহাকে দেখিয়া একটু বিস্মিত হইয়াই প্রশ্ন করিলেন, তুমি কি এতক্ষণ এ-বাড়িতেই ছিলে রাজু?

না মা, বাসায় গিয়েছিলাম।

বাসা থেকে আবার ফিরে এলে? কেন?

রাখাল চট্ করিয়া জবাব দিতে পারিল না। পরে বলিল, একটু কাজ আছে মা। ভাবলাম তারকের সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয়নি, একবার দেখা করে আসি। কাল ত আর সময় পাওয়া যাবে না।

না, আমরা সকালেই রওনা হবো।

বিমলবাবু বলিলেন, তারক কি ফিরেচে?

সবিতা কহিলেন, না। ছেলেটা কি যে এত আমাদের জন্য কিনচে আমি ভেবে পাইনে।

বিমলবাবু এ কথার জবাব দিলেন। বলিলেন, সে জানে তার অতিথি সামান্য ব্যক্তি নয়। তাঁর মর্যাদার উপযুক্ত আয়োজন তার করা চাই।

সবিতা হাসিয়া কহিলেন, তাহলে তার উচিত ছিল তোমার কাছে ফর্দ লিখিয়ে নিয়ে যাওয়া।

শুনিয়া বিমলবাবুও হাসিলেন, বলিলেন, আমার ফর্দ তার সঙ্গে মিলবে কেন নতুন-বৌ? ও যার যা আলাদা। তবেই মন খুশী হয়।

এ আলোচনায় রাখাল যোগ দিতে পারিল না, হঠাৎ মনের ভিতরটা যেন জ্বলিয়া উঠিল। খানিক পরে নিজেকে একটু শান্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সারদাকে ত তার ঘরে দেখলাম না নতুন-মা?

সবিতা বলিলেন, আজ কি তার ঘরে থাকবার জো আছে বাবা। তারক খাবে, বামুন-ঠাকুরকে সরিয়ে দিয়ে সে দুপুরবেলা থেকেই এক-রকম রাঁধতে লেগেছে। কত কি যে তৈরি করচে তার ঠিকানা নেই।

বিমলবাবু বলিলেন, সে আমাকেও যে খেতে বলেছে নতুন-বৌ।

তোমারও নেমন্তন্ন নাকি?

হাঁ, তুমি ত কখনো খেতে বললে না, কিন্তু সে আমাকে কিছুতেই যেতে দিলে না।

আজ তাই বুঝি বসে আছো এতক্ষণ? আমি বলি বুঝি আমার সঙ্গে কথা কইবার লোভে। বলিয়া সবিতা মুখ টিপিয়া হাসিলেন।

বিমলবাবুও হাসিয়া বলিলেন, মিথ্যে কথা ধরা পড়ে গেলে খোঁটা দিতে নেই নতুন-বৌ। ভারী পাপ হয়।

রাখাল মুখ ফিরাইয়া লইল। এই হাস্য-পরিহাসে আর একবার তাহার মনটা জ্বলিয়া উঠিল।

সবিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, সারদা তোমাকে খেতে বলেনি রাজু?

না, মা।

সবিতা অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, তাহলে বুঝি ভুলে গেছে। এই বলিয়া তিনি নিজেই সারদাকে ডাকিতে লাগিলেন। সে আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার রাজুকে খেতে বলোনি সারদা?

না মা বলিনি।

কেন বলোনি? মনে ছিল না বুঝি?

সারদা চুপ করিয়া রহিল।

সবিতা বলিলেন, মনেই ছিল না রাজু; কিন্তু এ ভুলও অন্যায়।

রাখাল কহিল, মনে না-থাকা দুর্ভাগ্য হতে পারে নতুন-মা, কিন্তু তাকে অন্যায় বলা চলে না। সারদা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বাসায় ফিরে গিয়ে এখন বুঝি আপনাকে রাঁধতে হবে? বললাম, হাঁ। প্রশ্ন করলেন, তারপর খেতে হবে? বললাম, হাঁ। কিন্তু এর পরেও আমাকে খেতে বলার কথা ওঁর মনেই এলো না। কিন্তু এটা জেনে রাখবেন নতুন-মা, এ মনে না-থাকা ন্যায় অন্যায়ের অন্তর্গত নয়, চিকিৎসার অন্তর্গত। এই বলিয়া রাখাল নীরস হাস্যে তীক্ষ্ম বিদ্রূপ মিশাইয়া জোর করিয়া হাসিতে লাগিল।

সবিতা কি বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। সারদা তেমনি নিঃশব্দেই দাঁড়াইয়া রহিল।

রাখাল মনে মনে বুঝিল অন্যায় হইতেছে, তাহার কথা মিথ্যা না হইয়াও মিথ্যার বেশী দাঁড়াইতেছে, তবু থামিতে পারিল না। বলিল, তারক এখানে এলেও আমার সঙ্গে দেখা করে না। সারদা বলেন তাঁর সময়াভাব। সত্যি হতেও পারে, তাই সময় করে আমিই দেখা করতে এলাম, খেতে আসিনি নতুন-মা।

একটু থামিয়া বলিল, সারদার হয়তো সন্দেহ আমাকে তারক পছন্দ করে না, আমার সঙ্গে খেতে বসা তার ভালো লাগবে না। দোষ দিতে পারিনে মা, তারক এখানে অতিথি, তার সুখ-সুবিধেই আগে দেখা দরকার।

সারদা তেমনি নির্বাক্। সবিতা ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, তারক অতিথি, কিন্তু তুমি যে আমার ঘরের ছেলে রাজু। আমি অসুবিধে কারো ঘটাতে চাইনে, যার যা ইচ্ছে করুক, কিন্তু আমার ঘরে আমার কাছে বসে আজ তুমি খাবে।

রাখাল মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করিল, না সে হয় না। কহিল, আমার বুড়ো নানী বেঁচে থাক, আমার কুকার অক্ষয় হোক, তার সিদ্ধ রান্নাই আমার অমৃত, বড়ঘরের বড়-রকমের খাওয়ায় আমার লোভ নেই নতুন-মা।

সবিতা বলিলেন, লোভের জন্যে বলিনে রাজু, কিন্তু না খেয়ে আজ যদি তুমি চলে যাও, দুঃখের আমার সীমা থাকবে না। এ তোমাকে বললুম।

অপরাধ ঢের বেশী বাড়িয়া গেল, রাখাল নির্মম হইয়া কহিল, বিশ্বাস হয় না নতুন-মা। মনে হয় এ শুধু কথার কথা, বলতে হয় তাই বলা। কে আমি, যে আমি না খেয়ে গেলে আপনার দুঃখের সীমা থাকবে না? কারো জন্যেই আপনার দুঃখবোধ নেই। এই আপনার প্রকৃতি।

দুঃসহ বিস্ময়ে সবিতার মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল, বলো কি রাজু?

কেউ বলে না বলেই বললাম নতুন-মা। আপনার সৌজন্য, সহৃদয়তা, আপনার বিচার-বুদ্ধির তুলনা নেই। আর্তের পরম বন্ধু আপনি, কিন্তু দুঃখীর মা আপনি নয়। দুঃখ-বোধ শুধু আপনার বাইরের ঐশ্বর্য, অন্তরের ধন নয়। তাই যেমন সহজে গ্রহণ করেন, তেমনি অবহেলায় ত্যাগ করেন। আপনার বাধে না।

বিমলবাবু বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে স্তব্ধভাবে চাহিয়া রহিলেন।

রাখাল বলিল, আপনি আমার অনেক করেছেন নতুন-মা, সে আমি চিরদিন মনে

রাখবো। কেবল মুখের কথা দিয়ে নয়, দেহ-মনের সমস্ত শক্তি দিয়ে। আপনার সঙ্গে আর বোধ করি আমার দেখা হবে না। হয় এ ইচ্ছাও নেই। কিন্তু নিজের যদি কিছু পুণ্য থাকে তার বদলে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাই, এবার যেন আপনাকে তিনি দয়া করেন—অজানার মধ্যে থেকে জানার মধ্যে এবার যেন তিনি আপনাকে স্থান দেন। শেষের দিকে হঠাৎ তাহার গলাটা ধরিয়া আসিল।

সবিতা একদৃষ্টে তাহার প্রতি চাহিয়াছিলেন, কথা শুনিয়া রাগ করিলেন না, বরং গভীর স্নেহের সুরে বলিলেন, তাই হোক রাজু, ভগবান যেন তোমার প্রার্থনাই মঞ্জুর করেন। আমার অদৃষ্টে যেন তাই ঘটতে পায়।

চললাম নতুন-মা।

সবিতা উঠিয়া আসিয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া বলিলেন, রাজু, কিছু কি হয়েছে বাবা?

কি হবে নতুন-মা?

এমন কিছু যা তোমাকে আজ এমন চঞ্চল করেছে। তুমি ত নিষ্ঠুর নও—কটু কথা বলা ত তোমার স্বভাব নয়!

প্রত্যুত্তরে রাখাল হেঁট হইয়া শুধু তাঁহার পায়ের ধুলো লইল, আর কিছু বলিল না। চলিতে উদ্যত হইলে বিমলবাবু বলিলেন, রাজু, বিশেষ পরিচয় নেই দু'জনের, কিন্তু আমাকে বন্ধু বলেই জেনো।

রাখাল ইহারও জবাব দিল না, ধীরে ধীরে নীচে চলিয়া গেল। কালকের মতো আজও সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া ছিল সারদা। কাছে আসিতেই মৃদুকণ্ঠে কহিল, দেব্‌তা?

কি চাও তুমি?

বলেছিলেন অনেক সারদার মধ্যে আমিও একজন। হযতো আপনার কথাই সত্যি।

সে আমি জানি।

সারদা বলিল, নানাভাবে দয়া করে আমাকে বাঁচিয়েছিলেন বলেই আমি বেঁচেছিলুম। আপনি অনেকের অনেক করেন, আমারও করেছিলেন, তাতে ক্ষতি আপনার হয়নি। বেঁচে যদি থাকি এইটুকুই কেবল জেনে রাখতে চাই।

রাখাল এ প্রশ্নের উত্তর দিল না, নীরবে বাহির হইয়া গেল।

[অসমাপ্ত]